হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

সম্পাদক

শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী, সং ৮০

হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা

প্রথম খণ্ড

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

ও

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩৩৮

		বাঁধাই	কাগজের মলাট
মূল্য	পরিষদের সদস্য পক্ষে	২৲	১॥০
	শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে	২।০	১৸০
	সাধারণের পক্ষে	২॥০	২৲

প্রিণ্টার—শ্রীচুণীলাল দাস
এরিয়ান প্রেস
১২।১নং বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা।

সূচী

চিত্র

সম্পাদকীয় নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৯এ আষাঢ় তারিখের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি (মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে পরিষৎ হইতে 'বর্দ্ধাপন-গ্রন্থ' প্রকাশ করা সম্বন্ধে ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল, এবং তাঁহার পত্রোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। আরও স্থির হইল যে, এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক,—

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা (আহ্বানকারী)।"

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১লা ভাদ্র তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত শাখা-সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

এই প্রস্তাব অনুসারে আমাদিগের প্রতি সংবর্দ্ধন-লেখমালা সংগ্রহ করিয়া সম্পাদন ও প্রকাশের ভার অর্পিত হয়।

আমরা বাঙ্গালাদেশের বিরাশী জন কৃতী ও মনীষী ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাই। যাঁহাদের নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করা হয়, তাঁহাদের সুবিধা ও অবকাশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য থাকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধগুলি পাইতে আমাদের কিছু বিলম্ব হইয়া যায়। প্রবন্ধগুলির মুদ্রণকার্য্য ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়। এতাবৎ মোট ৪১টি প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছি। এই বৎসরের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ১৪টি প্রবন্ধ (সর্ব্বসমেত ৩৪ ফর্ম্মা অর্থাৎ ২৭২ পৃষ্ঠা) ছাপা হইবার পরে হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-সমিতি কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে,

সংবর্দ্ধন-লেখমালা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হউক, এবং প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, তথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তাবৎ প্রবন্ধগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট হউক, ও তদনন্তর প্রথম খণ্ড সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হউক। এদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণও চলিতে থাকুক এবং যথাসম্ভব শীঘ্র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হউক। উভয় খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে মুদ্রণাদির ব্যয় চুকাইয়া দিয়া যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে, তাহা পরিষদের নিকট সমর্পিত হইবে।

লেখমালা প্রকাশের জন্য সমিতি এতাবৎ যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়ের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন, ইঁহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ॥/০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই ব্যবস্থানুসারে হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে ।৶০ ও ॥০ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট ও বর্ণিত লেখকগণের প্রবন্ধ থাকিবে, এবং তদ্ভিন্ন পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বা সম্পাদিত তাবৎ গ্রন্থ ও প্রবন্ধনিচয়ের তালিকার সহিত তাঁহার জীবনী ও সাহিত্য-সেবা-বিষয়ক প্রবন্ধও থাকিবে।

জ্ঞানে ও বিদ্যায় বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় বহু পণ্ডিত—সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মনীষিগণ—হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালায় প্রবন্ধ দান দ্বারা সহযোগিতা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতির স্মারক হিসাবে এরূপ লেখ-সংগ্রহ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিবার জন্য হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-সমিতির সভ্যগণ ইঁহাদের নিকট বিশেষরূপে ঋণী। আশা করি, বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলীর নিকটে এই হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালার যথোচিত সমাদর হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
কলিকাতা
৬ই ভাদ্র, ১৩৩৮

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাবলী

১। নবাবিষ্কৃত সচিত্র বঙ্গীয় তালপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবরণ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, এম এ, বি এল

২। তিব্বতী ভাষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, বি এ

৩। প্রাচীন ভারতের রত্ন-সম্পদ্—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম এ, পি-এইচ ডি

৪। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

৫। বৌদ্ধন্যায়—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম এ

৬। বাঙ্গালাদেশে বেদচর্চ্চা—শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, এম এ

৭। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-সম্বন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

৮। অভিসময়ালঙ্কারকারিকা—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট

৯। প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল

১০। ব্রহ্মদেশে বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য দেবতা—শ্রীযুক্ত নীহার-রঞ্জন রায়

১১। ভগবান্ পার্শ্বনাথ - শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার, এম এ, বি এল

১২। ধম্মপদ ও উদানবর্গ—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি এ

১৩। (১) শিল্পশাস্ত্র—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম এ

(২) তিব্বতী ভাষায় শিল্পশাস্ত্র— ঐ

১৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

১৫। ছদ্মবেশে দেবদেবী—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

১৬। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

১৭। প্রথম মহীপালদেব ও খি-রল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম এ, বি এল, ডি লিট

১৮। শিবাজী ও মানসিংহ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম এ, সি আই ই

১৯। পাঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাজবংশ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

২০। নাথ যোগি-সম্প্রদায়—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ

২১। বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত—স্বর্গীয় শশধর রায়, এম এ, বি এল

২২। আয়ুর্ব্বেদের দার্শনিক তত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

২৩। হিন্দুগণিতে প্রস্তার ও সংযোগ বিধি—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, এম এ, পি-এইচ ডি

২৪। মহাপ্রাণ বর্ণ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, ডি লিট

২৫। বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস - অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম-এ, বি এল, ডি লিট

২৬। রাজা হাল ও পাটলীপুত্র - শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব, এম এ, বি এল

চাঁদাপ্রদাতৃগণের নামের তালিকা

১।	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি	...	২৫০৲
২।	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি	...	১০০৲
৩।	ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, এম এ, পি-এইচ ডি, এম ডি	...	৫০৲
৪।	ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এস-সি, এম ডি, এফ জেড এস	..	৫০৲
৫।	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	...	৫০৲
৬।	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	...	৫০৲
৭।	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম এ, বি এল ..	...	৫০৲
৮।	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি	...	৫০৲
৯।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল	...	৫০৲
১০।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম্ আর এ এস্ ...	...	১৫৲
১১।	রায়বাহাদুর চুণীলাল বসু, রসায়নাচার্য্য, এম বি, সি আই ই	...	২৫৲
১২।	শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	...	২৫৲
১৩।	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট	...	২৫৲
১৪।	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	..	১৫৲
১৫।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, এম এ	...	১০৲
১৬।	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এফ সি এস (লণ্ডন), এম এ	...	১০৲
১৭।	রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম এ, বি এল	...	১০৲
১৮।	শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ...	...	১০৲
১৯।	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সলিসিটর ...	...	১০৲
২০।	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট	...	১০৲
২১।	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ...	..	৫৲
২২।	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি এ, ...	...	৫৲
২৩।	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ, এম এ ...	...	৫৲
২৪।	শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, এম এ, বি এল ...	...	৫৲
২৫।	শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ...	...	৫৲
২৬।	শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, এম এ	..	৫৲
২৭।	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম এ, পি-এইচ ডি ...	..	৫৲
		মোট	৯১০৲

মুঘল যুগের নর্ত্তকী

মুঘল রীতির চিত্র, ১৭ শতক

কাশী ভারত কলা পরিষদের সৌজন্যে

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে ("Catalogue"এ) উল্লিখিত হয়েছে।[১] পুথিটীর বিষয়—নৃত্যকলা, নাম—'নর্ত্তন-নির্ণয়ম্'। পুথির আরম্ভ এইরূপ—

"ঈশং যতিলয়োপেতং বর্ণভেদৈরুপাশ্রিতম্।
রাসক্রীড়াময়ং নত্বা বক্ষ্যে নর্ত্তন-নির্ণয়ম্॥"

পুথিটী ৪ প্রকরণে সমাপ্ত। চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে,—

"লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিগ্ধপরং পরার্দ্ধসঙ্গতম্।
তন্নর্ত্তনং বিঠ্‌ঠলেন নিঃসন্দিগ্ধমকারি হি॥
অকবর-নৃপ-রুচ্যর্থং ভূলোকে সরলসঙ্গীতম্।
কৃতমিদং বহুতরভেদং সুহৃদাং হৃদয়ে সুখং ভূয়াৎ॥
শ্রীমৎপুণ্ডরীকবিঠ্‌ঠলেন রচিতং লোকোত্তরং সুন্দরম্।
দৃষ্ট্বা নর্ত্তন-নির্ণয়ম্ ভুবি কলৌ তত্তৎপ্রয়োগাধিকান্॥
শ্রীমৎতালমৃদঙ্গগানচতুরশ্রীবংশনৃত্যাগ্রনিম্ (?)
সর্ব্বেষামপি দর্শয়ন্তু গুরবো ভূত্বা সদাপণ্ডিতাঃ॥

ইতি শ্রীকর্ণাট * * * তীয়-পুণ্ডরীক-বিঠ্‌ঠল-বিরচিতে নর্ত্তন-নির্ণয়ে নর্ত্তক-প্রকরণম্ চতুর্থং সমাপ্তম্॥"

উদ্ধৃত শ্লোকে প্রকাশ, কর্ণাটদেশের পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল[২], আকবর বাদশাহের প্রসাদলাভের আশায় গ্রন্থটী রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ বাদশাহ প্রসন্ন হ'য়ে গ্রন্থকারকে পারিতোষিক দিয়েছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, তার পরিচয় অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর 'ষড়্‌-রাগ-চন্দ্রোদয়'[৩] বূরহান খাঁ (খ্রীঃ অঃ ১৫০৯—১৫৫৩)[৪] সুলতানের আশ্রয়ে রচিত। তাঁর আর দু'টী সঙ্গীতগ্রন্থ 'রাগ-মালা' ও 'রাগ-মঞ্জরী'[৫] রাজা মানসিংহ ও মাধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। মুঘল-বাদশাহ ও অন্যান্য মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে নৃত্যকলার বহুল আলোচনা ও বিকাশ হয়েছিল। মুহম্মদ তুঘলকের সময়ের একটী প্রাচীন চিত্রে, মৃদঙ্গ-

---

১ বছর দশেক পূর্ব্বে আমি পুথিটি একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম। তখন যে নোট-গুলি করেছিলাম, তাই অবলম্বন ক'রে এই প্রবন্ধ রচিত হ'ল।

২ সম্ভবতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৩ বালচন্দ্র সীতারাম সুকথনকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত, বোম্বাই, ১৯১২ সংবৎ।

৪ সম্ভবতঃ ইনি আহমদ নগরের নিজামশাহী সুলতান বূরহান নিজাম শাহ (প্রথম)।

৫ নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৪ সংবতে মুদ্রিত।

বাদ্যাদির সহিত ভারতীয় নর্ত্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত নর্ত্তকীবৃন্দ মুঘল-অন্তঃপুরের একটী প্রধান বিলাসোপকরণ ছিল। মেনুচীর গ্রন্থে ঔরংজীবের অন্তঃপুরের নর্ত্তকী-বৃন্দের নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। মুঘল-যুগের একাধিক চিত্রে, নর্ত্তকীদের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মুঘল চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সম্মুখের পৃষ্ঠে ছাপা হ'ল। সম্ভবতঃ আকবর বাদশাহ তাঁর সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির আলোচনা ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নূতন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণাদি, পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল তাঁর এই সঙ্কলন-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও সহায়তায় প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাদশাহগণের উদার রীতি এই ছিল যে, শিল্পকলার প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকাল পাত্রের উপযোগী ক'রে, নূতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত করা। চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যকলায়, এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পারসীক রীতি-পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পারসীক রীতির প্রভাব হয়েছিল। এই নূতন রীতির ভাব ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিল্পীরা বর্জ্জন না ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলার অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিলেন। 'নর্ত্তন-নির্ণয়ে' তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'গজল' (গজর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান-যুগের নূতন আমদানী। এই 'গজল' সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য 'যবন'দের অতি-প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল 'জক্কড়ী'। গ্রন্থকার এই নৃত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন, এবং 'গজর' নামে একটী অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হ'চ্ছে, পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নূতন উপাদানে ভূষিত করেছে।

"যাবনীভাষয়া যুক্তং যত্র গীতং ধৃতাচলম্।
কল্লাদি-গজরাদ্যুক্তম্ স্থাহংগেন (?) বিভূষিতম্॥
বিদধ্যাৎ নর্ত্তনং নানালয়ত্রয়বিচিত্রিতম্।
কোমলাঙ্গৈর্যদা নৃত্যম্ ভ্রমর্য্যাদি (?) বিরাজিতম্॥
সশব্দা চ ক্রিয়া যত্র ধ্রুবসম্পাদি (?) ভেদতঃ।
যত্র চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্ জক্কড়ী মতম্॥
পারসীকৈঃ পণ্ডিতৈস্তু দ্‌গ্রাহাদিস্বরভাষয়া।
যদ্গীতং জক্কড়ীসংজ্ঞং যবনানামতিপ্রিয়ম্॥"

আধুনিক কালের বাইজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হস্তচালনা, বোধ হয়, এই 'চেষ্টা-বিরহিত' 'জক্কড়ী'-নৃত্যের অনুসরণ। বাইজীদের নানা 'মুদ্রা' অবলম্বনে বিচিত্র হস্ত ও অঙ্গুলীচালনা পারসীক রীতির অনুসরণ নহে, পরন্তু ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের বিশিষ্ট 'হস্ত-লক্ষণাদি'র অনুসরণে কল্পিত, তাহা এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয়। আধুনিক নর্ত্তকীদের 'ভাও বাত্‌লানা' প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'হস্তৈকঃ অর্থদর্শনম্'। ভারতীয় নৃত্যকলার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হস্তচালনা বা 'মুদ্রা'র সাহায্যে অভিনয় শিল্পের একটী সম্পূর্ণ 'আঙ্গিক' অভিধান সৃষ্টি। এই 'আঙ্গিক' ভাষায় (gesture language) বাচনিক ভাষার অনেক শব্দ সুকৌশলে অনুবাদ হয়েছিল। এই অঙ্গুলী চালনার (finger-play) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, ভজন ও আরাধনা-গীতি ভারতের অভিনেতারা সুললিত ও সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব্দ-শাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'হস্তমুক্তাবলী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়-বিস্তার এই সাঙ্কেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাঙ্কেতিক ভাষা, বাহ্য বস্তুর অনুকরণের ভাষা। এই 'অনুকারিণী' ভাষা (imitative, objective), সাত্ত্বিক (subjective) ভাষার বিপরীত। নৃত্যশাস্ত্রে অভিনয়ের চার প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। 'সাত্ত্বিক' অভিনয়ে কোনওরূপ বাহ্য চেষ্টা বা অঙ্গ-সঞ্চালনের অপেক্ষা থাকে না, মুখের ভাব অভিনয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। 'নর্ত্তন-নির্ণয়ে'র এই অভিনয়-ভেদ ভরতনাট্য-শাস্ত্রেরই অনুসরণ,—

> "চতুর্দ্ধাভিনয়ং স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্ত্বিকাঃ।
> আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।
> "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
> চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে যেষু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"—ভরত-নাট্য-শাস্ত্র,
> ৬ অধ্যায়, ২৩ শ্লোঃ, কাব্যমালা সংস্করণ।

'আহার্য্য' অভিনয়,- বেশ-ভূষা, অলঙ্কার ও বাহ্য সাজ-সজ্জাদি নেপথ্য-বিধান-ক্রিয়া-লব্ধ ব্যাপার (dress, make-up)।

> "আহার্য্যাভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নৈপথ্যগো বিধিঃ।"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

'আঙ্গিক' অভিনয়,—হস্তচালনাদি দ্বারা ভাব ও বাহ্যবস্তুর অর্থ ও আকার প্রকাশের চেষ্টা (imitative gestures)।

> "চন্দ্র-পদ্ম-গদাদীনাং হস্তৈকৈরর্থদর্শনম্।
> যদা তদা মুনিঃ প্রাহ বাহ্যবস্ত্বনুকারিণীম্॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

সমগ্র নৃত্যকলা এই 'আঙ্গিক' অভিনয়ের অন্তর্গত। এই সূত্রে আর একটী শ্লোকে অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচালনার নির্দ্দেশ আছে,—

"অঙ্গেনালং নয়েদ্গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং ভাবয়েৎ ভাবম্ পাদ্ভ্যাং তালমাদিশেৎ ॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

ভরত মুনির পদানুসরণ ক'রে গ্রন্থকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তম্ ইতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
নাটকাদি-কথা-দেশবৃত্তি-ভাব-রসাশ্রয়ম্ ॥
চতুর্ধাঽভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।
অপুস্ত (?) সর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নভাব-ভূষিতম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোক-মনোহরম্।
হস্তপাদাদি-বিক্ষেপৈঃ চমৎকারাঙ্গ-শোভিতম্।
ত্যক্তাভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্ ॥

* * * * *

দ্রষ্টব্যো নাট্যনৃত্যোঽতে (?) পর্ব্বকালে বিশেষতঃ।
নৃত্তম্ তত্র নরেন্দ্রাণাম্ অভিষেকে মহোৎসবে ॥
যাত্রায়াং দেবযাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে।
নগরাণাম্ আগারাণাং প্রবেশে পুত্রজন্মনি।
শুভার্থিভিঃ প্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
নাট্যং তন্নাটকেষ্বেব যোজ্যং পূর্ব্বকথাযুতম্।
ভাবাভিনয়হীনন্তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে ॥
রস-ভাব-ব্যঞ্জকাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে।
এতন্নৃত্যং মহারাজসভায়াং কল্পয়েৎ সদা ॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

নৃত্য-সভার সমজদার সভাপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তার তালিকা 'সভা নায়ক-লক্ষণে' উদ্ধৃত হয়েছে।

"শ্রীমান্ ধীমান্ বিবেকী বিতরণ-নিপুণো গানবিদ্যা-প্রবীণঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ কীর্ত্তিশালী সরসগুণযুতো হাব-ভাবেষ্বভিজ্ঞঃ।
মাৎসর্য্য-দ্বেষহীনঃ প্রকৃতিহিতসদাচারলীনো দয়ালু-
র্ধীরোদাত্তঃ কলাবান্ নৃপনয়চতুরোঽসৌ সভানায়কঃ স্যাৎ ॥"

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগে এই সকল গুণসম্পন্ন সভানায়ক একেবারে দুষ্প্রাপ্য। কি কি গুণ নর্ত্তকীর অবশ্য থাকা আবশ্যক, নিম্নে উদ্ধৃত ৩টী শ্লোকে তার তালিকা আছে,—

"তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা।
প্রগল্ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহ-মোক্ষয়োঃ॥
নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাত্যুচ্চা নাতিবামনা।
বিশাল-লোচনা গীতবাদ্য-তালানুবর্ত্তিনী॥
পরার্ঘ্য-ভূষা-সম্পন্না প্রসন্ন-মুখ-পঙ্কজা।
এবংবিধগুণোপেতা নর্ত্তকী সমুদাহৃতা॥"

অতঃপর গ্রন্থটীতে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও তার চালনে নৃত্যশাস্ত্রের 'অভিধানের' (vocabulary) বিশদবর্ণনা আছে। নানারূপ মস্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার শিরোভেদের লক্ষণ (definition) ও প্রয়োগের (বিনিয়োগ) (application) নির্দ্দেশ আছে। যথা,—সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত এই নয়টী 'শিরোভেদ'। তার পর আটপ্রকারের 'দৃষ্টি-ভেদ' যথা,—সম, আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত। তার পর সাত প্রকারের 'গ্রীবা-ভেদ।' তার পর 'হস্ত-লক্ষণ' অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ প্রয়োগ আছে। তৎপরে যথাক্রমে 'কটীভেদ' ও 'পাদভেদ'। অতঃপর হস্ত ও পাদাদির সমাযোগে ১৬ প্রকার 'করণের' লক্ষণ ও ভেদ প্রকরণ। অতঃপর নানা জাতীয় নৃত্যের লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালার 'ভবিষ্যৎ', 'সবুজ'-সম্প্রদায়ের 'আধুনিক' মনীষিগণ, সভ্যসমাজে নৃত্যকলার 'পুনঃ প্রবর্ত্তনের' প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাপীঠে নৃত্য-শিক্ষার 'ক্লাস' হইতেছে,—সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিলাম। নানা প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের নৃত্যবিদ্যার প্রাচীন ধারা কিরূপে নিবদ্ধ আছে, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনার যোগ্য।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা

আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অদ্যাবধি পরিচিত থাকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে H. Zimmer প্রণীত Altindisches Leben নামক গ্রন্থে এবং Macdonell ও Keith প্রণীত Vedic Index নামক পুস্তকে বৈদিক প্রাণিগণের আলোচনা করা হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে প্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমরা কিছু নূতন তথ্য পাই নাই। এই গ্রন্থকারগণ টীকাকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণভাবে প্রাণীগুলির আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে মূলগ্রন্থ হইতে প্রাণীগুলির ব্যবহার, প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়া আলোচনা করিব। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে হংসদেব-রচিত মৃগপক্ষিশাস্ত্র নামক একখানি প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। হংসদেব একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আমরা প্রাণীগুলির আলোচনায় তাহাদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বন করিব।

সমুদয় প্রাণীকে প্রাণিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়—আদ্যপ্রাণী ও উচ্চপ্রাণী। প্রত্যেক বিভাগ আবার কতকগুলি দেশে (phylum) বিভক্ত হয়। উচ্চপ্রাণীর অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ দেশের নাম মেরুদণ্ডী বা দণ্ডী (chordata)। দণ্ডিপ্রাণিগণ আবার চারি অন্তর্দেশে বিভক্ত; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ অন্তর্দেশের নাম করোটিক (craniata)। ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি—চক্রতুণ্ডী (cyclostomata), শ্বাসপটী (elasmobranchii), মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীগুলিকে সুবিধার জন্য বর্ণানুক্রমে গ্রহণ

করা হইবে। (ক) স্তন্যপায়ী। ইহারা সন্তান প্রসব করে এবং মাতার স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

(১) অজ।—বেদ ও ব্রাহ্মণে অজ ও অজা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ছাগ ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অজ একপাৎ' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়; ইহা একটী তারকার নাম বলিয়া মনে হয়।

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নানা যজ্ঞে ছাগবলির ব্যবস্থা (অথর্ব্ববেদ ৪।১৪, ৯।৫; বাজসনেয়ি-সংহিতা ১৯।৮৯, ২১।৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫৯, ৬০; ২৮।২৩, ৪৬) ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞেও ছাগবলির কথা (ঋগ্বেদ ১।১৬২।৩; বা. স. ২৫।২৬) পাওয়া যায়। উখা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ৪।২।১০) এবং আহবনীয় অগ্নিকুণ্ড-নির্ম্মাণে (বা. স. ১৩) অশ্বমুণ্ড, বৃষমুণ্ড, মেষমুণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন করা হইত। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তারকাপুঞ্জে নানা প্রাণী এবং পদার্থের আকৃতি কল্পনা করিয়া ঐ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। এক একটী তারকাপুঞ্জের এক একটী নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত প্রাণীগুলির নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জের সংস্থান লক্ষ্য করিয়া ঐ মুণ্ডগুলি সাজান হইত। ছাগের চর্ম্ম বাজপেয় যজ্ঞে আসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বা. স. ২৬।২২)। উখা নির্ম্মাণের জন্য কর্দ্দম-পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়া হইত (তৈ. স. ৪।১।৫)। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করা হইত (বা. স. ১১।৬৫; তৈ. স. ৪।১।৬, ৪।৫।১, ৫।৪।৩)। অগ্নিস্তুতিতে যে শবদাহের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ছাগকে বধ করিয়া শবের উপর স্থাপন করিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করা হইত; ছাগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয়া মনে করা হইত (বা. স. ১১।১৬)।

আমরা ছাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে যে, অগ্নির উত্তাপ হইতে ছাগের জন্ম (বা. স. ১৩।৫; অ. বে. ৪।১৪।১, ৯।৫।১৩); প্রজাপতির উত্তাপ হইতে ছাগীর জন্ম (বা. স. ৫।২৬); অজ অগ্নির সন্তান (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।৪।১৫; গোপথ-ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ ৩।১৯); পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমযজ্ঞের উপাংশু ও অন্তর্যাম পাত্রে ছাগ ও মেষের জন্ম (তৈ. স. ৬।৫।১০); আরও দেখা যায় যে, ছাগই অগ্নি (অ. বে, ৯।৫।৭)। বহু কারণবশতঃ আমরা ঐ ছাগের জন্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারি। ঐ ছাগ Capella নামক তারকা।

(২) অশ্ব।—অশ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা যে বৈদিক সময়ে অতি প্রিয় ও আবশ্যকীয় পশু ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বেদাদিগ্রন্থে অরুষ, অশ্ব, নিযুৎ, পৃষৎ, পৃষতী, রোহিৎ, বাজ, বাজী, বৃষণ, শ্যাব, হর, হরি এবং হরিৎ নামে অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন দধিক্রা, তার্ক্ষ্য, পৈদ্ব এবং এতস নামে অশ্বদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; এগুলি অন্তরীক্ষ-পদার্থ (এতস মধ্যম সূর্য্য এবং অন্যগুলি তারকাপুঞ্জ) বলিয়া আমরা ইহাদের আলোচনা করিব না।

অশ্বকে বেদে অগ্নি, অপাংনপাৎ, অশ্বিনী, ইন্দ্র, উষা, ঋভু, মরুৎ, মিত্রাবরুণ, বায়ু, সূর্য্য, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নানা পদার্থকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; অধিকাংশ স্থলে ঐগুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈদিক ঋষিগণ অশ্বলাভ এবং অশ্বরক্ষার জন্য দেবতাগণের স্তুতি করিতেন (ঋগ্বেদ ২।১।১৬, ৩।৬০।৭, ৪।৩৭।৮, ৫।৫৭।৭, ৭।৪১।৩, ৭।১০০।২, ৯.৮৬.১, ১০।১০৭।৭ ইত্যাদি)। অশ্বের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ১।৮।৬)। ঋগ্বেদে অশ্বনিবাসের দ্বার রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ইন্দ্রকে অশ্বপোষক বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ৮।৬১।৬)।

অগ্নি (ঋ. বে. ৭।৭।১), ইন্দু (ঋ. বে. ৯।৬৪।৩, ৯।১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (ঋ. বে. ৫।৫৯।৫) এবং মিত্রাবরুণকে (ঋ. বে. ৬।৬৭।৪) অশ্বের ন্যায় বেগবান্ বলা হইয়াছে। অনেক দেবতাকে (যেমন অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি) অশ্ব বলা হইয়াছে। অগ্নি ও ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় শব্দকারী বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ৭।৩।২, ১।১৭০।৩); অশ্বকে আবার প্রজাপতি (শ. ব্রা. ১৩।৩।১।১; তৈ. ব্রা. ১।১।৫।৪; তা. ব্রা. ২১।৪।২), বরুণ ও সোমের চক্ষু (শ. ব্রা. ৪।২।১।১১) বলা হইয়াছে। এই ভাবে নানা দেবতাকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অশ্বের জন্মকথা।—প্রথমতঃ, জল হইতে অশ্বের জন্ম (ঋ. বে. ২।৩৫।৬; শ. ব্রা. ৭।৫।২।১৮; তৈ. ব্রা. ৩।৮।৪।৩ ইত্যাদি)। দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রহ্ম (ঋ. বে. ১০।৬৫।১১) অথবা পুরুষ (ঋ. বে. ১০।৯০।১০) হইতে জন্মিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আদিবীজ হইতে (অদ্ভিঃ) অশ্বের উৎপত্তি (শ. ব্রা ৫।১।৪।৫)। এই তিন স্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অশ্ব অন্তরীক্ষস্থ তারকামণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৫।১) উক্ত হইয়াছে যে, অসুরগণ অশ্ব হইয়া পদ হইতে জলক্ষরণ করিয়াছিলেন। এ স্থলে Pegasus নামক তারকাপুঞ্জকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অশ্বের বল এবং ব্যবহারের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া বহু স্থলে অশ্বকে পশুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (তৈ. ব্রা; শ. ব্রা.; তা. ব্রা; ঐ. ব্রা.)। অশ্ব ভারবাহী (ঋ. বে. ৩।৩৮।১), অন্নবাহী (ঋ. বে. ১।৩০।১৭, ৭।৩৭।১) এবং ধনবাহী (ঋ. বে. ৭।৩৭।৬) ছিল। যুদ্ধে অশ্বের

মুঘল যুগের নর্ত্তকী

মুঘল রীতির চিত্র, ১৭ শতক

কাশী ভারত কলা পরিষদের সৌজন্যে

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে (Catalogueএ) উল্লিখিত হয়েছে।[১] পুথিটার বিষয়—নৃত্যকলা, নাম—'নর্ত্তন-নির্ণয়ম্'। পুথির আরম্ভ এইরূপ—

"ঈশং যতিলয়োপেতং বর্ণভেদৈরুপাশ্রিতম্।
রাসক্রীড়াময়ং নত্বা বক্ষ্যে নর্ত্তন-নির্ণয়ম্॥"

পুথিটী ৪ প্রকরণে সমাপ্ত। চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে,—

"লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিগ্ধপরং পরার্দ্ধসঙ্গতম্।
তন্নর্ত্তনং বিঠ্‌ঠলেন নিঃসন্দিগ্ধমকারি হি॥
অকবর-নৃপ-রুচ্যর্থং ভূলোকে সবলসঙ্গীতম্।
কৃতমিদং বহুতরভেদং সুহৃদাং হৃদয়ে সুখং ভূয়াৎ॥
শ্রীমৎপুণ্ডরীকবিঠ্‌ঠলেন রচিতং লোকোত্তরং সুন্দরম্।
দৃষ্ট্বা নর্ত্তন-নির্ণয়ম্ ভুবি কলৌ তত্তৎপ্রয়োগাধিকান্॥
শ্রীমৎতালমৃদঙ্গগানচতুরশ্রীবংশনৃত্যাগ্রনিম্ (?)
সর্ব্বেষামপি দর্শয়ন্ত গুরবো ভূত্বা সদাপণ্ডিতাঃ॥

ইতি শ্রীকর্ণাট * * * তীয়-পুণ্ডরীক-বিঠ্‌ঠল-বিরচিতে নর্ত্তন-নির্ণয়ে নর্ত্তক-প্রকরণম্ চতুর্থং সমাপ্তম্॥"

উক্ত শ্লোকে প্রকাশ, কর্ণাটদেশের পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল[২], আকবর বাদশাহের প্রসাদলাভের আশায় গ্রন্থটী রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ বাদশাহ প্রসন্ন হ'য়ে গ্রন্থকারকে পারিতোষিক দিয়েছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, তার পরিচয় অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর 'ষড়্-রাগ-চন্দ্রোদয়'[৩] বুরহান খাঁ (খ্রীঃ অঃ ১৫০৯—১৫৫৩)[৪] সুলতানের আশ্রয়ে রচিত। তাঁর আর দু'টী সঙ্গীতগ্রন্থ 'রাগ-মালা' ও 'রাগ-মঞ্জরী'[৫] রাজা মানসিংহ ও মাধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। মুঘল-বাদশাহ ও অন্যান্য মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে নৃত্যকলায় বহুল আলোচনা ও বিকাশ হয়েছিল। মুহম্মদ তুঘলকের সময়ের একটী প্রাচীন চিত্রে, মৃদঙ্গ-

১ বছর দশেক পূর্ব্বে আমি পুথিটি একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম। তখন যে নোট-গুলি করেছিলাম, তাই অবলম্বন ক'রে এই প্রবন্ধ রচিত হ'ল।

২ সম্ভবতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৩ বালচন্দ্র সীতারাম সুকথন্‌কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত, বোম্বাই, ১৯১২ সংবৎ।

৪ সম্ভবতঃ ইনি আহমদ নগরের নিজামশাহী সুলতান বুরহান নিজাম শাহ (প্রথম)।

৫ নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৪ সংবতে মুদ্রিত।

বাদ্যাদির সহিত ভারতীয় নর্ত্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত নর্ত্তকীবৃন্দ মুঘল-অন্তঃপুরের একটী প্রধান বিলাসোপকরণ ছিল। মেনুচীর গ্রন্থে ঔরংজীবের অন্তঃপুরের নর্ত্তকী-বৃন্দের নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। মুঘল-যুগের একাধিক চিত্রে, নর্ত্তকীদের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মুঘল চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সম্মুখের পৃষ্ঠে ছাপা হ'ল। সম্ভবতঃ আকবর বাদশাহ তাঁর সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির আলোচনা ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নূতন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণাদি, পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল তাঁর এই সঙ্কলন-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন , এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও সহায়তায় প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাদশাহগণের উদার রীতি এই ছিল যে, শিল্পকলার প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকাল পাত্রের উপযোগী ক'রে, নূতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত করা। চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যকলায়, এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পারসীক রীতি-পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পারসীক রীতির প্রভাব হয়েছিল। এই নূতন রীতির ভাব ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিল্পীরা বর্জ্জন না ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলার অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিলেন। 'নর্ত্তন-নির্ণয়ে' তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'গজল' (গজর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান-যুগের নূতন আমদানী। এই 'গজল' সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য 'যবন'দের অতি-প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল 'জক্কডী'। গ্রন্থকার এই নৃত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন, এবং 'গজর' নামে একটী অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হ'চ্ছে, পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নূতন উপাদানে ভূষিত করেছে।

"যাবনীভাষয়া যুক্তং যত্র গীতং ধ্রুতাচলম্ ।
কল্লাদি-গজরাদ্যুক্তম্ স্বাহংগেন (?) বিভূষিতম্ ॥
বিদধ্যাৎ নর্ত্তনং নানালয়ত্রয়বিচিত্রিতম্ ।
কোমলাঙ্গৈর্যদা নৃত্যম্ ভ্রমর্য্যাদি (?) বিরাজিতম্ ॥
সশব্দা চ ক্রিয়া যত্র ধ্রুবসম্পাদি (?) ভেদতঃ ।
যত্র চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্ জক্কডী মতম্ ॥
পারসীকৈঃ পণ্ডিতৈস্তু দ্গ্রাহাদিস্বরভাষয়া ।
যদ্গীতং জক্কডীসংজ্ঞং যবনানামতিপ্রিয়ম্ ॥"

আধুনিক কালের বাইজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হস্তচালনা, বোধ হয়, এই 'চেষ্টা-বিরহিত' 'জক্কড়ী'-নৃত্যের অনুসরণ। বাইজীদের নানা 'মুদ্রা' অবলম্বনে বিচিত্র হস্ত ও অঙ্গুলীচালনা পারসীক রীতির অনুসরণ নহে, পরন্তু ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের বিশিষ্ট 'হস্ত-লক্ষণাদি'র অনুসরণে কল্পিত, তাহা এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয়। আধুনিক নর্ত্তকীদের 'ভাও বাত্‌লানা' প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'হস্তৈকঃ অর্থদর্শনম্'। ভারতীয় নৃত্যকলার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হস্তচালনা বা 'মুদ্রা'র সাহায্যে অভিনয় শিল্পের একটী সম্পূর্ণ 'আঙ্গিক' অভিধান সৃষ্টি। এই 'আঙ্গিক' ভাষায় (gesture language) বাচনিক ভাষার অনেক শব্দ সুকৌশলে অনুবাদ হয়েছিল। এই অঙ্গুলী চালনায় (finger-play) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, ভজন ও আরাধনা-গীতি ভারতের অভিনেতারা সুললিত ও সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব্দ-শাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'হস্তমুক্তাবলী' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়-বিস্তার এই সাঙ্কেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাঙ্কেতিক ভাষা, বাহ্য বস্তুর অনুকরণের ভাষা। এই 'অনুকারিণী' ভাষা (imitative, objective), সাত্ত্বিক (subjective) ভাষার বিপরীত। নৃত্যশাস্ত্রে অভিনয়ের চার প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। 'সাত্ত্বিক' অভিনয়ে কোনওরূপ বাহ্য চেষ্টা বা অঙ্গ-সঞ্চালনের অপেক্ষা থাকে না, মুখের ভাব অভিনয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। 'নর্ত্তন-নির্ণয়ে'র এই অভিনয়-ভেদ ভরতনাট্য-শাস্ত্রেরই অনুসরণ,—

> 'চতুর্ধাভিনয়ং স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্ত্বিকাঃ।
> আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।
> "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
> চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে যেষু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"—ভরত-নাট্য-শাস্ত্র,
> ৬ অধ্যায়, ২৩ শ্লোঃ, কাব্যমালা সংস্করণ।

'আহার্য্য' অভিনয়,- বেশ-ভূষা, অলঙ্কার ও বাহ্য সাজ-সজ্জাদি নেপথ্য-বিধান-ক্রিয়া-লব্ধ ব্যাপার (dress, make-up)।

> "আহার্য্যাভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নৈপথ্যগো বিধিঃ।"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

'আঙ্গিক' অভিনয়,—হস্তচালনাদি দ্বারা ভাব ও বাহ্যবস্তুর অর্থ ও আকার প্রকাশের চেষ্টা (imitative gestures)।

> "চন্দ্র-পদ্ম-গদাদীনাং হস্তৈকৈরর্থদর্শনম্।
> যদা তদা মুনিঃ প্রাহ বাহ্যবস্ত্বনুকারিণীম্॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

সমগ্র নৃত্যকলা এই 'আঙ্গিক' অভিনয়ের অন্তর্গত। এই সূত্রে আর একটী শ্লোকে অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচালনার নির্দ্দেশ আছে,—

"অঙ্গেনালং নয়েদ্‌গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং ভাবয়েৎ ভাবম্ পাদ্ভ্যাং তালমাদিশেৎ॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

ভরত মুনির পদানুসরণ ক'রে গ্রন্থকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তম্ ইতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
নাটকাদি-কথা-দেশবৃত্তি-ভাব-রসাশ্রয়ম্॥
চতুর্ধাঽভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ।
অপুস্ত (?) সর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নভাব-ভূষিতম্॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোক-মনোহরম্।
হস্তপাদাদি-বিক্ষেপৈঃ চমৎকারাঙ্গ-শোভিতম্।
ত্যক্তাভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্॥

* * * * *

দ্রষ্টব্যো নাট্যনৃত্যোঽতে (?) পর্ব্বকালে বিশেষতঃ।
নৃত্তম্ তত্র নরেন্দ্রাণাম্ অভিষেকে মহোৎসবে॥
যাত্রায়াং দেবযাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে।
নগরাণাম্ আগারাণাং প্রবেশে পুত্রজন্মনি।
শুভার্থিভিঃ প্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
নাট্যং তন্নাটকেষ্বেব যোজ্যং পূর্ব্বকথাযুতম্।
ভাবাভিনয়হীনন্তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে॥
রস-ভাব-ব্যঞ্জকাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে।
এতন্নৃত্যং মহারাজসভায়াং কল্পয়েৎ সদা॥"—নর্ত্তন-নির্ণয়।

নৃত্য-সভার সমজদার সভাপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তার তালিকা 'সভা নায়ক-লক্ষণে' উদ্ধৃত হয়েছে।

"শ্রীমান্ ধীমান্ বিবেকী বিতরণ-নিপুণো গানবিদ্যা-প্রবীণঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ কীর্ত্তিশালী সরসগুণযুতো হাব-ভাবেষ্বভিজ্ঞঃ।
মাৎসর্য্য-দ্বেষহীনঃ প্রকৃতিহিতসদাচারলীনো দয়ালু-
র্ধীরোদাত্তঃ কলাবান্ নৃপনয়চতুরোঽসৌ সভানায়কঃ স্যাৎ॥"

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগে এই সকল গুণসম্পন্ন সভানায়ক একেবারে দুষ্প্রাপ্য। কি কি গুণ নর্ত্তকীর অবশ্য থাকা আবশ্যক, নিম্নে উদ্ধৃত ৩টী শ্লোকে তার তালিকা আছে,—

"তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা।
প্রগল্ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহ-মোক্ষয়োঃ॥
নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাত্যুচ্চা নাতিবামনা।
বিশাল-লোচনা গীতবাদ্য-তালানুবর্ত্তিনী॥
পরার্ঘ্য-ভূষা-সম্পন্না প্রসন্ন-মুখ-পঙ্কজা।
এবংবিধগুণোপেতা নর্ত্তকী সমুদাহৃতা॥"

অতঃপর গ্রন্থটীতে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও তার চালনে নৃত্যশাস্ত্রের 'অভিধানের' (vocabulary) বিশদবর্ণনা আছে। নানারূপ মস্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার শিরোভেদের লক্ষণ (definition) ও প্রয়োগের (বিনিয়োগ) (application) নির্দ্দেশ আছে। যথা,—সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত এই নয়টী 'শিরোভেদ'। তার পর আটপ্রকারের 'দৃষ্টি-ভেদ' যথা,—সম, আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত। তার পর সাত প্রকারের 'গ্রীবা-ভেদ।' তার পর 'হস্ত-লক্ষণ' অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ প্রয়োগ আছে। তৎপরে যথাক্রমে 'কটীভেদ' ও 'পাদভেদ'। অতঃপর হস্ত ও পাদাদির সমাযোগে ১৬ প্রকার 'করণের' লক্ষণ ও ভেদ প্রকরণ। অতঃপর নানা জাতীয় নৃত্যের লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালার 'ভবিষ্যৎ', 'সবুজ'-সম্প্রদায়ের 'আধুনিক' মনীষিগণ, সভ্যসমাজে নৃত্যকলার 'পুনঃ প্রবর্ত্তনের' প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাপীঠে নৃত্য-শিক্ষার 'ক্লাস' হইতেছে,—সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিলাম। নানা প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের নৃত্যবিদ্যার প্রাচীন ধারা কিরূপে নিবদ্ধ আছে, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনার যোগ্য।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা

আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অদ্যাবধি পরিচিত থাকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে H. Zimmer প্রণীত Altindisches Leben নামক গ্রন্থে এবং Macdonell ও Keith প্রণীত Vedic Index নামক পুস্তকে বৈদিক প্রাণিগণের আলোচনা করা হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে প্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমরা কিছু নূতন তথ্য পাই নাই। এই গ্রন্থকারগণ টীকাকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণভাবে প্রাণীগুলির আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে মূলগ্রন্থ হইতে প্রাণীগুলির ব্যবহার, প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়া আলোচনা করিব। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে হংসদেব-রচিত মৃগপক্ষিশাস্ত্র নামক একখানি প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। হংসদেব একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আমরা প্রাণীগুলির আলোচনায় তাহাদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বন করিব।

সমুদয় প্রাণীকে প্রাণিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়—আদ্যপ্রাণী ও উচ্চপ্রাণী। প্রত্যেক বিভাগ আবার কতকগুলি দেশে (phylum) বিভক্ত হয়। উচ্চপ্রাণীর অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ দেশের নাম মেরুদণ্ডী বা দণ্ডী (chordata)। দণ্ডিপ্রাণিগণ আবার চারি অন্তর্দেশে বিভক্ত; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ অন্তর্দেশের নাম করোটিক (craniata)। ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি—চক্রতুণ্ডী (cyclostomata), শ্বাসপট্রী (elasmobranchii), মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীগুলিকে সুবিধার জন্য বর্ণানুক্রমে গ্রহণ

করা হইবে। (ক) স্তন্যপায়ী। ইহারা সন্তান প্রসব করে এবং মাতার স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

(১) অজ।—বেদ ও ব্রাহ্মণে অজ ও অজা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা ছাগ ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অজ একপাৎ' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়; ইহা একটী তারকার নাম বলিয়া মনে হয়।

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নানা যজ্ঞে ছাগবলির ব্যবস্থা (অথর্ব্ববেদ ৪।১৪, ৯।৫ ; বাজসনেয়ি-সংহিতা ১৯।৮৯, ২১।৪০, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫৯, ৬০ ; ২৮।২৩, ৪৬) ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞেও ছাগবলির কথা (ঋগ্বেদ ১।১৬২।৩ ; বা. স. ২৫।২৬) পাওয়া যায়। উখা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ৪।২।১০) এবং আহবনীয় অগ্নিকুণ্ড-নির্ম্মাণে (বা. স. ১৩) অশ্বমুণ্ড, বৃষমুণ্ড, মেষমুণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন করা হইত। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তারকাপুঞ্জে নানা প্রাণী এবং পদার্থের আকৃতি কল্পনা করিয়া ঐ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। এক একটী তারকাপুঞ্জের এক একটী নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত প্রাণীগুলির নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জের সংস্থান লক্ষ্য করিয়া ঐ মুণ্ডগুলি সাজান হইত। ছাগের চর্ম্ম বাজপেয় যজ্ঞে আসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বা. স. ২৬।২২)। উখা নির্ম্মাণের জন্য কর্দ্দম-পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়া হইত (তৈ. স. ৪।১।৫)। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করা হইত (বা. স. ১১।৬৫ ; তৈ. স. ৪।১।৬, ৪।৫।১, ৫।৪।৩)। অগ্নিস্তুতিতে যে শবদাহের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ছাগকে বধ করিয়া শবের উপর স্থাপন করিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করা হইত ; ছাগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয়া মনে করা হইত (বা. স. ১১।১৬)।

আমরা ছাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে যে, অগ্নির উত্তাপ হইতে ছাগের জন্ম (বা. স. ১৩।৫ ; অ. বে. ৪।১৪।১, ৯।৫।১৩) ; প্রজাপতির উত্তাপ হইতে ছাগীর জন্ম (বা. স. ৫।২৬) ; অজ অগ্নির সন্তান (শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।৪।১৫ ; গোপথ-ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ ৩।১৯) ; পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমযজ্ঞের উপাংশু ও অন্তর্যাম পাত্রে ছাগ ও মেষের জন্ম (তৈ. স. ৬।৫।১০) ; আরও দেখা যায় যে, ছাগই অগ্নি (অ. বে, ৯।৫।৭)। বহু কারণবশতঃ আমরা ঐ ছাগের জন্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারি। ঐ ছাগ Capella নামক তারকা।

(২) অশ্ব।—অশ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা যে বৈদিক সময়ে অতি প্রিয় ও আবশ্যকীয় পশু ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বেদাদিগ্রন্থে অরুষ, অশ্ব, নিষুৎ, পৃষৎ, পৃষতী, রোহিৎ, বাজ, বাজী, বৃষণ, শ্যাব, হর, হরি এবং হরিৎ নামে অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন দধিক্রা, তার্ক্ষ্য, পৈদ্ব এবং এতস নামে অশ্বদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; এগুলি অন্তরীক্ষ-পদার্থ (এতস মধ্যম সূর্য্য এবং অন্যগুলি তারকাপুঞ্জ) বলিয়া আমরা ইহাদের আলোচনা করিব না।

অশ্বকে বেদে অগ্নি, অপাংনপাৎ, অশ্বিনী, ইন্দ্র, উষা, ঋভু, মরুৎ, মিত্রাবরুণ, বায়ু, সূর্য্য, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নানা পদার্থকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; অধিকাংশ স্থলে ঐগুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বৈদিক ঋষিগণ অশ্বলাভ এবং অশ্বরক্ষার জন্য দেবতাগণের স্তুতি করিতেন (ঋগ্বেদ ২।১।১৬, ৩।৬০।৭, ৪।৩৭।৮, ৫।৫৭।৭, ৭।৪১।৩, ৭।১০০।২, ৯.৮৬.১, ১০।১০৭।৭ ইত্যাদি)। অশ্বের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ১.৮।৬)। ঋগ্বেদে অশ্বনিবাসের দ্বার রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ইন্দ্রকে অশ্বপোষক বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ৮।৬১।৬)।

অগ্নি (ঋ. বে. ৭।৭।১), ইন্দু (ঋ. বে. ৯।৬৪।৩, ৯।১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (ঋ. বে. ৫।৫৯।৫) এবং মিত্রাবরুণকে (ঋ. বে. ৬।৬৭।৪) অশ্বের ন্যায় বেগবান্ বলা হইয়াছে। অনেক দেবতাকে (যেমন অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি) অশ্ব বলা হইয়াছে। অগ্নি ও ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় শব্দকারী বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ৭।৩।২, ১।১৭০।৩); অশ্বকে আবার প্রজাপতি (শ. ব্রা. ১৩।৩।১।১; তৈ. ব্রা. ১।১।৫।৪; তা. ব্রা. ২১।৪।২), বরুণ ও সোমের চক্ষু (শ. ব্রা. ৪।২।১।১১) বলা হইয়াছে। এই ভাবে নানা দেবতাকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অশ্বের জন্মকথা।—প্রথমতঃ, জল হইতে অশ্বের জন্ম (ঋ. বে. ২।৩৫।৬; শ. ব্রা. ৭।৫।২।১৮; তৈ. ব্রা. ৩।৮।৪।৩ ইত্যাদি)। দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রহ্ম (ঋ. বে. ১০।৬৫।১১) অথবা পুরুষ (ঋ বে. ১০।৯০।১০) হইতে জন্মিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আদিবীজ হইতে (অদ্ভিঃ) অশ্বের উৎপত্তি (শ. ব্রা ৫।১।৪।৫)। এই তিন স্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অশ্ব অন্তরীক্ষস্থ তারকামণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৫.১) উক্ত হইয়াছে যে, অসুরগণ অশ্ব হইয়া পদ হইতে জলক্ষরণ করিয়াছিলেন। এ স্থলে Pegasus নামক তারকাপুঞ্জকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অশ্বের বল এবং ব্যবহারের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া বহু স্থলে অশ্বকে পশুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (তৈ. ব্রা; শ. ব্রা.; তা. ব্রা; ঐ. ব্রা.)। অশ্ব ভারবাহী (ঋ. বে. ৩।৩৮।১), অন্নবাহী (ঋ. বে. ১।৩০।১৭, ৭।৩৭।৬) এবং ধনবাহী (ঋ. বে. ৭।৩৭।৬) ছিল। যুদ্ধে অশ্বের

ব্যবহার ছিল (ঋ. বে. ১।৩৬।৮, ৩।৫৩।২৪, ১০।১০৭।১১ ইত্যাদি)। যুদ্ধে অশ্বারোহণ (ঋ. বে. ৬।৪৭।৩১) এবং রথে অশ্ব যোজনার (যুদ্ধে—ঋ. বে. ৯।১২।১, এবং সাধারণতঃ ঋ. বে. ৫।৫৮।৭, ৯।১১২।৪) উল্লেখ পাওয়া যায়। দুইটী (ঋ. বে. ২।২৪।১২, ৬।৪৭।৯) অথবা দশটী (ঋ. বে. ৮।৩।২৩, ৮।৪৬।২৩) অশ্ব রথে যোজিত হইবার কথাও পাওয়া যায়। অশ্বকে মুক্তা দিয়া সজ্জিত করা হইত (ঋ. বে. ১০।৬৮।১১)। অশ্বের সজ্জা সুবর্ণনির্ম্মিত হইত (ঋ. বে. ৪।২।৮, ৯।৩।৩)। অশ্বপৃষ্ঠে আস্তরণ এবং নাসিকাদ্বয়ের বন্ধন-রজ্জুর উল্লেখ দেখা যায় (ঋ. বে. ৫।৬১।১২)। রজ্জুদ্বারা অশ্বের কুক্ষি বন্ধন করা হইত (ঋ. বে. ৭।১০৪।৬); অদ্যাবধি ঐরূপ কুক্ষি-বন্ধন দৃষ্ট হয়। অশ্বের সক্‌থি ও জঘন দেশে কশাঘাতের উল্লেখ আছে (ঋ. বে. ৬।৭৫।১৩)। ঋগ্বেদে ঘোড়-দৌড়ের কথা দেখিতে পাওয়া যায় (১০।৯৭।৩, ১০।১৪৩।১, ২); ঘোড়-দৌড়ে অশ্ব ও অশ্বী ব্যবহৃত হইত। অথর্ব্ববেদে (৭।৫২।৯) সতরঞ্চ খেলায় অশ্বের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে অশ্ব-দান (৫।৪২।৮, ৬।৪৭।২৩ ইত্যাদি) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৭।৪৭) অশ্ব-দক্ষিণার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৬।৭১।১) অশ্বকে খাদ্যরূপে ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। সর্প-ভয় নিবারণের জন্য অথর্ব্ববেদে সর্প-স্তুতিতে অশ্ব-পুচ্ছের উল্লেখ দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইহা সর্প-ভয় নিবারণের জন্য কোনরূপে ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদে অশ্বের পরিচর্য্যার কথা পাওয়া যায়।—অশ্বের গাত্র মার্জ্জনা করা হইত (১।১৩৫।৫); অশ্বকে স্নান করান হইত (৮।২।২ ; যুদ্ধের পূর্ব্বে ৯।৮২।২); শ্রান্ত অশ্বকে বিশ্রাম করান এবং জল দ্বারা তৃপ্ত করা হইত (২।১৩।৫); পীড়িত অশ্বের সেবা করা হইত (১।১১৭।৪,৯); এবং তৃণ অশ্বের খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে (৬।৩।৪ ; ৭।৩।২)।

ঋগ্বেদে (১।১৬।৪) অশ্বের কেশরের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ অশ্বের কেশর কর্ত্তন করিয়া দিবার রীতি ছিল না। অশ্বের ৩৪ খানি পঞ্জর অস্থি (তৈ. স. ৪।৬।৯)।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বর্ণভেদে নানাপ্রকার অশ্বের উল্লেখ আছে (৭।৩।১৭, ১৮); —অঞ্জেত (চিক্কণ), অঞ্জিসক্‌থ, শিতিপদ, শিতিককুদ, শিতিরন্ধ্র, শিতিপৃষ্ঠ, শিত্যংশ, পুষ্পকর্ণ, শিত্যোষ্ঠ, শিতিভ্রু, শিতিভসদ, শ্বেতানুকাশ, অঞ্জি, ললম, সিতজ্ঞু, কৃষ্ণৈত, রোহিত, অরুণৈত, কৃষ্ণ, শ্বেত, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, অরুণ, গৌর, বভ্রু, নকুল, রোহিত, শোণ, শ্যাব, শ্যাম, পাকল, পৃশ্নিসক্‌থ, পৃশ্নি, কমল ও শবল।

যজ্ঞকার্য্যে অশ্বের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমতঃ, অশ্বমেধ যজ্ঞ। সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে ইহা প্রধান। ঋগ্বেদে (১।১৬২, ১৬৩) ইহার উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতা ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায়ও এই যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে ইহার সম্পূর্ণ

বিবরণ আছে। (বিশ্বকোষ, হিন্দি বিশ্বকোষ এবং Encyclopædia of Religion and Ethics দেখুন)। কি কারণে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রবর্ত্তন হইল, এই একটী প্রশ্ন আছে। Plunket সাহেব তাঁহার রচিত Ancient Calendar and Constellations নামক গ্রন্থে এই প্রশ্নের একটী উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা (১।১৬২, ১৬৩) Pegasus ভিন্ন আর কিছুই নহে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিষুবদ্বৃত্ত Pegasusএর গলদেশের উপর অবস্থিত ছিল। এই আন্তরীক্ষ ব্যাপার হইতে সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয়তঃ, অনেক যজ্ঞানুষ্ঠানে অশ্বমুণ্ড, অশ্বের পঞ্জরাস্থি (তৈ. স. ১।১।২) ব্যবহৃত হইত। অশ্বমেধীয় অশ্বের নানা অঙ্গ বৎসরের নানা বিভাগ এবং প্রকৃতির নানা বিষয়ের সহিত তুলনা করা হইত; ইহার নানা অঙ্গও নানা প্রাণী ও দেবতার জন্য উৎসর্গ করা হইত (তৈ. স. ৭।৫।২৫ ; বা. স. ২৫)। অশ্বকে অগ্নিতে আহুতি দিবার উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ১০।৯১।১৪)।

(৩) আখু।—ঋগ্বেদে (৯।৬৭।৩০) আখু-সংহারের জন্য সোমের স্তুতি দেখা যায়। ইহা যে অনিষ্টকারী ছিল, তাহার এই স্তবেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩।৫৭, ২৪।২৬, ৩৮) আখুকে রুদ্র, ভূমি এবং পিতামাতার (দ্যাবাপৃথ্বীর) পশু বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আখুকে মিত্রের পশু বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৬।৫০।১) আখুর বিপক্ষে অশ্বিনীদ্বয়ের স্তুতি দেখা যায়। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আখু যব নষ্ট করে; সুতরাং যব যে প্রধান খাদ্য ছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমরকোষে আখু অর্থে মূষিক দেখা যায় এবং এই সকল স্থলেও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূষিক ও আখু অর্থে বড় ইন্দুর বলা হইয়াছে (অমরকোষ)। কোন স্থলে আখুকে ছুঁচাও বলা হইয়াছে। মৃগপক্ষিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আখুকে Mus decumanus Pallus বলিয়া মনে হয়। ঐ গ্রন্থে উন্দুরুর উল্লেখ আছে; তাহাকে Nesokia bandicota বলিয়া মনে হয়; এই দুই জাতীয় ইন্দুরকে সাধারণ লোকে এক জাতীয় বলিয়া মনে করে; আবার এই শেষোক্ত ইন্দুরটী দেখিতে কতকটা ছুঁচার মত (কশ দেখুন)।

(৪) উদ্দালক।—(অ. বে. ৩।২৯) ইহা একপ্রকার শ্বেতপাদ মেষ; ইহার বলির কথা ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Ovis vignei Blyth; চলিত কথায় ইহাকে উড়িয়াল বলে।

(৫) উদ্র।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭) মাসের জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০, ২১) জলের উদ্দেশে ইহার বলি দিবার কথা আছে। উদ্র আমাদের উদবিড়াল

(সুইডীয় ভাষায় utter, লিথুয়ানিয়ন ভাষায় udra, ইংরেজিতে otter)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Lutra lutra (Linn.)** অথবা **Lutra vulgaris Erxl.**

(৬) উষ্ট্র।—ঋগ্বেদে (১।১৩৮।২, ৮।৪৬।২৮) যুদ্ধে এবং অন্নবাহকরূপে উষ্ট্রের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। উষ্ট্র-দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৮।৬।৪৮)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৮, ২৪।৩৯) ত্বষ্টা ও মতির উদ্দেশে উষ্ট্র বলির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১।৮।২১) অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে ধূম্রের বলির কথা আছে। Keith সাহেব ইহাকে ধূম্রবর্ণ বৃষ মনে করেন। আমাদের মতে ইহা উষ্ট্র (ইংরেজি dromedary)। উষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক নাম **Camelus bactrianus** ; ধূম্রের নাম **Camelus dromedarius**।

(৭) ঋক্ষ।—ঋগ্বেদে ভল্লুক অর্থে ঋক্ষের ব্যবহার নাই। বহুবচনে (ঋ বে. ১।২৪।১০ ; শ. ব্রা. ২।১।২।৪) Ursa major এবং Ursa minor নামক নক্ষত্রদ্বয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৬।৩৬) সাধারণ লোকের জন্য ঋক্ষ বা ভল্লুক বলির প্রথা ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Melursus ursinus Shaw.**

(৮) ঋশ্য, ঋষ্য।—ঋগ্বেদে (৮।৪।১০) ঋশ্য নামক পশুর উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭) গন্ধর্ব্বদিগের জন্য ঋষ্য বলির কথা আছে। আমরা ঋশ্যকে নীলগাই [**Boselaphus tragocamelus (Pallus)**] বলিয়া মনে করি। H. Smith সাহেব ইহাকে Damalis risia বলিয়াছেন। হিন্দিতে ইহাকে রীছ এবং মারাঠীতে রীস বলা হয়।

(৯) এণ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৬) দিনের উদ্দেশে এণীর বলিদানের কথা আছে। অথর্ব্ববেদেও (৫।১৪।১১) এণীর উল্লেখ আছে। রাজনিঘণ্টুতে এণ একপ্রকার কৃষ্ণসার বলা হইয়াছে (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Antilope cervicapra** (Fauna of British India, Mammalia, পৃ ৫২১)।

(১০) কক্কট।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩২) অনুমতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) ধাত্রীর উদ্দেশে এই প্রাণীর বলিদানের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে একপ্রকার মৃগ বলেন। সায়ণ ইহাকে কর্কট বা কাঁকড়া মনে করেন। আমরা **Axis maculatus** নামে এক প্রকার হরিণের উল্লেখ দেখি, যাহাকে বঙ্গদেশে (রঙ্গপুরে) বড়খোটিয়া বলে। হিন্দিতে চিত্রা বলে। খোটিয়া শব্দ কক্কট হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা কাঁকড়া হওয়াও সম্ভব।

(১১) কপি।—ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৫) বৃষাকপির উল্লেখ আছে ; ইহাকে কপি বলা

হইয়াছে। বৃষাকপি পুংকপি। অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে যে, কপি কাষ্ঠ চর্ব্বণ করে (৬।৪৯।১) এবং ইহা কুকুরদিগের ক্ষতি করে (৩।৯।৪); এই গ্রন্থে (৪।২৭।১১) গন্ধর্ব্বের বিরুদ্ধে স্তোত্রে কপির উল্লেখ আছে। এই স্থলে কপি অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ হওয়া সম্ভব। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) প্রজাপতির উদ্দেশে কপির নাম আছে। বৃষাকপি শব্দটী দ্রাবিড় ভাষার শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হনুমান্ (J. R. A. S., ১৯১৩, পৃ ৪০০)। কপির বৈজ্ঞানিক নাম Entellus entellus.

(১২) কশ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৬, ৩৮) দিবা এবং মাতাপিতার (দ্যাব্যাপৃথিবীর ?) জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭, ১৮) অনুমতি ও মাতাপিতার জন্য এই প্রাণীর বলিদানের কথা আছে। মহীধর কশকে একপ্রকার মূষিক বলেন। হিন্দি ও মারাঠীতে Mus bandicotaকে (বাঙ্গলা-ইক্‌ড়া) ঘোউস্ বা ঘুস্ বলে। সম্ভবতঃ ইহাই কশ হইবে।

(১৩) কশীকা।—ঋগ্বেদে (১।১২৬।৬) ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণ ইহাকে নকুলী বলেন। পাঞ্জাবের সিরমুর প্রদেশে বেজীকে কসিয়া বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Mustela flavigula Bodd. (F. B. I., Mam., পৃ. ১৫৮)।

(১৪) কুলুঙ্গ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৭, ৩২) সাধ্যগণের জন্য ও সোমের উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১১) সোমের জন্য ইহার বলির উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ ইহাকে কুরঙ্গ মৃগ বলেন। অমরকোষে কুরঙ্গ হরিণের একটী নাম। মৃগপক্ষি-শাস্ত্রের বিবরণ হইতে ইহাকে Cervus porcinus Zimm. বলিয়া মনে হয়।

(১৫) কৃষ্ণ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় ইন্ধনকে (২।১) কৃষ্ণ মৃগ বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থে (২৪।৩০, ৩৬) যম এবং রাত্রির উদ্দেশে ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বরুণ (৫।৫।১১), রাত্রি (৫।৫।১৫) এবং সাধারণ লোকের (৫।৫।১৯) জন্য ইহার বলিদানের উল্লেখ আছে। এণ কৃষ্ণের অপর নাম। কৃষ্ণসার আমাদের কালসার হরিণ (এণ দেখুন)। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে কৃষ্ণসারকে বিন্দু চিহ্নিত বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এণ ও কৃষ্ণসার দুইটী ভেদ মাত্র।

(১৬) ক্রোষ্টা।—ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) ক্রোষ্টাকে বন হইতে তাড়াইয়া দিবার প্রার্থনা দেখা যায়। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩২) মায়ুর উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (১১।২।২, ১১) ক্রোষ্টার বিপক্ষে রুদ্রের স্তুতি দেখা যায়। ক্রোষ্টার বৈজ্ঞানিক নাম Vulpes bengalensis Shaw; ইহা খেঁকশিয়াল।

(১৭) ক্ষিপ্কা।—নীলশীর্ষ্ণী দেখুন।

(১৮) খড়্গ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৪০) সাধারণ দেবতার উদ্দেশে ইহার বলিদানের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে খড়্গ মৃগ বলেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে ইহার বিবরণ আছে, ইহা একজাতীয় গণ্ডার—Rhinoceros unicornis Linn.

(১৯) গবয়—ঋগ্বেদে (৪।২১।৮) গবয় লাভের জন্য ইন্দ্রের স্তব আছে; সুতরাং গবয় গৃহপালিত এবং আবশ্যকীয় পশু ছিল। বাজসনেয়ি-সংহিতায় ঈশান (২৪।২৮), বায়ু ও প্রজাপতির উদ্দেশে (২৪।৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১১) বৃষের উদ্দেশে গবয়বলির কথা আছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেও (৩।৮।১১।৩) ইহার উল্লেখ আছে। গবয়ের অপর নাম গোমৃগ, গয়াল ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক নাম Bos frontalis Lambert (B. gavaeus Colebrooke) (F. B. I., Mam, পৃ ৪৮৭)।

(২০) গর্দ্দভ, রাসভ।—বৈদিক সাহিত্যে গর্দ্দভের বহুল উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে (১।৩৪।৯, ১।১১৬।২১, ১।১৬২।২১, ৮।৮৫।৭) গর্দ্দভকে অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহন বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে গর্দ্দভই অশ্বিদ্বয়ের রথের বাহন ছিল; তৎপরে তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বদ্বয় কল্পিত হইয়াছিল। আমরা শুক্ল যজুর্ব্বেদে (২৫।৪৪) দেখিতে পাই যে, অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্ব নিহত হইবার পর যখন তাহার দেহ কর্ত্তিত হইত তখন বলা হইত যে, ঐ অশ্ব গর্দ্দভের সহিত একধুরে বন্ধন করা হইল; এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কথায় স্পষ্টই মনে হয় যে, এই গর্দ্দভ অন্তরীক্ষস্থ অশ্বিদ্বয়ের গর্দ্দভ এবং এই উক্তিতে লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, অশ্বটী বলির পুণ্যফলে স্বর্গে স্থান পাইল ও অশ্বিদ্বয়ের বাহনরূপে পরিণত হইল। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৪।৯) উক্ত হইয়াছে দ্বিরেত বাজী ও গর্দ্দভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৪।৫।১।৯) দেখা যায় যে, ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে গর্দ্দভের উৎপত্তি হয়; তাহা হইতে যাহা ধূলিময় হয়, তাহা গর্দ্দভের স্থান। এই ধূলিরাশি সম্ভবতঃ বৃষরাশিস্থ ছায়াপথের (milky way) অংশমাত্র এবং ঐ স্থলেই গর্দ্দভ কল্পনা করা হইত।

গর্দ্দভের মূঢ়তা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আমরা ঋগ্বেদে (৩।৫৩।২৩) মূর্খকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিতে দেখি। শত্রুকেও (ঋ. বে. ১।২৯।৫) গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গর্দ্দভের ডাকের সহিত দানব (অ. বে. ৮।৬।১০) এবং গর্দ্দভীর ডাকের সহিত ডাকিনীর শব্দের (অ. বে. ১০।১।১৪) তুলনা করা হইয়াছে।

গর্দ্দভ যে ঋষিদের ব্যবহার্য্য পশু ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (৮।৫৬।৩) গর্দ্দভের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে। অথর্ব্ববেদে (৫।৩১।৩) যাহাতে ডাকিনী গর্দ্দভের কিছু ক্ষতি করিতে না পারে তাহার মন্ত্র দেখা যায়।

যজ্ঞকার্য্যে গর্দ্দভের ব্যবহার ছিল। যজ্ঞস্থলের একপার্শ্বে গর্দ্দভকে বন্ধন করিয়া রাখা হইত (বা. স. ১১।১৩, ৪৬; ২৪।৪০); যজ্ঞকার্য্যে ইহার অনুরূপ ব্যবহারও ছিল (তৈ. স. ৪।১।২, ৪৪)।

গর্দ্দভের বৈজ্ঞানিক নাম Equus hemionus বা Asinus indicus Sclater.

আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪।২৮) এবং অথর্ব্ববেদে (৬।৭২।২,৩) পরস্বত নামক পশুর উল্লেখ দেখি। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ঈশান কোণের জন্য ইহার বলির কথা আছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে বাজীকরণ সম্পর্কে ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই আবার পরস্বান্ নাম (তৈ. স. ৫।৫।২১)। কামের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার (মহীধর) ইহাকে মৃগবিশেষ বলেন। ভাস্কর ইহাকে গর্দ্দভ অথবা মহিষ বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গণ্ডার (Macdonell এবং Keith) অথবা বন্য গর্দ্দভ (St. Petersberg Dict., Monier-Williams' Dict.) বলেন। পরস্বান্ বাজীকরণ সম্পর্কে এবং কামের উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, ইহা বন্য ছাগ। আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণ উপলক্ষে ছাগের ব্যবহার ছিল। অধিকন্তু পারস্যদেশে Capra aegagrus নামক একপ্রকার বন্য ছাগ দৃষ্ট হয়, যাহাকে পারস্যবাসীরা পাসং, এবং বেলুচিস্থানবাসীরা ফশিন, পচিন ও বন্‌জকুহি বলে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহা হইতে গৃহপালিত ছাগ জন্মিয়াছে; সুতরাং পরস্বান্ এই বন্য ছাগ হওয়াই সম্ভব।

(২১) গো (গাভী, বৃষ, বৎস)।—আমরা বৈদিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই যে, গাভী ঋষিগণের অতি প্রিয় ও আবশ্যকীয় পশু ছিল।

ঋগ্বেদে গাভী লাভের জন্য নানা দেবতার স্তুতি আছে; ঐ দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনেক স্থলে বহু প্রকারে স্তব করা হইয়াছে। এমন কি, নদী ও ভেকগণের নিকটও গো-প্রার্থনা (ঋ. বে. ৩।৩৩।১২; ৭।১০৩।১০) দেখা যায়।

বৈদিক ঋষিগণ গোসম্পর্কে দেবতাগণের নানা আখ্যা দিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে গো-রক্ষক (ঋ. বে. ৭।১৮।২, ১০।১৯।৩ ইত্যাদি), গো-জনক (ঋ. বে. ৮।৩৬।৫), গো-পালক (ঋ. বে. ৯।৩৫।৫), গো-জেতা (ঋ. বে. ২।২১।১; ৩।৩১।২০ ইত্যাদি) এবং গাভীর শব্দকারক (ঋ. বে. ৯।৯৭।১৩) বলা হইয়াছে। মরুৎগণকে (ঋ. বে. ৬।৫০।১১, ৭।৩৫।১৪ ইত্যাদি) গো-জাতা বা গো-মাতৃক অর্থাৎ গাভীকে তাঁহাদের মাতা বলা হইয়াছে; এ স্থলে মেঘ গাভী নামে অভিহিত হইয়াছে। মরুৎগণের ধেনুতে অবস্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (ঋ. বে. ১।৩৭।৫)। সোমরস (ঋ. বে. ৯।৭২।৪) গাভীগণের স্বামীস্বরূপ। আবার অগ্নি (ঋ. বে. ৭.৫৫।২),

অশ্বিদ্বয় (বা. স. ১৪।২৪) এবং বিষ্ণুকে (ঋ. বে. ৭।২৭।৫) গো-পালক, অগ্নি (বা. স. ১৫।৩৫) ও ইন্দ্রকে (বা. স. ২৬।৪,৫) গোমৎ এবং উষাকে (বা. স. ৩৪।৪০ ; অ. বে. ৩।১৫।৭) গোমতী বলা হইয়াছে। এই সকল স্থলে রশ্মি বা আলোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গাভীর সুখ ও মঙ্গলের জন্য আদিত্য, ইন্দ্র, সোম, রুদ্র প্রভৃতির স্তব করা হইত. গাভীর রক্ষার জন্য ইন্দ্র, পূষা ও রাত্রির স্তব আছে। রুদ্র যেন গোহিংসা না করেন (ঋ. বে. ১।১১৪।৮) এবং তাঁহার বাণ হইতে গো-রক্ষার জন্য প্রার্থনা দেখা যায়। আবার গাভীগুলিকে স্থূল ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য অদিতি (ঋ. বে. ১০।১০০।১০) এবং মিত্রাবরুণের (ঋ. বে. ৫।৬২।৩) স্তব আছে ; এজন্য যজ্ঞডুম্বরের কবচ ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ১৯।৩১।৮)। গাভীগণের পীড়ার উপশমের জন্য অদিতির নিকট রুদ্রীয় ওষধি প্রার্থনা করা হইত (ঋ. বে. ১।৪৩।২)। যাহাতে ডাকিনীগণ গাভীর অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার মন্ত্র রচিত হইয়াছিল (অ. বে. ৪।১৮।৫)। যজ্ঞের পর গাভীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ৪।৭।১০)। অথর্ব্ববেদে (৮।৪।১০) গাভীর অমঙ্গল নিবারণের জন্য মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল।

গাভী রক্ষার জন্য বীর পুরুষ নিযুক্ত করা হইত (ঋ. বে. ৩।৩।১০)।

ঋগেদে গাভী জয়ের জন্য যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় (৬।৩৫।২, ৯।৯৬।৭, ৯।৮৭।৭, ১০।১০২।৫,৯ ইত্যাদি)। যুদ্ধে গাভী জয় করিবার জন্য ইন্দ্র ও সোমের প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

গাভীর নানারূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, গাভীদুগ্ধ। যজ্ঞানুষ্ঠানে গো-দুগ্ধের বহুল ব্যবহার ছিল। সোমরসে গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করা হইত ; ইহাদের সহিত জলও মিশ্রিত করা হইত। গো-দুগ্ধ হইতে দধি (ঋ বে. ৯।৮।১১ ; অ. বে. ৯।৪।৪) এবং ঘৃত (ঋ. বে. ৯।৩১।৫ ; অ. বে. ৯।৪।৪) প্রস্তুত করা হইত। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩।৩।৩।২) শৃত অর্থাৎ সিদ্ধ গো-দুগ্ধ, শর (দুগ্ধের শর), দধি, মস্তু (ঘোল), আতঞ্চন (ঘোলের মাঠা), নবনীত (মাখন), ঘৃত, আমিক্ষা (ঘোলের জল) এবং বাজিনের উল্লেখ আছে। নবপ্রসূতা গাভী (ঋ. বে. ৩।৩০।১৪) যে প্রচুর দুগ্ধ ধারণ করে তাহা ঋষিগণ জানিতেন। প্রচুর গো-দুগ্ধ পাইবার জন্য তাঁহারা অদিতি (ঋ. বে. ১০।১০০।১০), অগ্নি (ঋ. বে. ১০।৬১।৭), ইন্দ্র ও অগ্নি (ঋ. বে. ৬।৭২।৪), সোম (ঋ. বে. ৯।৯৩।৩), দ্যাবাপৃথিবী (ঋ. বে. ১।১৪০।১৩), নদী (ঋ. বে. ১।১৪০।১৩) এবং বিশেষতঃ অশ্বিদ্বয়ের (ঋ. বে. ১।১১৮।২, ১।১১৯।৬, ১০।১০৬।১০ ইত্যাদি) স্তুতি করিতেন। ধেনুগণের উৎসে (দুগ্ধনালী) দশটী যন্ত্রের (gland) উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৬।৪৪।২৪); সোম তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ,

রথ ও শকটে গরু যোজিত হইত (ঋ. বে. ৫।২৭।১, ৬।৪৭।২৬।২৭); দুই ক্ষেত্রেই দুইটী করিয়া গরুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে (ঋ. বে. ৩।৫৭, ৫।২৭।১)। চাষের জন্য গাভী লাঙ্গলে যোজিত হইত (অ. বে. ৩।১৬।৩); আমরা যব চাষের উল্লেখ পাই (ঋ. বে. ১।২৩।১৫)। তৃতীয়তঃ, গাভীর বিনিময়ে দ্রব্যাদির খরিদের প্রথা ছিল। ঋগ্বেদে (৪।২৪।১০) এক স্থলে ঋষি বলিয়াছেন,—কে আমার ইন্দ্রকে ১০টী ধেনুর দ্বারা ক্রয় করিবেন? সম্ভবতঃ ইহা ইন্দ্রের মূর্ত্তি হইবে। চতুর্থতঃ, গাভী হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনের উল্লেখ আছে (ঋ. বে. ১০।৬৪।১১); সুতরাং গাভী সম্পত্তির মধ্যে গণিত হইত। পঞ্চমতঃ, নানা অনুষ্ঠানে গাভীর ব্যবহার ছিল। গাভী দক্ষিণা দেওয়া হইত (তৈ. স. ১।৮।১, ৯); বৈদিক সময়ে গোমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল (তৈ. স. ১।৮।১৯; ২।১।৮ ইত্যাদি)। শবদাহ (অ. বে. ১৮।৪।৩২) এবং বিবাহের মন্ত্রে (অ. বে. ১৪।১।৩৫) গাভীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহে (অ. বে. ১৪।১।৩২) এবং গৃহ-বন্ধন ও গৃহ-মুক্তির সময় (অ. বে. ৯।৩।১৩) গাভীর স্তুতি করা হইত।

গো খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত (ঋ. বে. ৬।৩৯।১; অ বে. ৬।৭১।১); মঘা নক্ষত্রে গোবধ করা হইত (অ. বে. ১৪।১।১৩)। গোবধের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত (ঋ. বে. ১০।৮৯।১৪)। আবার গো অবধ্য বলিয়াও উক্ত হইয়াছে (ঋ. বে. ৯।১৯); এ কারণ মনে হয় যে, যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে বোধ হয় গো-হত্যা নিষেধ ছিল।

গরুর দেহের নানা অংশের ব্যবহার দেখা যায়। গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে (ভাণ্ডে) সোমরস রক্ষিত হইত (ঋ. বে ১।২৮।৯, ৯।৬৫।২৫, ৯।৭৯।৪ ইত্যাদি)। গো-চর্ম্মে দেহ আচ্ছাদিত করা হইত (ঋ. বে. ৮।১।১৭); গো-চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি যুদ্ধরথে সজ্জিত হইত (ঋ. বে. ৬।১২৫।১,২); শবদাহে গো-চর্ম্ম ব্যবহৃত হইত (ঋ. বে. ১০।১৬।৭; অ. বে. ১৮।২।৫৮)। গরুর স্নায়ু (tendon, fibrous tissue) (ঋ. বে. ৬।৭৫।১১, ১০।২৭।২২) এবং অন্ত্রে (অ. বে. ১।২।৩) ধনুর জ্যা প্রস্তুত করা হইত।

অথর্ব্ববেদে (২।৩২।১) গাভীর দেহের অভ্যন্তরে ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যায়। মরুৎগণের কিরীট গরুর শৃঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (ঋ. বে. ৫।৫৯।৩)।

ঋগ্বেদে গো-দান ও গো-দান-গ্রহণের বহু উল্লেখ দেখা যায় (১।১২৬।৩,৫; ৫।৬১।১০; ৭।১৮।২২; ৮।৬।৪৭ ইত্যাদি)। উহাতে শকট সহিত গো-দলের উল্লেখও পাওয়া যায় (৯।২৭।১)। ঋগ্বেদে (৫।৩০।১৫) রুশম জাতির নিকট হইতে বহু ধেনুলাভের উল্লেখ আছে; এই রুশমজাতি আধুনিক রুষীয় হওয়া সম্ভব (Century Dictionary, Russ শব্দ এবং Encyclopaedia

Brittanica, ১৩শ সংস্করণ, **Russia** শব্দ দেখুন)। আমরা ঋগ্বেদে গোদাতাগণের মঙ্গল কামনার জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাই (২।১।১৬, ৫।২৭।২, ৭।৯০।৬ ইত্যাদি)।

গরুর প্রধান খাদ্য তৃণ ছিল (ঋ. বে. ১।৯১।১৩, ৪।৪২।১০, ৭।১৯।৪ ইত্যাদি); তাহাদিগকে যবও খাওয়ান হইত (ঋ. বে. ৭।১৮।১০, ১০।২৭।৮); গরুদিগকে সোমরসও পান করান হইত (ঋ. বে. ৯।৯৯।৩)। গাভীগণের পানের জলের দেবীকে স্তুতি করা হইত (ঋ. বে. ১।২৩।১৮)।

ঋগ্বেদে আমরা গোচারণের ব্যবস্থার কথা দেখিতে পাই; তজ্জন্য গোপা অর্থাৎ রাখালের বন্দোবস্ত করা হইত (ঋ বে.১০।৪।২)। অরণ্যেও গোচারণের কথা আছে (ঋ. বে. ১০।১৪৬।৩,৪), গাভীসমূহের যূথে বিচরণ করিবার উল্লেখ দেখা যায় (ঋ. বে. ৮।৪৬।৩০) এবং বৃষ ঐ যূথের উপর আধিপত্য করিত (ঋ. বে. ৯।১১০।৯)। গাভীদিগকে স্নান করাইবার উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ১০।৭৬।৩)।

গাভীগণের বৎস-বাৎসল্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ১।১৬৪।২৮, ৬।৪৫।২৮, ১০।১৪৫।৬ ইত্যাদি)। গাভী সদ্যোজাত বৎসকে লেহন করে (ঋ. বে. ৯।১০০।৭)। গাভীর প্রসবের পর ফুল ইত্যাদি চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবার কথা দেখা যায় (অ. বে. ৬।৪৯।১)।

ঋগ্বেদে গাভীকে রজ্জুতে বন্ধন (১০।১০০।১২) এবং গাভী ও গো-বৎসকে কর্ণে ধারণ করিয়া আনয়নের কথা (৮।৭০।১৫) দেখা যায়।

গরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল স্থলে 'গো' অর্থে আলোক, রশ্মি বা মেঘকে লক্ষ্য করা হইয়াছে (ঋ বে. ১।২০।৩, ১।৬২।২, ১।১৬১।৩, ৪।৩৩।১,৮; ৪।৩৪।৯, ৬।৩৫।৪, ৪।৪০।৫, ৬।৪৪।১২)। আমরা পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) বিরাট্ পুরুষ হইতে ক্রমশঃ কয়েকটী প্রাণীর জন্ম উপলব্ধি করিতে পারি। ঐ যজ্ঞীয় পুরুষ (১০।৯০।২৭) হইতে ঘোটক এবং দ্বিপঙ্‌ক্তিদন্তবিশিষ্ট পশু (১০।৯০।১০) জন্মিল; তাহা হইতে গাভীগণ এবং ছাগ ও মেষগণ উৎপন্ন হইল। এই বচনগুলি ক্রম-বিকাশবাদের সহিত তুলনীয়।

ঋগ্বেদে (৬।২৮) এবং অথর্ব্ববেদে (৪।২৯) গো-স্তুতি দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মগাভী-দেবত্ব (৫।১৪) এবং মন্ত্রোক্ত বশাদেবত্ব (১২।৪) নামক সূক্তদ্বয়ে গো-রক্ষা ও গো-দান সম্বন্ধে মন্ত্র দেখা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে বহুবিধ দ্রব্যকে গরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দিবারাত্রিকে লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ গাভী বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ১০।৬১।৪)। আকাশের তারকাগুলিকে

ভূরিশৃঙ্গ গতিশীল গোসমূহ (বা. স. ৬।৩) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; আরও উক্ত হইয়াছে (ঋ. বে. ৩।৭।২) যে, দ্যুলোকস্থ ধেনুগণই অভীষ্টবর্ষী অশ্বসমূহ (অর্থাৎ তারকাগণ আলোকময় পদার্থ)। বহু স্থলে মেঘ ও ধনুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে (ঋ. বে. ৩।৫৫।১৬); উক্ত হইয়াছে যে, দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে ; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে, জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু দ্রব্য 'গো'-নামে উক্ত হইয়াছে (শ. ব্রা. ২।২।৪।১৩, ২।৩।৪।৩৪, ৬।৫।২।১৭, ৭।৫।২।১৯, ১৪।২।১।১৭ ; তা. ব্রা. ৪।১।১৭ ; ঐ. ব্রা. ৪।১৬, ৪।১৭ ; তৈ. ব্রা. ৩।৯।৮।৩ ইত্যাদি)।

আমরা এক্ষণে বৃষের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বৃষ নানা রূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা রথে যোজিত হইত (ঋ. বে. ১০।২৭।২০, ১০।৮৫।১১) ; যুদ্ধে রথ টানিত (ঋ. বে. ১০।১০২।৪, ৫)। যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নির নিকটে বৃষের আহুতি দেওয়া হইত (ঋ. বে. ৬।১৬।৪৭ ; ১০।৯১।১৪)। সোমযজ্ঞে সোম আনিবার জন্য বৃষকে রথে যোজনা করা হইত (তৈ. স. ১।৮।১)। যজ্ঞে বৃষের বলির কথা পাওয়া যায় (তৈ. স. ১।৮।২১ ২।২।১০ ৫।৫।২৪)। রাজসূয় যজ্ঞে বৃষ-দক্ষিণার ব্যবস্থা ছিল (তৈ. স. ১।৮।১)। যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ বিবিধবর্ণযুক্ত বৃষের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায় (তৈ. স. ১।৮।১৭, ২।৩।৮, ৪।২।১০)। বৃষের অণ্ডকোষ ছেদনের কথা অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে (৩।৯।২); ঐ বৃষ যজ্ঞে দক্ষিণা-স্বরূপ দেওয়া হইত (তৈ. স. ১।৮।৯)। বৃষদানের উল্লেখও পাওয়া যায় (অ. বে. ৯।৪)। বৃষের মঙ্গলের জন্য (তৈ. স. ৪।৭।১০) এবং তাহার জন্য ঔষধ প্রার্থনাও (তৈ. স. ১।৮।৬) দেখা যায়। পাণ্ডু রোগের বর্ণকে লালবর্ণ বৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (অ. বে. ১।২২।১, ৩)। বিভিন্ন দেবতাকে (যেমন বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি) বৃষ বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে (১।১১।১৮) বৃষ রাশিকে বৃষভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে (শিশুমার দেখুন)।

(২২) গৌর।—ঋগ্বেদে গৌরমৃগ লাভের জন্য ইন্দ্রের স্তুতি আছে (৪।২১।৮); গৌরমৃগের দ্রুতগতির সহিত ইন্দ্রকে যজ্ঞের সন্নিধানে আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে (৭।৯৮।১)। অথর্ব্ববেদে (২০।২২।২, ২০।৮৭।১) ইহার নাম আছে। যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় (বা. স. ১৩।৪৮, ১৭।৯০, ২৪।৩২)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Bos gaurus (F. B. I. Mam. পৃ. ৪৮৪)।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, দেবতা চতুঃশৃঙ্গ গৌর (১৭।৯০)। এ স্থলে "চতুঃশৃঙ্গ" গৌর ধরিলে আমরা ইহাকে "চৌশিং" মৃগ মনে করিতে পারি। দ্রাবিড়

ভাষায় ইহাকে গুরি বা গোরি বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Tetraceros quadricornis.**

(২৩) ঘৃণিবান্।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৯) এই প্রাণীর উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে দীর্ঘগ্রীব তেজস্বী পশুবিশেষ মনে করেন। অভিধানকারগণ ঘৃণি অর্থে উজ্জ্বল, দীপ্তিমান্ বলেন। আফ্রিকা মহাদেশীয় জিরাফের দীর্ঘগ্রীবা আছে এবং ইহা বৃহদাকৃতি পশু। প্লিওসিন্ যুগে এই প্রাণী ভারতবর্ষে বাস করিত; যদিও তুষার যুগের পর ভারতে প্লীষ্টোসিন্ যুগে ইহার কোন কঙ্কাল পাওয়া যায় না, তথাপি পর্ব্বতের গাত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রাবলীর মধ্যে ইহার চিত্র দেখা গিয়াছে, সুতরাং ঘৃণিবান্ জিরাফই হইবে।

(২৪) চমর, সৃমর।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৯) রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহার যজ্ঞে বন্ধনের কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১।৮।১, ৮) 'বামনবাহী' অর্থাৎ খর্ব্বাকৃতি ভারবাহী পশুর উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ ইহা চমর হইবে। চমরের বৈজ্ঞানিক নাম **Bos grunnicus Linn.**

(২৫) জতূ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫, ৩৬) দিবারাত্রির সন্ধিস্থল এবং জনসাধারণের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার ইহাকে পাত্রাখ্য পক্ষী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জতূ অর্থে বাদুড়; হিন্দিতে সাধারণ বাদুড়কে পতাদেবুলি বলে। সুতরাং জতূকে সাধারণ বাদুড় মনে করা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Pteropus medius Temm.**

(২৬) জহকা, জাহক।—তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৫।৫।১৮) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৬) জহকার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে গাত্রসঙ্কোচনী বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইহাকে বেজীজাতীয় পশু (polecat) বলিয়া মনে করেন। অভিধানে জহকা অর্থে কাঁটাচুয়া (hedgehog), বহুরূপী (chameleon) এবং জলৌকা দেখা যায়। পশ্চিম-ভারতে সজারুকে জিকি, জেক্‌রা বলা হয়। সুতরাং জাহকা সজারু হওয়াই সম্ভব। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Hystrix leucura.

(২৭) তারাদর, তারোদর।—অথর্ব্ববেদে (৬।৭২।২) বাজীকরণ মন্ত্রে ইহার নাম পাওয়া যায়। টীকাকার ইহাকে এক প্রকার প্রাণী বলেন। আমরা হিমালয়ের পশ্চিমাংশে একপ্রকার ছাগ দেখিতে পাই, যাহাকে তহর বলা হয় (F. B. I., Mam., পৃ. ৫০৯, ৫১৪)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **Hemitragus jemlaicus Ham.** ছাগ বাজীকরণ ঔষধ সম্পর্কে আয়ুর্ব্বেদে বিখ্যাত। সুতরাং তারাদর এই পশু হওয়াই সম্ভব।

(২৮) তরক্ষু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৪০) রাক্ষসের উদ্দেশে ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৯) সাধারণ লোকের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তরক্ষুর সাধারণ নাম চিতা; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Cynaelurus jubatus। (মৃগপক্ষিশাস্ত্র দেখুন)।

(২৯) দ্বিরেতঃ।—ব্রাহ্মণে (ঐ. ৪।৯; শ. ব্রা. ৬।৩।১।২৩; পঞ্চবিং ৩।১৩) দ্বিরেতের উল্লেখ আছে। Monier-Williamsএর অভিধানে ইহার অর্থ দুইবার গর্ভোৎপাদনকারী (ঘোটকী ও গর্দ্দভীর) গর্দ্দভ অথবা দ্বিগর্ভোৎপাদিকা ঘোটকী (ঘোটক ও গর্দ্দভ কর্ত্তৃক)। আমরা এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ইহার অর্থ অশ্বতর; ইহা গর্দ্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে জন্মায়। (গর্দ্দভ দেখুন)।

(৩০) দ্বীপী।—অথর্ব্ববেদে রাজ্যাভিষেক মন্ত্র (৪।৮।৭), বর্চকাম মন্ত্র (৬।৩৮।২) এবং নিশার স্তবে (১৯।৪৯।৪) দ্বীপীর উল্লেখ আছে। নিশার স্তবে ইহাকে নিশাচর পশু বলা হইয়াছে। বর্চকাম মন্ত্রে দ্বীপীর দেহের ঔজ্জ্বল্যের প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেক মন্ত্রে ইহার দ্বারা রাজাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Felis pardus Linn. ইংরেজিতে ইহাকে leopard বা panther বলে। ইহা চিতাবাঘ। (মৃগপক্ষিশাস্ত্র দেখুন)।

(৩১) ধূম্র।—উষ্ট্র দেখুন।

(৩২) নকুল।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৪।২৬, ৩২) পূষণের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৬।১৩৯।৫) উক্ত হইয়াছে যে, নকুল সর্পকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া আবার খণ্ড দুইটাকে একত্র করিয়া দেয়। আমরা নকুলের এ স্বভাব সম্বন্ধে প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। আবার (অ. বে. ৮।৭।২৩) নকুল ওষধি (চিকিৎসার্থ গাছ) চিনিতে পারে, এ কথা বলা হইয়াছে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, নকুল সর্পবিষের ঔষধ বন হইতে চিনিয়া লইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Herpestes mungo Gmel.

(৩৩) নীলশীর্ষ্ণী।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) অর্যমার উদ্দেশে ক্ষিক্কা ও নীলশীর্ষ্ণীর নাম পাওয়া যায়। ক্ষিক্কাকে টীকাকার রক্তমুখ বানরী বলিয়া অভিহিত করেন। উত্তর-ভারতের সাধারণ বানরের মুখ লালবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Macacus (Innus) rhesus। সম্ভবতঃ ইহাই ক্ষিক্কা। আমরা একপ্রকার বানরকে নীলবানর বলি। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Innus silenus। কেহ কেহ ইহাকে cynocephalus নামক গণের (genus) অন্তর্ভুক্ত করেন। এই গণের অর্থই 'নীলমস্তকযুক্ত'। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই দুই বানরকে এক গণের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(৩৪) ন্যঙ্কু। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৭, ৩২) আদিত্য এবং অনুমতি দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে একপ্রকার মৃগ বলিয়া মনে করেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ হইতে আমরা ন্যঙ্কুকে Gazella bennetti (Sykes) বলিয়া মনে করি।

(৩৫) পরস্বত। গর্দ্দভ দেখুন।

(৩৬) পাংক্ত্র। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৬) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৮) অন্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকার ইহাকে মূষিকবিশেষ বলেন। সম্ভবতঃ ইহা নেংটী ইন্দুর (Mus musculus Linn.)

(৩৭) পিত্ব (পিদ্ব)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩২) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭) অনুমতির উদ্দেশে যজ্ঞে পিত্বের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। টীকাকার ইহাকে মৃগবিশেষ বলিয়াছেন। কাশ্মীরে একপ্রকার ছাগলজাতীয় পশুকে গোরাল (Cemas goral Hardwicke), পিজ, পিজুর প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ইহাই পিত্ব হইবে।

(৩৮) ময়ু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৩।৪৭, ২৪।৩১) ইহার নাম পাওয়া যায়। টীকাকারগণ ইহাকে কৃষ্ণমৃগ এবং অভিধানকারগণ ইহাকে অশ্বমুখ মৃগ বলেন। সুতরাং আমরা জানিলাম যে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ (অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ—অন্য মৃগের তুলনায়) এবং অশ্বমুখ (অর্থাৎ শৃঙ্গবিহীন)। আমরা ইহাকে কস্তুরিমৃগ (Moschus moschiferum) মনে করিতে পারি। ইহার শৃঙ্গ নাই ; বর্ণ কৃষ্ণাভ পিঙ্গল, পশ্চাদ্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। 'ময়ু'র সহিত Musk শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি ?

(৩৯) মর্কট।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩০) রাজার উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Macacus rhesus.

(৪০) মহা অজ।—শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩।৪।১।২) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ কাশ্মীর দেশীয় মর্খোর (Capra megaceros) ; ইহা পাঞ্জাবেও দৃষ্ট হয়। লডাক নামক স্থানে ইহাকে রাচে বা রাফোচে (অর্থ বৃহৎ ছাগ) বলা হয়।

(৪১) মহিষ।—বৈদিক সাহিত্যে মহিষ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। মহিষের উগ্রমূর্ত্তি এবং শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক দেবতাকে (যেমন ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি) ইহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রের দুই শৃঙ্গ মহিষের শৃঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মহিষের জলপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৯।৯২।৬)। ইহার জলে অবগাহনের উল্লেখও আছে (ঋ. বে. ৯।৮৭।৭)। মহিষের পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে উঠিবার

কথা পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৯।৯৫।৪)। মহিষের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণের কথাও দেখিতে পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৫।২৯।৭।৮, ৬।১৭।১১, ৮।৭৭।১০)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৮) বরুণের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

(৪২) মাম্বাল, মাম্বীলব।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৮) ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৮) পিতার (অন্তরীক্ষ) জন্য যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টীকাকারের মতে ইহা একপ্রকার মূষিক। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ভাস্কর ইহাকে মহোদভুজ বা শকুনি-কুট্টক বলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩।২৬) ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণের মতে ইহা বাদুড়। 'মহোদভুজ' শব্দের অর্থ, যাহার বৃহৎ এবং লিপ্ত ভুজ আছে। শকুনিকুট্টক অর্থে শকুনির ন্যায় যে ছেদন করে; সুতরাং ইহা একপ্রকার Vampire bat। সম্ভবতঃ ইহা Megaderma lyra. এই রক্তশোষক বাদুড় সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয়।

(৪৩) মূষ, মূষিক।—আমরা ঋগ্বেদে মূষের (১।১০।৫।৮) উল্লেখ দেখি। মূষের সূত্র কাটিবার কথা আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, সর্পগণের উদ্দেশে মূষিক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত (২৪।৩৬)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Mus rattus Linn.

(৪৪) মৃগ।—ঋগ্বেদে মৃগ সাধারণ পশুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে হরিণকে মৃগ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে (১।৮০।৭, ৫।৩৪।২, ৮।২।৬, ৮।৯৩।১৪) মায়া দ্বারা বৃত্রের মৃগরূপ ধারণের কথা পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহার অনুকরণে রামায়ণে মায়ামৃগের রচনা করা হইয়াছিল। এই মৃগ সম্ভবতঃ অন্তরীক্ষস্থ Orion হইবে। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে কৃষ্ণসারকে (Antilope cervicapra) মৃগ বলা হইয়াছে।

(৪৫) মেষ।—বৈদিক গ্রন্থে মেষের বহু উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে মেষ বলা হইয়াছে (১।৫১।১, ১।৫২।১, ৮।৯৭।১২)। সায়ণ বলেন যে, মেধাতিথির যজ্ঞে ইন্দ্র মেষরূপ ধারণ করিয়া সোম পান করিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে মেষ বলিবার কারণ কি? উত্তর অয়নান্তের অধিপতি ইন্দ্রের মেষরাশির অবস্থান কি জ্ঞাপিত করা হইয়াছে? অশ্বিদ্বয়কেও মেষদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মেষ ও মেষীর মঙ্গলের জন্য রুদ্রের স্তব করা হইত (ঋ. বে. ১।৪৩।৬; বা. স. ৩।৫৯)।

মেষের নানারূপে ব্যবহার লক্ষিত হয়। মেষলোম সোমরস ছাঁকিবার জন্য ব্যবহৃত হইত (ঋ. বে. ৯।৫০।৩, ৯।৬১।১৮ ইত্যাদি)। মেষলোম রাশীকৃত করিয়া তাহার উপরে শয়নের ব্যবস্থা করা হইত (ঋ. বে. ১০।১৮।১০)। মেষমাংস-রন্ধন ও ভক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ. বে. ১০।২৭।১৭)।

মেষ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত (ঋ. বে. ১০।৯১।১৪) এবং নানা দেবতার জন্য মেষ বলির ব্যবস্থা ছিল (বা. স. ১৯।৯০, ২০।৭৮, ২১।৩০, ৩১ ; ২১।৪০, ৪৬,৪৭ ; ২৪।৩০, ৩৮ ; ২৯।৫৮)। আদিত্যের জন্য মেষশাবক বলি দেওয়া হইত (তৈ. স. ১।৮।১৯)। অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের এক পার্শ্বে মেষকুণ্ড স্থাপিত হইত। অন্যান্য অনুষ্ঠানেও (তৈ. স. ৪।২।৫, ৪।২।১০) মেষের উল্লেখ দেখা যায়। উপাংশু এবং অন্তর্যাম হইতে মেষের জন্ম বলা হইয়াছে (তৈ. স. ৬।৫।১০)

(৪৬) রুরু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৯) রুদ্রের উদ্দেশে এই পশুর যজ্ঞে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মৃগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ হইতে রুরুকে বড়াশিং অর্থাৎ cervus duvanceli বলিয়া মনে করা যায়।

(৪৭) লোপাশ।—ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) লোপাশের বরাহকে তাড়াইয়া দেওয়ার কথা আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৬) অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে এই পশুর যজ্ঞে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২১) অর্য্যমার উদ্দেশে ঐরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা খেঁকশিয়াল জাতীয়; বৈজ্ঞানিক নাম Vulpes alopex Linn., F. B. I., Mam., পৃ. ১৫৩।

(৪৮) বভ্রুক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৬) চতুর্দ্দিকের অন্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহের উদ্দেশে এই প্রাণীর যজ্ঞে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা একজাতীয় পিঙ্গলবর্ণের নকুল (St. Petersburg Dict.)। ইহা সম্ভবতঃ Herpestes griseus Geoffroy। ইহাকেও নেউল বলা হয়।

(৪৯) বরাহ।—ঋগ্বেদে বরাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রকে বরাহ বলা হইয়াছে (৮।৭৭।১০); ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকেও বরাহ বলা হইয়াছে (১।৬১।৭, ১০।৯৯।৬)। অথর্ব্ববেদে বরাহকে গ্রাম্যপশু বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে (১২।১।৪৮); আরও উক্ত হইয়াছে যে, বরাহ ঔষধি জ্ঞাত আছে (৮।৭।২৩)। ঋগ্বেদে বরাহের মাংস খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে (গো. ব্রা. পূ. ২।২) বরাহের ক্রোধের কথার উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণে পৌরাণিক বরাহ অবতারের উপাখ্যানের ভিত্তি পাওয়া যায়। এমূষ নামক বরাহ পৃথিবীকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি পৃথিবীর পতি প্রজাপতি (শ. ব্রা. ১৪।১।২।১১)। প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করিয়া নিমজ্জিত হইয়াছিলেন (তৈ. ব্রা. ১।১।৩।৬)।

বরাহের বৈজ্ঞানিক নাম Sus indicus.

(৫০) বার্ধ্রাণস, বার্ধ্রীণস।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৯) মতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আকাশের (৫।৫।২০, উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। বাজসনেয়ির টীকাকার ইহাকে 'কণ্ঠে স্তনবান্ অজ' মনে করেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে খড়্গমৃগ বলেন; আবার ভাস্কর ইহাকে কঙ্কণচারিক বলিয়া ধরেন। ইহা গণ্ডার হওয়াই সম্ভব।

(৫১) বৃক।—বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে কতিপয় দেবতাকে বৃক বলা হইয়াছে (৮।৫৫।১, ৮।৫৬।১ ইত্যাদি)। ঋগ্বেদে চারি স্থলে (১।১০৫।১৮, ১।১১৬।১৪, ১।১১৭।১৬, ১০।৩৯।১) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিদ্বয় বৃকের মুখ হইতে বর্ত্তিকাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; এই রূপক উক্তিতে বৃক সূর্য্য এবং বর্ত্তিকা ঊষা বলিয়া মনে করা হয়।

বৃকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিরা দেবতাগণের স্তব করিতেন (ঋ. বে. ১।৪২।২, ১।১৮৩।৪, ২।২৩।৭, ২।২৮।১০, ২।২৯।৬, ২।৩৪।৯, ৭।৩৮।৭, ৮।৬৭।১৪; অ. বে. ১২।১।৪৯ ইত্যাদি)। বৃককে নাশ করিবার জন্যও আমরা দেবতাগণের স্তুতি দেখিতে পাই (ঋ. বে. ৬।৫৩।৬; অ. বে. ১৯।৪৭।৮; বা. স. ৯।১৬, ২১।১০)। অথর্ব্ববেদে (৪।৩।১, ৪) বৃকের বিপক্ষে মন্ত্র উচ্চারিত হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃকদ্বারা ঋষিগণ বড়ই উৎপীড়িত হইতেন।

বৃক ঋষিগণের ছাগ, মেষ ও গাভী লইয়া যাইত। বৃক মেষ বধ করিত (অ. বে. ৫।৮।৪)। বৃক যাহাতে মেষ বধ না করিতে পারে, সে জন্য নিশার নিকট স্তুতি করা হইত (অ. বে. ১৯।৪৭।৬)। বৃক মেষীকে কম্পিত করে (৮।৩৪।৩)। ছাগ ও মেষ বৃককে দেখিলে দ্রুতগতিতে পলায়ন করে (অ. বে. ৫।২১।৫)। বৃকের হিংসাপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া পণি (ঋ. বে. ৬।৫১।১৪) এবং চোরকে (ঋ. বে. ৮।৬৬।৮) বৃকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চোর পথিকদের বিনাশকারী। স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের হৃদয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (ঋ. বে. ১০।৯৫।১৫)। বৃক যেন গোবৎস বধ করে, এইরূপ অভিশাপ দেওয়া হইত (ঋ. বে. ১২।৪।৭)।

মনের উদ্দেশে যজ্ঞে বৃককে বন্ধনের উল্লেখ আছে (বা. স. ২৪।৩৩)।

বৃকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা পাওয়া যায়। প্রজাপতির উপস্থের লোমই বৃকের লোম (অর্থাৎ ঐ লোম হইতে বৃকের জন্ম—বা. স. ১৯।৯২); প্রজাপতির কর্ণমল হইতে বৃকের উৎপত্তি (শ. ব্রা. ৫।৫।৪।১০); আবার তাঁহার মূত্র হইতে ওজঃ নির্গত হইয়াছিল এবং ঐ ওজঃ হইতে বৃকের জন্ম (শ. ব্রা. ১২।৭।১।৮)।

বৃকের বৈজ্ঞানিক নাম Canis lupus Linn.; পারস্যবাসীরা ইহাকে গুর্গ্ এবং বেলুচিস্থানে খর্ক্ বা গুর্ক্ বলে। (সালাবৃক দেখুন)।

(৫২) ব্যাঘ্র।—ঋগ্বেদে ব্যাঘ্রের নাম নাই। অথর্ব্ববেদে (৮।৫।১১, ১৯।৩৯।৪) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২।৭।১।৮) ব্যাঘ্রকে পশুরাজ বলা হইয়াছে। ইহা আরণ্য পশু (ঐ. ব্রা. ৮।৬); ইহার উপদ্রব নিবারণের জন্য মন্ত্র দেখা যায় (অ. বে. ৪।৩।১, ৩, ৪, ৭)। ব্যাঘ্র নিশাচর (অ. বে. ১৯।৪৯।৪)। ব্যাঘ্রকে অগ্নি (তৈ স. ৬।২।৫; অ. বে. ১২।২।৪), ছন্দঃ (বা. স. ১৪।৯) ও রাজার (অ. বে. ৪।২২।৭) সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কোন শিশুর জন্মদিন অমঙ্গলসূচক হইলে ঐ দিনকে ব্যাঘ্রের দিন বলা হইত (অ. বে. ৬।১১০।৩)।

রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ৪।৮।৪)। পঞ্চচোড়া ইষ্টক স্থাপনের মন্ত্রে (তৈ. স. ৪।৪।৩) ব্যাঘ্রকে ইষ্টকের অস্ত্ররূপে পরিগণিত করা হইত।

প্রজাপতির লোম ব্যাঘ্রের লোম (বা. স. ১৯।৯২)। বিসূচিকা ব্যাঘ্রকে রক্ষা করে (বা. স. ১৯।১০)। ব্যাঘ্রের বৈজ্ঞানিক নাম **Felis tigris Linn.**

(৫৩) শকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩২) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) এই প্রাণীর উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৩।১৪।৪) শকার ন্যায় গাভীর বংশবৃদ্ধির প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারগণ ইহাকে মক্ষিকা, পক্ষী অথবা কোন পশু বলিয়া জ্ঞাপন করেন। বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার শকাকে শকুন্তি নামক পক্ষী বলেন (শকুন্তক পক্ষী দেখুন)। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে মক্ষি বা দীর্ঘকর্ণ পশু বলেন। আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতা ও অথর্ব্ববেদে শশের উল্লেখ পাই; সুতরাং শকাকে দীর্ঘকর্ণ পশু মনে করিলে ইহা শশক জাতীয় কোন পশু হইতে পারে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে এক জাতীয় শশক দৃষ্ট হয় (**Lepus dayanus Blanford**); সম্ভবতঃ ইহা শকা হইতে পারে।

অথর্ব্ববেদে যে শকার উল্লেখ আছে, তাহা মক্ষিকার কীটাবস্থা (larva) হওয়া সম্ভব। শক অর্থে গোময়। গোময়ে মাছি বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে এবং ঐ ডিম হইতে কীট বাহির হয়। এই মক্ষিকার কীটাবস্থাকেই বোধ হয় শকা বলা হইয়াছে।

(৫৪) শরভ।—ঋগ্বেদে (৮।১০০।৬) যে শরভের উল্লেখ আছে, তাহা কোন ঋষির নাম বলিয়া মনে হয়; তাঁহাকে ঋষির বন্ধু বলা হইয়াছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৩।৫১) আহবনীয় অগ্নি স্থাপনের মন্ত্রে শরভের নাম পাওয়া যায়। টীকাকার ইহাকে অষ্টপাদবিশিষ্ট সিংহঘাতী অরণ্যমৃগবিশেষ বলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে কাল্পনিক প্রাণী বলিয়া মনে করেন। ইহাকে পশুর পরিবর্ত্তে সাধারণ প্রাণী ধরিলে আমরা লৌতেয় শ্রেণীর (Arachinida)

অন্তর্গত কোন বৃহদাকার বিষাক্ত মাকড়সা মনে করিতে পারি। মাকড়সার অষ্ট পদ। বড় বড় মাকড়সা ছোট পক্ষী ধরিয়া তাহার দেহের রস শোষণ করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সার বিষ আছে, তাহাতে বড় পশুও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং শরভ এইরূপ কোন মাকড়সা হওয়া অসম্ভব নহে।

আবার অথর্ব্ববেদে (৯।৫।৯) শরভ বা শলভ (পৈপ্পলাদ শাখা) নামের যে উল্লেখ আছে, তাহা গঙ্গাফড়িঙ্ জাতীয় কোন পতঙ্গ ; ইহার ছয় পাদ এবং দুইটী শুণ্ডিকা (antennae) আছে। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে শরভের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা কস্তূরি-মৃগ (Moschus moscifera var. chrysogaster)।

(৫৫) শল্যক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৫) স্ত্রী দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞে এই পশু ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের টীকাকার ইহাকে শ্বাবিৎ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। আবার এই গ্রন্থে (২৪।৩৩) ভূমির উদ্দেশে শ্বাবিতের উল্লেখ আছে এবং শ্বাবিৎকে (২৩।৫৬) কুরুপিশংগিলা (ঘোর পিঙ্গলবর্ণ) বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০) দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার বন্ধনের উল্লেখ আছে। শ্বাবিৎ অর্থে, যে কুকুরকে বিদ্ধ করে। দুই প্রকার সজারুর স্বভাব সম্বন্ধে এই কথা জানা আছে। কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা পশ্চাদ্দিকে গমন করতঃ তাহাকে বিদ্ধ করে (F. B. I., Mam., পৃ. ৪৪৩।৪৪৪)। আমাদের মনে হয়, শল্যক ও শ্বাবিৎ দুইটী ভিন্ন পশু, কিন্তু এক গণভুক্ত। শল্যকে হিন্দীতে সায়ল, সাহি, সর্সেল বলে ; ইহাই সাধারণ সজারু (Hystrix leucura)। শ্বাবিৎকে আমরা Hystrix hodgsonis বলিয়া ধরি ; ইহা হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকের গাত্রে নেপাল প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়।

(৫৬) শশ।—ঋগ্বেদে এক স্থলে (১০।২৮।৯) শশের নাম পাওয়া যায় ; উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশক তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষুর গ্রাস করিতে পারে ইহাতে মনে হয় যে, ঐরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই শশক শীকারের ব্যবস্থা ছিল। শশ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গমন করে (বা. স. ২৩।৫৬)। বাজসনেয়ি-সংহিতায়ও (২৪।৩৬) নির্ঋতির (অমঙ্গল) উদ্দেশে যজ্ঞে শশ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায়ও (৫।৫।১৮) ঐরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৫।১৮।৪) যে শশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা কোন তারকাপুঞ্জ (Lepus)। শশের বৈজ্ঞানিক নাম Lepus ruficaudatus (F. B. I., Mam., পৃ. ৪৫০)।

(৫৭) শার্দূল।—ব্যাঘ্র দেখুন।

(৫৮) শিংশুমার।—ঋগ্বেদে (১।১১৩।১৮) শিংশুমারের উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাদের রথে বৃষ ও শিংশুমারকে এক সঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন। বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪।২১, ৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমুদ্রের উদ্দেশে যজ্ঞে শিংশুমার ব্যবহৃত এবং বলি হইত। অথর্ব্ববেদে ভবদেবতার স্তবে (১১।৭।৪,৫) আমরা কয়েকটী প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই এবং এই দেবতাকে তাহাদের অধিপতি বলা হইয়াছে। ঐ প্রাণীগুলির মধ্যে শিংশুমারের নাম আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৫ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬২) শিংশুমার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে এবং কয়েকখানি পুরাণে যে শিংশুমারের কথা পাওয়া যায়, তাহা অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ। শিংশুমার প্রাণীর আকৃতি কল্পনা করিয়া ঐ তারকাপুঞ্জকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধুনিক সময়ে অনেকে Ursa minor নামক তারকাপুঞ্জকে শিংশুমার মনে করেন। Proctor কৃত Myths and Marvels of Astronomyতে (পৃ. ৩৪৯) Draco নামক তারকাপুঞ্জের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহাই আমাদের শিংশুমার। আধুনিক অভিধানে শিংশুমার বা শিশুমারকে শিশুক বা শুশুক বলা হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Platinista gangetica. আমাদের মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে যখন শিংশুমার অন্তরীক্ষে কল্পিত হয়, তখন ইহা অন্য কোন প্রাণীর আকৃতি হইতে লওয়া হইয়াছিল এবং এই প্রাণীর চারিটী পদ ও পুচ্ছ ছিল। ইহা সম্ভবতঃ সরটশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাণী হইবে।

(৫৯) শ্বা।—ঋগ্বেদে শ্বা বা কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায় : ইহা গৃহপালিত এবং ভারবাহী (ঋ. বে. ৮।৪৬।২৮) পশু ছিল। কুকুর শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত ; সম্ভবতঃ দুইটী করিয়া কুকুর এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত ; কারণ, অশ্বিদ্বয়কে এইরূপ দুইটী কুকুরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (ঋ. বে. ২।৩৯।৪)। অথর্ব্ববেদে (৪।৩৬।৬) কুকুরের সাহায্যে সিংহ শিকারের আভাস পাওয়া যায়। কুকুর গমনকালে যে জিহ্বা বহির্গত করিয়া সঞ্চালন করে, তাহারও উল্লেখ আছে (ঋ. বে. ৯।১০১।১)। যজ্ঞ-নষ্টকারী কুকুরকে বিনাশ করিবার কথা পাওয়া যায় (ঋ. বে. ৯।১০১।৩) ; সুতরাং যজ্ঞাদি কার্য্যে কুকুর অস্পৃশ্য ছিল বলিয়া মনে করা যায়। শত্রুদিগকে (ঋ. বে. ৪।১৮।১৩) কুকুরের সহিত তুলনা করা হইত। এরূপ ধারণাও ছিল যে, দানবগণ কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া হিংসা করিত। ইহাদের বিনাশের জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করা হইত (ঋ. বে. ৭।১০৪।২২)। কুকুরকে যমের প্রহরী বলিয়া মনে করা হইত (ঋ. বে. ১০।১৪।১০-১২; অ. বে. ৮।১।৯, ১৮।২।১২)। বামদেব ঋষি খাদ্যাভাবে কুকুরের অন্ত্র পাক করিয়া খাইয়াছিলেন (ঋ. বে. ৪।২৮।১৩)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রে (২২।৮)

কুকুরের স্তুতি এবং রাক্ষসের উদ্দেশে (২৪।৪০) কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে কয়েক স্থলে (৭।৫৪, ৮।৫৫, ১০।৯৬।৪) যে শ্বার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা অন্তরীক্ষস্থ তারকামণ্ডলী, নাম Canis major.

(৬০) শ্বাপদ।—মাংসাশী পশুগণকে (carnivora) শ্বাপদ বলা হয়। বেদে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১০।১৬।৬) শ্বাপদের দংশন-জনিত ক্ষত আরোগ্যের জন্য অগ্নির স্তুতি দেখা যায়। অথর্ব্ববেদেও (১১।১১।১০, ১১।১২।৮, ১৮।৩।৫৫) শ্বাপদের উল্লেখ আছে।

(৬১) শ্বাবিৎ।—শল্যক দেখুন।

(৬২) সালাবৃক। ঋগ্বেদে (১০।৭৩।৩, ১০।৯৫।১৫) ইহার উল্লেখ আছে; ইহার নিষ্ঠুরতার কথাও পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২।৪।১২, ৬।২।৭), ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৭।২৮।৩।১) এবং তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে (৮।১।৪, ১৩।৪।১৭, ১৮।১।৯, ১৯।৪।৭) উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র যতিরূপী অসুরগণকে সালাবৃক দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, ইহা কোন আন্তরীক্ষ নৈসর্গিক ব্যাপার, রূপক উক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সালাবৃক অর্থে গৃহবৃক; আমরা জানি যে, একজাতীয় বৃক গৃহপালিত; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Canis pallipes (F. B. I., Mam., পৃ. ১৩৭-১৪০)।

(৬৩) সিংহ।—বৈদিক সাহিত্যে সিংহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়; এজন্য আমাদের মনে হয় যে, বৈদিক সময়ে সিংহ বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হইত। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে সিংহের ছয়টী ভেদের উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে বৈশ্বানর (৩।২।১১), সোম (৯।৯৭।২৮), বৃহস্পতি (১০।৬৭।৯) এবং মরুৎ-গণের শব্দ সিংহনাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র (ঋ. বে. ৪।১৬।১৪) এবং সোমকে (ঋ. বে. ৯।৮৯।৩) সিংহের ন্যায় বলবান্ বলা হইয়াছে। মেঘের গর্জ্জন (৫।৮৩।৩) এবং দুন্দুভির ধ্বনি (অ. বে. ৫।২০।১,২) সিংহনাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৪।৯) ছন্দঃগুলিকে সিংহাদি বহু প্রাণীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রাজাকে সিংহরূপ বলা হইয়াছে (অ. বে. ৪।৮।৭, ৪।২২।৭)। সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য পৃথিবীর স্তুতি দৃষ্ট হয় (অ. বে. ২১।১।৪৯)। অথর্ব্ববেদে (৮।৫।১২) কবচ ধারণ করিয়া সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা পাওয়া যায়; ইহাতে মনে হয় যে, সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই এই কবচ ধারণের উদ্দেশ্য। আবার ইন্দ্রের স্তবে (ঋ. বে. ১০।২৮।৪) সিংহ হইতে হরিণের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৯।১০) উক্ত হইয়াছে যে, বিসূচিকা দেবী যেমন ব্যাঘ্র, বৃক, সিংহ ও শ্যেনকে রক্ষা করেন, তেমন মনুষ্যকেও রক্ষা করুন।

সিংহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায়। ইহা নিশাচর (অ. বে. ১৯।৪৯।৪), গুহায় লুক্কায়িত হইয়া থাকে (ঋ. বে. ৩।৯।৪) ; ইহার সৌন্দর্য্যের উল্লেখও আছে (অ. বে. ৬।৩৮।১)। ঋগ্বেদে সিংহ শিকার (৫।৭৪।৪) এবং সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা (১০।২৮।১০) দেখিতে পাওয়া যায়। কুকুর সিংহকে উত্ত্যক্ত করে (অ. বে. ৪।৩৬।৬) অর্থাৎ সিংহ কোন জনস্থানে প্রবেশ করিলে কুকুর তাহার প্রতি ধাবমান হয়।

যজ্ঞ-মন্ত্রে সিংহ ও সিংহীর নাম পাওয়া যায় (বা. স. ৫।১০, ১২ ; ২১।৪০ ; তৈ. স. ১।১।১২, ৫।৩।১)। মরুতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে সিংহের বলি (বা. স. ২৪।৪০) হইত।

সিংহের লোম প্রজাপতির মস্তকের লোমগুচ্ছ (অ. বে. ১৯।৯।২) অর্থাৎ প্রজাপতির মস্তকের লোম হইতে সিংহের উৎপত্তি। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, নাসিকার দ্রব হইতে সিংহের জন্ম (৫।৫।৪।১০)। সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম **Felis leo.**

ঋগ্বেদে (১।৯৫।৫) ঋকে যে সিংহের নাম পাওয়া যায়, তাহা সিংহরাশি বলিয়া মনে হয়।

(৬৪) সৃমর। - চমর দেখুন।

(৬৫) হরিণ।—ঋগ্বেদের আধুনিক ঋক্‌গুলিতে এবং অন্যান্য বেদগুলিতে হরিণ অর্থে মৃগ ও হরিণ, এই দুই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। হরিণের তৃণ ভোজন (ঋ. বে. ১।৩৮।৫), দ্রুত গমন (ঋ. বে. ১।১৬৩।১, ১।১৭৩।২), ব্যাধকর্তৃক হরিণ শিকার (ঋ. বে. ৮।২।৬, ১০।৪০।৪ ইত্যাদি), হরিণের বিশ্রামস্থান (ঋ. বে. ১।১৯১।৪), হরিণের বিচরণস্থান (ঋ. বে. ১।১৩৬।৭), ইহার চঞ্চল দৃষ্টি (ঋ. বে. ৯।৩২।৪) এবং ভীরুতার (ঋ. বে. ৫।২৯।৪) উল্লেখ আছে।

হরিণের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণ করা হইত (ঋ. বে ৮।৬৯।১৫)। হরিণের চর্ম্মে দুন্দুভি প্রস্তুত করা হইত (অ. বে. ৫।২১।৭)। হরিণকে তীরের দন্ত বলা হইয়াছে (অ. বে. ৬।৭৫।১১) ; সম্ভবতঃ হরিণের শৃঙ্গে তীরের মুখ প্রস্তুত করা হইত। ক্ষেত্রীয় রোগে (টীকাকারগণের মতে কুলাগত অথবা পিতামাতার শরীর হইতে আগত ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপস্মার প্রভৃতি রোগ) হরিণের শৃঙ্গ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ৩।৭।১)।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১১, ১৬।১৯) নানা দেবতা ও রাজার উদ্দেশে যজ্ঞে হরিণের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩।২।৯।৮) রাষ্ট্রকে হরিণ বলা হইয়াছে। অন্তরীক্ষকে হরিণীর (বিন্দু চিহ্নিত) সহিত তুলনা করা হইয়াছে (গো. ব্রা, উত্তরভাগ ২।৭ ; তৈ. ব্রা. ১।৮।৯।১ ; শ. ব্রা. ১৪।১।৩।২৯)।

আমরা হরিণ অর্থে হরিণ-বংশ বুঝি ; কিন্তু এণ বা কৃষ্ণসার মৃগকেও হরিণ বলা

হয়। যে হরিণকে অন্তরীক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহার নাম Cervus axis। ইহাকে হিন্দীতে চীতল বলে।

(৬৬) হলিক্ষ্ণ। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) ধাতার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার ইহাকে এক জাতীয় সিংহ বলিয়া মনে করেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে হর্য্যক্ষ নামে সিংহের একটা ভেদের বিবরণ দৃষ্ট হয়; ইহার দেহ দীর্ঘাকার এবং দীর্ঘকেশর মুখ ঢাকিয়া রাখে; ইহার গাত্রে ছোট ছোট রেখা থাকে। ইহা হলিক্ষ্ণ হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে তৃণহিংস (গঙ্গাফড়িঙ্) অথবা হরিত চটক বলেন। একপ্রকার চটকের গলদেশ হরিদ্রাবর্ণ, ইহাকে জংলি চড়ুই বলা হয়; বৈজ্ঞানিক নাম Gymnornis xanthocollis (F. B. I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ১৬৬)।

(৬৭) হস্তী।—ঋগ্বেদে (১।৬৪।৭) 'মৃগহস্তিন্' কথা পাওয়া যায়, ইহার অর্থ, যে পশুর হস্ত (শুণ্ড) আছে। ইন্দ্রকে হস্তীর ন্যায় বলশালী বলা হইয়াছে (ঋ বে. ৪।১৬।১৪)। হস্তীর বল অসুরের ন্যায় (অ. বে. ৩।২২।৪)। হস্তীর তেজের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় (অ. বে. ৬।২২।৩,৬ ; ৬।৩৮।২)। অথর্ব্ববেদে (১২।১।১৫) হস্তীর প্রাধান্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

(খ) পক্ষী। বৈদিকগ্রন্থে বহু পক্ষীর নাম পাওয়া যায়।

(১) অন্যবাপ—পিক দেখুন।

(২) অলজ।—বাজসনেয়ি সংহিতা (২৪।৩৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০) অন্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতার টীকাকার ইহাকে পক্ষিবিশেষ এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে ভাস (গৃধ্রজাতীয় পক্ষী) বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শুল্বশাস্ত্রে অলজের আকৃতিবিশিষ্ট চিতার (অলজ-চিতা) উল্লেখ আছে; সুতরাং মনে হয় যে, পক্ষীটী খুব সাধারণ ছিল। চিলকে হিন্দীতে কর্জবাজ, চাচ, চীল এবং সিংহলে রাজালিয় বলা হয়। আমাদের মনে হয় যে, চিল সাধারণ পক্ষী এবং যখন অলজকে গৃধ্রজাতীয় বলা হইয়াছে, তখন অলজ চিল হইতে পারে। চিলের বৈজ্ঞানিক নাম Spilornis cheela (F. B. I., Birds III, ১৮৯৫, পৃ. ৩৫৮)।

(৩) অলিক্লব।—আমরা অথর্ব্ববেদে (১১।২।২, ১১।৯।৯ বা ১১।১১।৯) কতিপয় শবভক্ষণকারী প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত ঋকে শ্বন (কুকুর), ক্রোষ্টু (শৃগাল), অলিক্লব, গৃধ্র এবং কৃষ্ণের (সায়ণের মতে কৃষ্ণবর্ণ বায়স) উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়োক্ত ঋকে

অলিক্লব, জাহ্কমদ, গৃধ্র (সায়ণের মতে শ্বেতবর্ণ পক্ষী), শ্যেন, ধ্বাঙ্ক্ষ (কাক) এবং শকুনির নাম পাওয়া যায়। সায়ণ গৃধ্রকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন এবং ইহা শকুনি হইতে ভিন্ন। ভারতবর্ষে একজাতীয় গৃধ্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দুই অন্তর্জাতিতে বিভক্ত ; উভয়েই শ্বেতবর্ণ। ইহাদের নাম Neophrons perconopterus perconopterus এবং N. p. ginginianus (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ২২, ২৩)। হিন্দীতে ইহাদিগকে সফেদ গীধ বলে। প্রথমোক্ত পক্ষীটী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই গৃধ্র। টীকাকারগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শকুনিকে সাধারণ পক্ষী হিসাবে ধরিয়াছেন ; আমাদের মনে হয়, পতত্রী শব্দটী (অ. বে. ১১।৯।৯) সাধারণভাবে ধরিয়া, শকুনিকে বিশেষপক্ষী বলিয়া মনে করা যুক্তি-সঙ্গত। বঙ্গদেশে দুই জাতীয় গৃধ্রকে শকুন বা শগুন বলা হয় ; তন্মধ্যে একজাতীয় গৃধ্রের এক অন্তর্জাতি (Gyps indicus nudiceps) কাশ্মীর, দক্ষিণ-হিমালয় এবং উত্তর-ভারতে দৃষ্ট হয় ; গলিত মাংস ইহার প্রিয় খাদ্য। অপর জাতীয় গৃধ্রটী পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতনায় অপেক্ষাকৃত বিরল। ইহা বঙ্গদেশে প্রধানতঃ দৃষ্ট হয় ; ইহার নাম Pseudogyps bengalensis (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ১৭, ১৯)। অথর্ব্ববেদের শকুন সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত পক্ষীই হইবে।

এক্ষণে শ্যেনপক্ষী কি, দেখা যাউক। সাধারণতঃ বাজকে শ্যেন বলা হয় ; কিন্তু শ্যেন, বাজ নহে। এক জাতীয় হিংস্র পক্ষীকে হিন্দীতে শাহিন্ বলে ; ইহা জীবিত ক্ষুদ্র পশু-পক্ষী বধ করিয়া ভক্ষণ করিলেও মৃতদেহ এবং পূতিমাংস ভক্ষণে বিরত হয় না। এই বংশীয় পক্ষী-দিগের মধ্যে ইহাই কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম Falco peregrinus (ঐ, পৃ. ৩৪)। ইহাই আমাদের শ্যেন বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে কৃষ্ণ ও ধ্বাঙ্ক্ষ দেখা যাউক। সায়ণ কৃষ্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বায়স বলিয়াছেন। ভারতে গলিতমাংসভুক্ কাকের বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ; ইহার নাম Corvus corone orientalis (ঐ, Birds I, ১৯২২, পৃ. ২৪)। ইহাই কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। ধ্বাঙ্ক্ষকে কাক বলা হয়, তথাপি ইহাকে ডোমকাক বা দাঁড়কাক বলিয়া মনে হয়। ডোমকাক গলিত মাংসের অতিশয় প্রিয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Corvus corax laurencei (ঐ, পৃ. ২১)।

এক্ষণে অলিক্লব ও জাহ্কমদ কি, দেখা যাউক। অলি অর্থে, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, কোকিল ; ক্লু অর্থে গমন। সুতরাং যাহা অলির ন্যায় গমন করে, তাহাই অলিক্লব। জাহ্কমদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়—জাঃ ক্রমদা, জাঃ কমদা, সায়ণের মতে জাঃ ক্লমদা। ক্রম অর্থে, গতি ; ক্লম অর্থে, শ্রম : জ অর্থে, দ্রুত ; সম্ভবতঃ অর্থ হয়—যাহার দ্রুতগতি আছে। টীকাকারগণ

অলিক্লবকে গলিতমাংসভুক্ পক্ষী বলেন। সম্ভবতঃ অলি শব্দে কৃষ্ণবর্ণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং অলিক্লব কৃষ্ণবর্ণ। জাঙ্কমদকে দ্রুতগতি পক্ষী মনে করা যায়। আমরা আরও দুইটী গলিতমাংসভুক্ পক্ষীর কথা জানি—প্রথমটীর নাম Sarcogyps calvus (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৯)। ইহাকে রাজশকুন বলা হয়। ইহা কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ করে। ইহার গলিতমাংসপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া ইহার গণের নাম Sarcogyps দেওয়া হইয়াছে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সম্ভবতঃ ইহাই অলিক্লব। দ্বিতীয় পক্ষীটী উত্তর-ভারত এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়; ইহা অতি দ্রুত উড্ডয়নশীল পক্ষী এবং বহু উচ্চে পর্ব্বতের উপর বাসা করে। ইহার নাম Gypaetus barbatus hemachalanus (ঐ, পৃ. ২৬)। ইহার গায়ের রঙ্ কাল হইলেও মস্তকটী সাদা। ইহাকে জাঙ্কমদ বলিয়া মনে হয়। ইহা মেষশাবক এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি পশু বধ করিয়া এবং গলিতমাংস ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে।

(৪) আটি।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) বায়ুর উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ইহা আতি ও সরারি নামে খ্যাত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Acridotheres ginginianus. সাধারণতঃ ইহাকে গাংশালিক, রামশালিক বলা হয়। আমরা গোসাদি নামে পাখীর উল্লেখ দেখি, ইহাই সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ সালিক (গোসাদি দেখুন)। (F. B. I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ৫৩, ৫৫)।

(৫) আতী।—ঋগ্বেদে (১০।৯৫।৯) আতীর ন্যায় অপ্সরাগণের দলবদ্ধ হইয়া পলায়নের কথা পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১১।৫।১।৪) ঐরূপ উক্তি আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) বায়ুর উদ্দেশে আতীর নামের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে হংস বলেন; আমরা হংসের দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া যাইবার কথা জানি; সুতরাং আতী হংস হওয়া সম্ভব। এক জাতীয় হংসকে রত্নগিরিতে আদি, আদ্‌লা বলা হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Nettopus coromondelianus (F. B. I., Birds IV, ১৮৯৮, পৃ. ৪৩৩)। ইহাই কি আতী?

(৬) উল, উলুক (উলূক), উপোহ।—ঋগ্বেদে উলূককে হিংস্র পক্ষী (৭।১০৪।২২) এবং ইহার শব্দ অমঙ্গলসূচক (১০।১৬৫।৪) বলা হইয়াছে। বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৪।২৩, ৩৮) বনস্পতি এবং নির্ঋতির (অমঙ্গল) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) ধাতার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে (৬।২৯।১,।২) কপোত ও উলূককে অমঙ্গলের দূত বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আবার জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্য উলূকের স্তুতি

আছে (অ. বে. ৮।৪।২২)। আমাদের কুটুরিয়া পেঁচাকে হিন্দীতে উল্লু বলা হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Athene brama (F. B. I, Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ৪৪০)। ইহাই উলূক।

ঋগ্বেদে (৭।১০৪।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, রাক্ষসী খর্গলের স্থায় লুক্কায়িত থাকে। খর্গল একপ্রকার পেচক। আমাদের ভুতম পেঁচার (লক্ষ্মী পেঁচা) হিন্দী নাম কুরাইল; বৈজ্ঞানিক নাম Tyto alba jaradica (ঐ, পৃ. ৩৮৫)। ইহাই বেদের খর্গল বলিয়া মনে হয়।

(৭) ককর।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০) শীত ঋতুর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। কুক্কুটকে বঙ্গদেশে কুকড়া বলা হয়। ইহাই সম্ভবতঃ ককর। বন্য কুক্কুটের বৈজ্ঞানিক নাম Gallus bankiva (ferruginius) murghi (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ২৯৫)। ককর সম্ভবতঃ গৃহপালিত মোরগ।

(৮) কঙ্ক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩১) দিক্ সকলের জন্য ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কাঁক পাখী; বৈজ্ঞানিক নাম Ardea cinerea cinerea (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৩৩৯)।

(৯) কপিঞ্জল।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০, ৩৮) বসন্ত ঋতু ও নির্ঋতির (অমঙ্গল) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) বসুগণের উদ্দেশে ইহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তে (৩।১৮।৮) কপিঞ্জল অর্থে, যে জীর্ণ কপির ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ অথবা গমনকালে যাহার কপির ডাকের ন্যায় শব্দ হয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২।৫।১) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (১।৬।৩।৩, ৫।৫।৪৪) ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের যে তিনটী মস্তক ছেদন করেন, ঐ তিনটী ছিন্ন মস্তক হইতে কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক এবং তিত্তিরী পক্ষীর উৎপত্তি হইল। কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে (Popular Hindu Astronomy, পৃ. ১৩৩) বিশ্বরূপ Orion নামক নক্ষত্রপুঞ্জ এবং বিশ্বরূপের মস্তক তিনটী Orionএর মস্তকের তিনটী তারকা। আমার মনে হয়, বিশ্বরূপ Hydra নামক তারকাপুঞ্জ।

অভিধানকারগণ কপিঞ্জলকে চাতক বলেন। কিন্তু বৈদ্য শাস্ত্রে ইহার মাংসের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে তিত্তিরী জাতীয় পক্ষী মনে করেন; ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাকে Frankolin partridge বলা হইয়াছে। Frankolinus গণের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় জাতি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক জাতিকে বাঙ্গালায় কয়া, খৈর, কইজা বলা হয়; বৈজ্ঞানিক নাম Francolinus gularis (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৪১৭)। ইহাই কপিঞ্জল। বসন্তের জন্য এই পক্ষীর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তে

ইহা বোধ হয় বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ঐ গণের আর এক জাতীয় পক্ষীর নাম চকোর; ইহাও বসন্তে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক নাম Alectonis graeca chukar (ঐ, পৃ. ৪০২)।

(১০) কপোত।—ঋগ্বেদে কপোতের দাম্পত্য-প্রেম (১।৩০।৪) এবং ইহার দর্শনে অমঙ্গল নিবারণের জন্য স্তুতি (১০।১৬৫।১-৫) দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে ইহাকে অমঙ্গলের দূত বলা হইয়াছে (৬।২৯।২)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৩, ৩৮) মিত্র, বরুণ এবং নির্ঋতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৮) কেবল নির্ঋতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে।

কপোত আমাদের ঘুঘু। ইহা যে সাধারণের বিশ্বাসে অমঙ্গলসূচক, তাহা সকলেই জানেন। ইহার দাম্পত্য-প্রেম কাহারও অবিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক নাম Chalcophaps indica indica (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ২১৫)।

(১১) কলবিঙ্ক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০, ৩১) গ্রীষ্ম ও ত্বষ্টার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপের একটী মস্তক হইতে কলবিঙ্ক জন্মিয়াছে (কপিঞ্জল দেখুন)। ইহা চটক বা চড়ুই পাখী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Passer domesticus (F. B. I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ১৬৯)। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে।

(১২) কালকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) বনস্পতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে এক প্রকার পাখী এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার এক প্রকার সরট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজনিঘণ্টু অভিধানে কালিকাকে শ্যামাপক্ষী বলা হইয়াছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Kittacincla macroura indica (F. B. I., Birds II, ১৯২৪, পৃ. ১১৮)। শ্যামা পাখী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। সম্ভবতঃ কালকা ও কালিকা একই পক্ষী। আবার 'কালক' শব্দ অলগর্দ্দের (কৃষ্ণ সর্প—black variety of Cobra) একটী নাম।

(১৩) কিকিদীবি।—ঋগ্বেদে (১০।৯৭।১১৩) চাষ এবং কিকিদীবি পক্ষিদ্বয়ের দ্রুতবেগে উড়িয়া যাইবার কথা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৬।২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের টীকাকার ইহাকে তিত্তিরী পক্ষী বলেন। অভিধানকারগণ চাষ, কিকিদীবি, স্বর্ণচাতক এবং নীলকণ্ঠ ইহাদিগকে এক পক্ষীর পর্য্যায় বলিয়া ধরেন। আবার কেহ কেহ কিকিদীবিকে চাতক বলিয়া মনে করেন। অভিধানে (যেমন, বৈদ্যকশব্দসিন্ধু) Frankolin Partridgeকে চাতক বলা হইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহা চকোর। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে চাষ ও কিকিদীবির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা হইতে আমরা চাষকে Eurystomus orien-

talis orientalis এবং কিকিদীবিকে Coracias bengalensis bengalensis বলিয়া মনে করি ; ইহা নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত (F. B. I, Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ২২৪, ২২৮)। ইহাকে পূর্ব্বে C. indica বলা হইত। Roth সাহেবের মতেও কিকিদীবি একপ্রকার চাষ পক্ষী।

(১৪) কীর্শা।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০) ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে ইহার নাম আছে। কীর শব্দে শুককে বুঝায়। কীশ শব্দে বানর এবং পক্ষীকে বুঝায়। Monier Williamsএর অভিধানে ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলা হইয়াছে। মারাঠী ভাষায় 'কীর' নামে শুকপাখীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Psittacula cyanocephala cyanocephala (F. B. I., Birds IV, ১৯২৭, পৃ ২০৪) ; ইহাই কীর্শা হইবে।

(১৫) কুটরু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৩, ৩৯) অগ্নি ও বাজীর উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭) সিনীবালীর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে মোরগ বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে মৃগসিংহ অথবা এক প্রকার পেচক বলেন। মোরগের এক নাম ককর (ককর দেখুন)। কুট অর্থে গৃহ ; একপ্রকার পেঁচা আছে, যাহারা বাটীর ছাদে বাসা করে, ইহাদিগকে বাঙ্গালায় কুটরিয়া পেঁচা বলে, সুতরাং কুটরু এই পেচকও হইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Athene brama indica (F.B.I., Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ৪৪০)।

(১৬) কুলীকা, পুলীকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪) দেবগণের পত্নীদের উদ্দেশে স্ত্রী-কুলীকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মৈত্রীয়াণী-সংহিতায় পুলীকা শব্দ আছে। আমরা একপ্রকার ভরতপক্ষীর হিন্দী নাম পুল্লুক দেখিতে পাই। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Calendrella brachydactyla brachydactyla, (F. B. I., Birds II, ১৯২৬, পৃ. ৩২৪) ; ইহা কি পুলীকা ?

(১৭) কুবয়, কয়ি।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৯) বাজীর জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭) সিনীবালীর জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ভাস্কর কয়ির অর্থে জলকুক্কুট বলেন। ইহাকে চলিত কথায় গাংচিল বলে (বাচস্পত্য—জলকুক্কুট শব্দ দেখুন)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Larus ridibundus Linn. (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ১০২)। সম্ভবতঃ ইহাই কয়ি হইবে।

(১৮) কুষীতক।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাকে সমুদ্রকাক বলা হয়। Avocet নামক পক্ষীকে হিন্দীতে কুসিয়াচাহা বলে।

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Recurvirostra avocetta avocetta (F. B. I, Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ১৯৫)। ইহাই কুষীতক হইবে।

(১৯) কৃকবাকু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৮) সবিতার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৫।৩১।২) এই পক্ষীর অমঙ্গল নিবারণের জন্য মন্ত্র দেখা যায়; ইহাতে মনে হয় যে, ইহা গৃহপালিত। নিরুক্তে (১২।৩) এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—যে কৃক শব্দ করে। কৃকবাকুকে মোরগ মনে করা যায়। (ককর দেখুন)।

(২০) কৃষ্ণ।—ঋগ্বেদে (১০।১৬।৬) শবদাহ ক্রিয়ায় কৃষ্ণ পক্ষীর উল্লেখ আছে; এবং বলা হইয়াছে—এই পক্ষী মৃত ব্যক্তিকে তাহার জীবিতাবস্থায় যে ব্যথা দিয়াছে, অগ্নি তাহা উপশম করুন। অথর্ব্ববেদে (৭।৬৬।১,২) এই পক্ষীকে অমঙ্গলসূচক বলা হইয়াছে। আবার (অ. বে. ১২।৩।১৩) বলা হইয়াছে যে, যেখানে কৃষ্ণপক্ষী আসিয়া বসিয়াছে, তাহা জল দিয়া পরিষ্কার করা হউক; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পক্ষী অস্পৃশ্য ছিল। কৃষ্ণকে অভিধানকারগণ কাক বলেন (অলিক্লব দেখুন)।

(২১) কৌলীকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২।১৪।৫) ইহার নাম পাওয়া যায়। কৌল অর্থে কুলগত। সম্ভবতঃ এমন কোন পক্ষী হইবে, যাহা বংশানুক্রমে গৃহে পালিত হইত। আমরা মোরগ এবং হংসকে গৃহপালিত বলিয়া জানি এবং গৃহস্থের গৃহেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। আমরা এক জাতীয় হংস জানি, Anser anser, (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ ৩৯৮), যাহা পশ্চিম-ভারতে কল্লোক নামে খ্যাত এবং সহজেই পোষ মানে। Blyth সাহেবের মতে (F. B. I., Birds IV, ১৮৯৮, পৃ. ৪১৭) আমাদের গৃহপালিত হংস, এই হংস এবং আর এক জাতীয় হংসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার কুকুরকে কৌলেয়ক বলা হয়।

(২২) ক্রুঞ্চ, ক্রৌঞ্চ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪। ২২,৩১) ইন্দ্রাগ্নি ও কাক এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) কাকের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অশ্বমেধের অশ্বের কর্ত্তিত দেহের দুই শ্রোণি দুই ক্রৌঞ্চের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (বা. স. ২৫।৬)। ক্রৌঞ্চ কোঁচবক। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Numenius arquata (F. B. I, Birds IV, ১৮৯৮, পৃ. ২৫২)।

(২৩) খর্গল।—উল দেখুন।

(২৪) গৃধ্র।—ঋগ্বেদে (১।১১৮।৪) এবং অথর্ব্ববেদে (৭।১০০।১) ইহাকে

আকাশবিহারী বলা হইয়াছে। ইহার চক্ষু খুব তীক্ষ্ণ এবং ইহা বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায় (ঋ. বে. ১০।১২৩।৮)। গৃধ্র হিংস্র পক্ষী (ঋ. বে. ৭।১০৪।১২) এবং মৃতদেহ ভক্ষণ করে (অ. বে. ১১।১১।৯, ১১।১২।৮, ২৪; ১২।১০।১)। অথর্ব্ববেদে ভব এবং শর্বের নিকট প্রার্থনায় দেখিতে পাওয়া যায়, যেন গৃধ্রাদির জন্য বেশী লোক না মারা যায় (১১।২।২); তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪।৪।৭) পঞ্চভূয়স্কৃৎ ইষ্টকস্থাপনের মন্ত্রে গৃধ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে (৫।৫।২০) আকাশের জন্য গৃধ্রের নাম পাওয়া যায়। সায়ণ ইহাকে শ্বেতবর্ণ পক্ষী বলেন। (অলিক্লব দেখুন)।

(২৫) গোসাদি।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪) দেবগণের পত্নীদিগের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর অর্থ করিয়াছেন—গো, গরু এবং সাদি যে বিশ্রাম দেয়, উপবেশন করায়। আমরা এই নামের সার্থকতা দেখিতে পাই। সালিক পাখী গবাদির পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া তাহার গাত্রস্থ এঁটুলিগুলি ভক্ষণ করে এবং বহুক্ষণ তাহাদের পৃষ্ঠে বসিয়া কাটায় (F. B I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ৫৪)। সালিক পাখীর বৈজ্ঞানিক নাম Acridotheres tristis.

(২৬) চক্রবাক।—অথর্ব্ববেদে (১৪।২।৬৪) বিবাহের মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা আছে—তিনি যেন চক্রবাক-দম্পতির ন্যায় এই নববিবাহিত দম্পতিকে পালন করেন। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২২,৩২) বরুণ ও প্রতিধ্বনির জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) দিক্-সকলের জন্য ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫।৪) অশ্বমেধের অশ্বের দেহ-বণ্টনে দুই দিকের পঞ্জর দুইটী চক্রবাকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার কথা আছে। চক্রবাকের সাধারণ নাম চকা; হিন্দীতে চক্বা বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Casarca ferruginea (rutila), (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৪১৬)। চক্রবাক-দম্পতি সচরাচর দিবসে একসঙ্গে চরিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে পৃথক্ থাকে।

(২৭) চাষ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৩) অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ঐ গ্রন্থে (২৫।৭) অশ্বমেধের অশ্বের পিত্ত (bile) চাষ পক্ষীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত। (কিকিদীবি দেখুন)।

(২৮) চিচ্চিক, বৃষারব।—ঋগ্বেদে (১০।১৪৬।২) অরণ্যদেবতা সূক্তে চিচ্চিক ও বৃষারবের উল্লেখ আছে। যে চি চি শব্দ করে, ভাষ্যকারগণ তাহাকে চিচ্চিক বলেন। কেহ কেহ ইহাকে উচ্চিংড়া বলেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। বৃষারব, যে বৃষের মত রব করে; ইহাও একপ্রকার পাখী।

আমরা দুই জাতীয় পক্ষী জানি, যাহারা চিক্ চিক্ বা চির্ চির্ শব্দ করে। এক জাতীয় পাখীকে তুর্কীরা চিথ্ চি বলে; ইহা চিক্ চিক্ শব্দ করে, ইহা বনের মধ্যে ঝোঁপে বাস করে এবং কাশ্মীর, লডক ও পূর্ব্বতুরস্কে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম Tribura major (F. B. I., Birds II, ১৯২৪, পৃ. ৪০৩)। অন্য পক্ষীটী চির্ চির্ শব্দ করে। ইহার পাহাড়ী নাম চীর, চিহির। ইহা কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় স্থানে বাস করে; ইহার নাম Catreus wallichi (ঐ, Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৩০৭)। সম্ভবতঃ চিচ্চিক উচ্চিংড়াই হইবে। ইহারা gryllusগণভুক্ত।

আমাদের দেশে রাজধনেশ পাখীর রব অনেকটা বৃষের শব্দের মত। হিন্দীতে ইহাকে বনরাও বলে; বৈজ্ঞানিক নাম Dichoceros bicornis bicornis (ঐ, Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ২৮৪)। ইহা বৃষারব হইতে পারে।

(২৯) তিত্তিরী।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০,৩৬) বর্ষা ঋতু এবং সর্পের জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) রুদ্র দেবতার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ইহাকে হিন্দীতে তিতর, রামতিতর প্রভৃতি বলা হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Francolinus pondicerianus interpositus (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৪২১)।

(৩০) দর্বিদা, দর্বিদাত, দার্বাঘাট।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) দর্বিদা এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) বায়ুর উদ্দেশে দর্বিদাতের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ির টীকাকার দর্বিদাকে কাষ্ঠকুট্ট অর্থাৎ কাঠঠোক্‌রা পাখী বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ভাস্কর দর্বিদাতকে কাঠঠোক্‌রা অথবা একপ্রকার জলচর পক্ষী বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) বনস্পতির জন্য দার্বাঘাট পক্ষীর উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ির টীকাকার ইহাকে সারস বলেন।

ইহা হইতে মনে হয় যে, দর্বিদা বা দর্বিদাত এবং দার্বাঘাট দুইটী বিভিন্ন পক্ষী। দর্বি অর্থে, হাতা করিলে, আমরা দর্বিদাকে চামচ পাখী (Platalea leucorodia major—F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৩১১) বলিয়া ধরিতে পারি। দার্বাঘাটকে কাঠঠোক্‌রা মনে করা যায়। ইহা কোন্ জাতীয় কাঠঠোক্‌রা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; সম্ভবতঃ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

(৩১) দাত্যূহ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫,৩৯) মাস ও বাজীগণের জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭) সিনীবালীর জন্য ইহার নাম পাওয়া যায়। আমরা দুই জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাই, যাহাদের যথাক্রমে হিন্দী নাম ডাউক এবং বাঙ্গালা নাম ডাকপায়রা।

ডাউক পাখী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয় না। ডাকপায়রা ভারতের সর্ব্বত্র ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা দাত্যূহকে ডাকপায়রা বলিয়া মনে করিতে পারি। ডাউকের বৈজ্ঞানিক নাম **Amaurornis phaenicurus** এবং ডাকপায়রার নাম **Gallinula chloropus** (**F. B. I., Birds IV,** ১৮০৮, পৃ. ১৭৩, ১৭৫)।

(৩২) ধুঙ্ক্ষ্ণা, ধূঙ্ক্ষ্ণা।—বাজসনেয়ি-সহিতায় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৯) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্যকার ভাস্কর ইহাকে সাদা কাক বলেন। অথর্ব্ববেদে ধ্বাঙ্ক্ষ শব্দ পাওয়া যায়। ইহা মৃতদেহ বা গলিতমাংস ভক্ষণ করে (অলিক্লব দেখুন)। ইহা গরুকে বড়ই ব্যস্ত করে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (অ. বে. ১২।৪।৮)। আমরা সকলে জানি যে, গরুর পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে কাক মাংস ভক্ষণ করে। এই তিন শব্দ কাকের জন্য ব্যবহার হওয়াই সম্ভব। তবে শ্বেত কাক দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলিপুর পশুশালায় একটী শ্বেত কাক ছিল।

(৩৩) পারাবত।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫) দিবসের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অভিধানকারগণ কপোত এবং পারাবত পায়রার পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু কপোত ও পারাবত শব্দদ্বয় একসঙ্গে এরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহাতে ইহারা দুইটী বিভিন্ন পক্ষী বলিয়া মনে হয়। আমরা পারাবতকে গোলা পায়রা মনে করি। (Columba livia intermedia, F. B. I., Birds V, পৃ. ২২১)।

(৩৪) পারুষ্ণ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ইহা কোন লালবর্ণের পাখী হইবে। লালভুতী, গোলাপী তুতী নামে Propassergণের অন্তর্গত অনেকগুলি রক্তবর্ণ পাখী আছে। (F. B. I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ১৩৬ ইত্যাদি)। পারুষ্ণ কি, তাহা বলা সুকঠিন।

(৩৫) পিক।—ইহার অন্য নাম অন্যবাপ (যে অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫, ১৭) অর্যমা ও অর্দ্ধমাস এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭, ৩৯) অর্দ্ধমাস ও কামের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Eudynamis scolopaceus scolopaccus (F. B. I., Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ১৭২)।

(৩৬) পিপ্লকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৪০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫, ১৯) শরব্যার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকারগণ ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন।

Caprimulgus indicus-কে হিন্দীতে চিপ্পক বলে (F. B I., Birds IV, ১৯২৭, পৃ. ৩৬৬)। ইহা কি পিপ্পকা ?

(৩৭) পুলীকা।—কুলিকা দেখুন।

(৩৮) পুষ্করসদ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) ত্বষ্টার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে কমলভক্ষী পক্ষিবিশেষ বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে সারস বলেন। সারসের বৈজ্ঞানিক নাম Antigone antigone antigone.

(৩৯) পৈঙ্গরাজ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) বৃহস্পতি এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) বাক্যের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে একপ্রকার লালচঞ্চু ভরদ্বাজ, অথবা সমুদ্রতীরচারী বৃহৎ পক্ষী অথবা চকোর বলেন Alauda arvensis dulcivox এবং Alauda gulgula-কে ভরত বা ভরদ্বাজ বলা হয় (F. B. I., Birds III, ১৯২৭, পৃ. ৩১৫-৩২২)। আমরা তিন জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাই, যাহাদিগকে হিন্দীতে এবং বাঙ্গালাতে বড় পেঙ্গ (Garrulax pectoralis pectoralis, F. B. I., Birds I, ১৯২২, পৃ. ১৫০), বড় ফেঙ্গ (Argya earlii, F. B. I., Birds I, ১৯২২, পৃ. ১৯৭) এবং পেঙ্ বা ছোট পেঙ্গ (Argya caudata, ঐ, পৃ. ১৯৮) বলে। সম্ভবতঃ প্রথম দুইটীর একটী পৈঙ্গরাজ হইবে।

(৪০) প্লব।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০) নদীগণের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। প্লব চলিত কথায় গগনভেড় নামে অভিহিত। ভারতে তিন জাতীয় গগনভেড় দেখা যায়—Pelicanus onocrocotalus, P. crispus এবং P. philippensis (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ২৭১-২৭৪)।

(৪১) বলাকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২২, ৩৩) বায়ু ও সূর্য্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) সূর্য্যের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। বলাকা অর্থে বক, হিন্দীতে ইহাকে বগুলা বলে ; বৈজ্ঞানিক নাম Ardeola grayi (F. B. I., Birds, ১৮৯৮, পৃ. ৩৯৩)।

(৪২) মদ্‌গু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২২, ৩৪) মিত্র ও নদীসমূহের জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১০) নদীসমূহের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। চলিত কথায় ইহাকে পানিকৌটী বলে। দুই প্রকার পানিকৌটী দেখা যায়—Phalacrocorax carbo এবং Phalacrocorax javanicus (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ২৭৯, ২৮০)।

(৪৩) ময়ূর।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৩, ৩৭) অশ্বিদ্বয় ও গন্ধর্ব্বদিগের

জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) গন্ধর্ব্বদিগের জন্য ময়ূরের উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Pavo cristatus।

(৪৪) মহাসুপর্ণ।—শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২।২।৩।৭) ইহার উল্লেখ আছে। (সুপর্ণ দেখুন)।

(৪৫) রোপণাকা।—ঋগ্বেদে (১।৫০।১২) ইহার হরিৎ বর্ণের উল্লেখ আছে এবং শুকপক্ষীর সহিত নাম করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩।৭।৬।২২) ইহার নাম পাওয়া যায়। সায়ণের মতে ইহা শারিকা—সালিখ পাখী (গোসাদি দেখুন)। আমরা ইহার নামের অর্থ 'যে (বাসা নির্ম্মাণের জন্য) তৃণ উপ্‌ড়ায়' এই ধরিয়া ইহাকে বাবুই পাখী বলিতে পারি (Oriolus oriolus Kundoo)।

(৪৬) লব।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪) সোমের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। হিন্দীতে লওয়া নামে কয়েকটী পক্ষী পরিচিত—Perdicula asiatica (লব), Perdicula argunda (লব) এবং Turnix tanki (লওয়া, লওয়া-বুটই)। সম্ভবতঃ শেষোক্ত পক্ষীটীই আমাদের লব। (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৩৭৭, ৪৪৯)।

(৪৭) লোপ।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৮) বৎসরের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণ ইহাকে শ্মশান-শকুনি বলেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Sarcogyps calvus (F. B I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৯)।

(৪৮) বর্ত্তিকা।—ঋগ্বেদে (১।১১৬।১৪, ১।১১৭।১৬, ১০।৩৯।১৩) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিদ্বয় বৃকের মুখ হইতে বর্ত্তিকাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ স্থলে বর্ত্তিকাকে ঊষা মনে করা যায়। বৃক সূর্য্য (বৃক দেখুন)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০, ৩০) শরৎ এবং ক্ষিপ্রশ্যেনের জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১১) কেবল ক্ষিপ্রশ্যেনের জন্য ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার সাধারণ নাম বটের ; বৈজ্ঞানিক নাম Coturnix coturnix coturnix (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৩৭২)।

(৪৯) বাহস।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী মনে করেন। অনেকে আবার ইহাকে অজগর সর্প বলিয়াও ধরেন। ইহা সম্ভবতঃ বাবুই পাখী ; হিন্দুস্থানীতে বয়া বলে। বৈজ্ঞানিক নাম Ploceus philippinensis। ইহার বাসা ঝুলিয়া থাকে।

(৫০) বিককর।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০) হেমন্ত ঋতুর জন্য ইহার উল্লেখ

আছে। ককরকে আমরা মোরগ বলিয়াছি। বিককর সম্ভবতঃ বনমোরগ হইবে (ককর দেখুন)।

(৫১) বিদীগয়।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৬।২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহাকে এক প্রকার কুক্কুট বলেন। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের (৩।৯।৯।৩) টীকাকার ইহাকে শ্বেত বক বলেন। এক প্রকার বককে হিন্দীতে গয়ি বগ্‌লা বলা হয়। ইহার রঙ্‌ সাদা। বৈজ্ঞানিক নাম Bubulcus coromondus (F. B. I., Birds IV, ১৮৯৮, পৃ ৩৮৯) ; সম্ভবতঃ ইহাই বিদীগয়।

(৫২) বৃষারব।—চিচ্চিক দেখুন।

(৫৩) শয়াণ্ডক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) মিত্রের জন্য শয়াণ্ডকের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। অপর গ্রন্থের টীকাকার শয়াণ্ডককে সরট বলেন। আমরা ইহার নামের অর্থ 'যে শুইয়া বা ঘুমাইয়া থাকে' এইরূপ ধরিয়া, ইহাকে কঙ্ক পক্ষী (Ardea purpurea manillensis) বলিয়া মনে করিতে পারি। এই পক্ষী বহুক্ষণ ধরিয়া এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ও মাথাটী কাঁধের পালকের মধ্যে গুঁজিয়া নদীর ধারে চুপ করিয়া থাকে এবং মৎস্য দেখিলেই ছোঁ মারিয়া ধরিয়া ফেলে। ইহাকে হিন্দীতে লাল-কঙ্ক, লাল-শইন বলে (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৩৩৭)।

(৫৪) শারি।—শুক দেখুন।

(৫৫) শারিশাকা।—অথর্ব্ববেদে (৩।১৪।৫) গাভীকে শারিশাকার ন্যায় পুষ্ট হইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে পক্ষী বলিয়া মনে করেন। সায়ণ ইহাকে অল্পসময়ে সহস্রগুণ বর্দ্ধমান প্রাণিবিশেষ বলেন। শকা (পৃ ৩৩) দেখুন।

(৫৬) শার্গ।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৯) ব্রহ্মার উদ্দেশে এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৩) মৈত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে অরণ্যচটক বলেন। জংলি চড়ুই নামে আমরা পাখী জানি (হলিক্ষ্ণ [পশু] দেখুন)। আবার Falco cherrug নামে এক পক্ষীকে হিন্দীতে সকর বলা হয় (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৩৯)। ইহাই শার্গ হওয়া সম্ভব।

(৫৭) শিতিকক্ষী।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২০) আকাশের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে গৃধ্র বলেন। ইহার নামের অর্থ, যাহার কক্ষদেশ শ্বেতবর্ণ। এই জাতীয় গৃধ্রের নাম Pseudogyps bengalensis (F. B. I, Birds V, ১৯২৮, পৃ. ১৯)।

(৫৮) শুক, শারি।—ঋগ্বেদে (১।৫০।১২) সূর্য্যের স্তবে প্রার্থনা আছে, যেন

আমাদের হরিমান্ রোগ (পাণ্ডু রোগ) শুক ও শারিতে স্থাপিত হয়। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১২) সরস্বতীর জন্য শারি এবং সরস্বতের জন্য পুরুষ-বাক্ শুকের উল্লেখ আছে। শুক পাখীকে তোতা বলা হয়। হিন্দীতে টিয়া-জাতীয় কয়েকটী পাখীকে এই নাম (তোতা) দেওয়া হয়। Psittacula krameri manillensisকে তোতা বলে। Psittacula krameri borealisকে টিয়া ও টিয়া-তোতা বলা হয়। P. cyanocephala cyanocephalaকে টুইয়া-তোতা বলে। সম্ভবতঃ তোতাই বেদের শুকপক্ষী। শারি আমাদের সালিক পাখী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Acridotheres tristis tristis (F B I., Birds III, ১৯২৬, পৃ. ৫৩)।

(৫৯) শুশুলূক।—ঋগ্বেদে (৭।২০৪।২২) হিংস্রক মানবকে ইহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (৮।৪।২২) জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্য ইহার স্তুতি আছে। আমরা উলূককে কুটুরিয়া বা কাল পেঁচা বলি। আর এক পেঁচাকে (Glaucidium radiatum radiatum) ছোট কাল পেঁচা বলা হয়। ইহা উলূ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। (F. B. I, Birds IV, ১৯২৭, পৃ ৪৪৮)। ইহাই সম্ভবতঃ শুশুলূক হইবে।

(৬০) শ্যেন, সুপর্ণ।—শ্যেন ও সুপর্ণ একই পক্ষী। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে এই দুই নামেই ইহার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বলের উপমা স্বরূপ সূর্য্য (অ. বে. ৭।৪।১), অগ্নি (তৈ. স. ১৮।৫৩) এবং রাজাকে (অ. বে. ৩।৩।৪) শ্যেন বলা হইয়াছে। শ্যেনের দ্রুতগতি, বহু উর্দ্ধে উত্থিত হওয়া এবং বহু দূর গমনের উল্লেখ আছে (ঋ. বে. ১৩২।১৪, ১।১১৮।১১, ৫।৪।১১ ; বা. স. ৯।৯, ৯।১৫)। শ্যেন পূর্ব্বসেবিত নীড়ের দিকে ধাবমান হয় (ঋ বে. ১।৩৩।২), অর্থাৎ বাসা বদল করে। শ্যেন মৃত দেহ ভক্ষণ করে (ঋ. বে. ১১।৯।৯), এ জন্য তাহাকে মৃত্যুর দূত বলা হইয়াছে (ঋ. বে. ৭।৭৩।৩)। আবার উক্ত হইয়াছে (ঋ. বে. ৫।২১।৬) যে, পক্ষিগণ শ্যেনকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হয় ; সুতরাং ইহা জীবিত পক্ষ্যাদি বধ করিয়া আহার করে।

ঋগ্বেদে (২।৪২।২, ৪।২৬।৪, ৯।৪৮।৩) শ্যেনকে সুপর্ণ নামে আহ্বান করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে অধিকাংশ স্থলে শ্যেনের সুপর্ণ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। ধবল রোগের উপশমের মন্ত্রে (১।২৪।১) নীলবর্ণ বৃক্ষকে সুপর্ণের পিত্ত হইতে উৎপন্ন, এইরূপ বলা হইয়াছে। বিবাদ ভঞ্জনার্থ ওষধি-স্তবে (অ. বে. ২।২৭।২) বলা হইয়াছে যে, সুপর্ণই এই ওষধিটী প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলে পাখীদের (যেমন সুপর্ণ) নখে এবং পালকে সংলগ্ন হইয়া ওষধির বীজ যে এক স্থল হইতে অন্য স্থলে নীত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ওষধি জন্মিয়াছে, সম্ভবতঃ এই কথা

বলাই উদ্দেশ্য। স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে (অ. বে. ২।৩০।৩) বলা হইয়াছে যে, সুপর্ণগণ বলিতে ইচ্ছা করেন যে, স্ত্রীলোকটী আমার নিকটে আসুক। এ স্থলে সুপর্ণ সম্ভবতঃ অন্য কোন (যেমন মোরগ) হওয়া সম্ভব। স্ত্রীলোকের বশীকরণে শ্যেনের উল্লেখ রুচিবিরুদ্ধ। বিষদোষ নাশের মন্ত্রে (৪।৬।৩) দেখা যায় যে, গরুত্মান্ সুপর্ণ প্রথমে বিষ পান করিয়াছিল, তাহাতে সে মত্ত হয় নাই, বিমূঢ় হয় নাই, বিষ তাহার পানীয় হইয়াছিল। ইহাতে বিষের দুষ্টি-নাশ লক্ষ্য করা হইতেছে। গরুত্মন্ শব্দ হইতে আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক গরুড়ই এই সুপর্ণ।

ঋগ্বেদে (১।১৬১) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বমেধের অশ্বের শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পক্ষ এবং হরিণের মত পদ আছে। সম্ভবতঃ এই অশ্ব অন্তরীক্ষস্থ Pegasus নামক তারকাপুঞ্জ। এই কাল্পনিক অশ্বের দুই পক্ষ আছে।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৯।৮৬) শ্যেনের পক্ষকে প্রজাপতির প্লীহা বলা হইয়াছে। বিসূচিকা (বা. স. ১৯।১০) ব্যাঘ্র, তরক্ষু, সিংহ এবং শ্যেন পক্ষীকে রক্ষা করে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এই সকল হিংস্র প্রাণিগণের খাদ্যের প্রাচুর্য্য হয়।

ঋগ্বেদে (৪।২৭।১, ১০।১১।৪) উক্ত হইয়াছে যে, শ্যেনপক্ষী অগ্নি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞে দ্রবমূর্ত্তি সোমকে আনয়ন করিয়াছিল। ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ শ্যেন সূর্য্যের রশ্মি। সূর্য্যের রশ্মি সোমে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোকরূপে পৃথিবীতে উপনীত হওয়ার কথা বলাই কি উদ্দেশ্য ?

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) গন্ধর্ব্বগণের উদ্দেশে শ্যেন এবং পর্জ্জন্যের উদ্দেশে (৫।৫।২১) সুপর্ণের নাম পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪, ৩৭) পর্জ্জন্য এবং গন্ধর্ব্বদিগের উদ্দেশে সুপর্ণের নাম আছে। আবার বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫) বৎসরের জন্য মহাসুপর্ণের নাম আছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (৬।৭।২।৬, ১০।২।২।৪) বীর্য্য ও প্রজাপতিকে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে (১৪।৩।১০) উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞ সুপর্ণরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২।২।৩।৭) কথিত হইয়াছে যে, মহাসুপর্ণই সম্বৎসর। এ সকল স্থলে সুপর্ণ বা মহাসুপর্ণ Aquila নামক তারকাপুঞ্জ বলিয়া মনে হয়।

শ্যেনকে হিন্দীতে শাহিন বলে ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Falco peregrinus perigrinus (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ৩৪)।

(৬১) সঘন।—তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে; হিন্দীতে শকুনিকে (Gyps indicus nudiceps) সগুন বলা হয় (F. B. I., Birds V, ১৯২৮, পৃ. ১৭)। সম্ভবতঃ ইহাই সঘন।

(৬২) সিচাপূ, সীচাপূ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৫) রাত্রির জন্য ইহার উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ ইহাকে পক্ষিবিশেষ বলেন। বঙ্গদেশে Pitta brachyura নামক পক্ষীকে (F. B. I., Birds, ১৯২৬, পৃ. ৪৫৩) সুমচা বলে। ইহাই কি সিচাপূ?

(৬৩) সুপর্ণ।—শ্যেন দেখুন।

(৬৪) সুষিলীকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৬) সাধারণ লোকের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। নেপালে এক জাতীয় পক্ষীকে সসিয়া বলা হয়। ইহা উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক নাম Sasia ochracea (F. B. I., Birds III, ১৮৯৫, পৃ. ৭৭)। ইহাই কি সুষিলীকা?

(৬৫) সৃজয়।-বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৩) মিত্রের উদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছে। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। ইহা কি করা নির্ণয় গেল না।

(৬৬) হংস।—ঋগ্বেদে হংসের জলে সন্তরণ (১।৬৫।৫), শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন (১।১৭৩।১০, ৩।৮।৯) এবং বিচরণের পর বাসস্থানে গমনের (২।৩৪।৫) উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে (৬।১২।১) উক্ত হইয়াছে যে, রাত্রি হংস ভিন্ন অন্য প্রাণীর উপর দিয়া গমন করে। ইহাতে সম্ভবতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, রাত্রিকালে হংস নিদ্রা যায় না। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৯।৭৪) আদিত্যকে আলোকরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হংস বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪।২০) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে (৬।৭।৩।১১) আদিত্যকে শুচিপদ্ (শ্বেতপাদ) হংস বলা হইয়াছে।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৪।২২) সোমের জন্য বন্য হংস, বাতের জন্য হংস, এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।২১) ইন্দ্রের জন্য হংসের উল্লেখ আছে।

হংসের বৈজ্ঞানিক নাম Cygnus olar। কয়েক জাতীয় হংসকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

ঋগ্বেদে নীলপৃষ্ঠ হংসের উল্লেখ আছে (৭।৫৯।৭)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Sarcidiornis melanonotus (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৩৮৫)।

(৬৭) হংসসাচি—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।২।১০) অদিতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে।

আমরা এক প্রকার হংসকে বাঙ্গালায় দিকহাঁস বা সোলঙ্কো বলিতে দেখি; ইহাকে হিন্দীতে সান্‌হ, সিঙ্ক্‌পর বলে; বৈজ্ঞানিক নাম Dafila acuta acuta (F. B. I., Birds VI, ১৯২৯, পৃ. ৪৩৭)। এই পক্ষী সন্তরণকালে গলদেশ ধনুকের স্থায় বক্র করিয়া থাকে এবং পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্থিত করে। ইহাই হংসসাচি? সাচি অর্থে বক্র, তির্য্যক্।

(৬৮) হারিদ্রব।—ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, আমরা হরিমান্ রোগ (পাণ্ডু) হারিদ্রবে স্থাপন করি (১।৫০।১২)। আবার বলা হইয়াছে যে, হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয় (ঋ. বে. ৮।৩৫।৭)। অথর্ব্ববেদের টীকাকার (১।২২।৪) ইহাকে গোপীতনক বলেন। আমাদের মনে হয়, পক্ষীটী হরিদ্বর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করে। Macdonell এবং Keith সাহেব তাঁহাদের Vedic Index নামক পুস্তকে ইহাকে Yellow water wagtail বলেন। Chloropsis aurifrons নামে এক প্রকার পক্ষীকে (F.B. I., Birds I, ১৮৮৯, পৃ. ২৬৪) বঙ্গভাষায় হরিব বলে; নেপালে ইহাকে সবুজ হরিব বলা হয়। ইহার দেহের অধিকাংশ স্থল সবুজ বর্ণ। ইহারা প্রায় জোড়ে চরিয়া থাকে। ইহা হারিদ্রব হইতে পারে।

(গ) সরীসৃপ।—এই শ্রেণী কতিপয় বর্গে বিভক্ত; তন্মধ্যে সর্প, সরট, কুম্ভীর এবং কূর্ম্মবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) সর্প।—আমরা সাধারণভাবে সর্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন কয়েক প্রকার সর্পের নামও পাওয়া যায়:—

ঋগ্বেদে (১০।১৬।৬) সর্পকে হিংস্র প্রাণী বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহু স্থলে বৃত্র, অহি নামে অভিহিত হইয়াছে; এই অহিকে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বৃত্রাহিকে Hydra নামক তারকাপুঞ্জ বলিয়া মনে করি। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪।২।৮।৭-৯) ইষ্টকস্থাপনের মন্ত্রে পৃথিবী (ভূমি), জল, কূপ এবং বৃক্ষ সর্পের বাসস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যের রশ্মি ও যাদুকরের ধনুককে সর্পরূপ বলা হইয়াছে। অন্তরীক্ষ, স্বর্গ (দিব্) এবং স্বর্গের রোচনে (উজ্জ্বল ছদকাংশ) সর্প বাস করে বলা হইয়াছে; এ স্থলে বিদ্যুৎ এবং সম্ভবতঃ তারকাময় কল্পিত সর্পকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অশ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি সর্প (ঋ. বে. ৪।৪।১০)। সর্প হইতে রক্ষার জন্য রুদ্রের স্তুতি আছে (তৈ. স. ৪।৫।১)। সর্প এবং সর্পবিষ হইতে রক্ষা পাইবার মন্ত্র আছে (অ. বে. ৫।১৩, ৬।৫৭, ৭।৫৬, ৯০।৪); ইহাতে কয়েকপ্রকার সর্পের উল্লেখ আছে। সর্পের খোলস ছাড়ার কথাও দেখা যায় (তৈ. স. ১।৫।৪।১)। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের অন্ত্র (সম্ভবতঃ সর্পবৎ কুণ্ডলীকৃত বলিয়া) এবং পশুকা সর্পের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (তৈ. স. ৫।৭।১৭, ৫।৭।২২)।

আমরা বেদে নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় সর্পের উল্লেখ পাই।

অঘাশ্ব (অ. বে. ১০।৪।১০)।—এক প্রকার সর্প। ইহার নামের অর্থ করা যায় যে, ইহা অশ্বের পক্ষে অমঙ্গলসূচক ; সম্ভবতঃ ইহা অজগর জাতীয় বৃহৎ সর্প হইবে ; অথবা এমন কোন বিষাক্ত সর্প (চন্দ্রবোড়া ?) হইবে, যাহা ঘাসের মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং গমনশীল অশ্বের পদে দংশন করে।

অজগর।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৮) বসুর জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১১।২।২৫, ২০।১২৭।১৬)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Python molurus (ময়াল)।

অসিত।—বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) মৃত্যুর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে (৫।৫।১০) ইহা কৃষ্ণবর্ণ সর্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদেও ইহার নাম আছে (৬।৫৬।২, ১০।৪।৫)। ইহা কৃষ্ণবর্ণের কেউটিয়া (Naia tripudians)।

আলিগি।—অথর্ব্ববেদে ইহার নাম আছে (৩।৩৭।১, ৫।১৩।৫,৬)। আলিগি পুংসর্প এবং বিলিগী স্ত্রীসর্প বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে দেখা যায়। আমরা জানি যে, কেউটিয়া সাপেরা স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে গর্ত্তে বাস করে। আবার আলের কেউটিয়ার নাম আমাদের জানা আছে। সুতরাং ইহা কেউটিয়া হওয়াই সম্ভব।

আশীবিষ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৬।১) ইহার উল্লেখ আছে। সুশ্রুত ইহাকে ফণধর সর্প বলেন। ইহা কেউটিয়া হওয়াই সম্ভব।

উপতৃণ্য (অ বে. ৫।১৩।৫)।—একপ্রকার বিষধর সর্প, ঘাসের উপর শুইয়া থাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। আমাদের জানা আছে যে, চন্দ্রবোড়া ঘাসের উপর শুইয়া থাকে। সম্ভবতঃ উপতৃণ্যই চন্দ্রবোড়া হইবে। ইহার নাম Vipera russelli.

উরুগূলা (অ. বে. ৫।১৩।১৮)।—ইহার নাম হইতে অনুমান করা যায়, ইহা অতি দীর্ঘাকার এবং স্থূল। বিষধর সর্পের মধ্যে Naia bungarus সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বৃহৎ সর্প।

কণিক্রন্দ, করিক্রত (অ. বে. ১০।৪।১৩)।—যে সর্প ঘোড়ার ন্যায় শব্দ করে ; সম্ভবতঃ ইহা অসিতের বিশেষণ, ইহা অসিতের সহিত উক্ত হইয়াছে। কেউটিয়ার হিস্ হিস্ শব্দ বোধ হয় লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কল্মাষগ্রীব (অ. বে. ৩।২৭।৫, ১২।৩।৫।৯)।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১০) ইহার নাম আছে। ইহার নামের অর্থ—যাহার গ্রীবায় কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। আমাদের মনে হয়, ইহা

গোখুরা। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং ইহার ফণার উপর একটী কাল দাগ আছে। গোখুরা Naia tripudiansএর ভেদ।

কসর্নীল, কসর্নীর (অ. বে. ১০।৪।৫ ; তৈ. স. ১।৫।৪)।—কস অর্থে চাবুক ; নীল অর্থে নীলবর্ণ (নীর শব্দে এক প্রকার ঘাস, সুতরাং সবুজবর্ণ)। আমাদের মনে হয়, এই সর্প সবুজবর্ণ এবং চাবুকের মত দীর্ঘ ও সরু। এরূপ হইলে ইহাকে লাউডগা সাপ (Dryophis mycterizans) অথবা ঐ জাতীয় কোন সাপ (Dryophisগণের অন্তর্ভুক্ত) মনে করা যায়।

কুম্ভীনস।—তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।৫।১৪) ত্বষ্টার জন্য এই সর্পের উল্লেখ আছে। ইহার নামের অর্থ, যাহার নাসিকা (অর্থাৎ তুণ্ডাগ্র) ছোট ঘটের ন্যায়। সিন্ধুপ্রদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার সর্প দৃষ্ট হয়, যাহার তুণ্ডের অগ্রভাগ সম্মুখদিকে প্রলম্বিত এবং ঘটের অধোদেশের ন্যায় গোলাকার ; ইহার নাম Glauconia blanfordi। ইহাই কি কুম্ভীনস ?

কৈরাত (অ. বে. ৫।১৩।৫)।—এই শব্দ আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু সর্পবিশেষ বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। উত্তর-ভারতে ইহাকে করাইত বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Bungarus cæruleus.

তিরশ্চিরাজি (তৈ. স. ৫।৫।১০ ; অ. বে. ৩।২৭।২, ৬।৫৬।২, ৭।৫৬।১, ১০।৪।১৩, ১২।৩।৫৬)।—ইহার নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার গাত্রে অনুপ্রস্থভাবে বহু রেখা বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ ইহা রাজসাপ বা শঙ্খিনী (শাঁখামুটী) ; ইহার গাত্রে কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণের প্রশস্ত রেখা অনুপ্রস্থভাবে পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Bungarus fasciatus।

তৈমাত (অ. বে. ৫।১৩।৬)।—এই সর্প বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নাম হইতে মনে হয় যে, ইহার দেহ মৎস্যের ন্যায় (তৈম—মৎস্য সম্বন্ধীয়) বিলম্বিত অর্থাৎ চেপ্টা। সম্ভবতঃ ইহা সামুদ্রিক সর্প ; ইহাদের পুচ্ছ বাইন মাছের ন্যায় চেপ্টা। সাধারণ সামুদ্রিক সর্পের নাম Enhydrina valakadyen ; ইহা অতিশয় বিষাক্ত।

দশোনসি, নসোনসি (অ. বে. ১০।৪।১৭)।—ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহার নাসিকার উপর দন্তের ন্যায় প্রবর্দ্ধন আছে। একজাতীয় বিষধর সর্পের (Ancistrodon hypnale) তুণ্ডাগ্রে একটী খর্ব্ব, স্থূল ও ঊর্দ্ধমুখ প্রবর্দ্ধন আছে। সম্ভবতঃ ইহাই দশোনসি হইবে।

নাগ (শ ব্রা. ১১।২।৭।২)।—নাগ শব্দে সাধারণ সাপ এবং কেউটিয়া সাপ, দুই বুঝায়। বঙ্গদেশে কেউটিয়াকে নাগ সাপ এবং করমণ্ডল উপকূলে নগু বলে। সম্ভবতঃ বৈদিক সময়ে নাগ শব্দ কেউটিয়াকেই বুঝাইত।

নীলঙ্গু।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১১) নীলঙ্গুর উদ্দেশে ক্রিমির উৎসর্গের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ সর্প বলেন। আধুনিক অভিধানকারগণ ইহাকে একপ্রকার ক্রিমি বলেন। কয়েক জাতীয় সর্প আছে, যাহারা দেখিতে কেঁচুয়ার ন্যায়; তাহাদের গাত্রের শল্ক এত ক্ষুদ্র যে, তাহা সহজে দেখা যায় না। তাহারা মাটিতে বাস করে। সম্ভবতঃ এই সর্পগুলিকে অভিধানকারগণ কেঁচুয়া বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ সর্পটীর নাম Typhlops brahminus। ইহার বর্ণ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; সম্ভবতঃ ইহাই পুঁয়ে সাপ।

পরশ্বান্।—কৌষীতক্যুপনিষদে (১।২) ইহাকে দুষ্টসর্প বলা হইয়াছে। এই নামের অর্থ করা যাইতে পারে—যাহার পরশ (পরেশ পাথর—মণিবিশেষ) আছে। প্রবাদ আছে যে, গোখুরা সাপের মাথায় মণি আছে। এ সম্বন্ধে আমি একটী সত্য ঘটনা জানি। ত্রিশ বৎসর হইল, এক বৃদ্ধ ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহার লালবাজার ষ্ট্রীটস্থ বৃহৎ বাটীর পশ্চাতের বাগানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে একটী গোখুরা সাপ মুখ হইতে একটী ছোট জিনিস বাহির করিল; তাহাতে ঐ স্থানের চারিদিক্ আলোকিত হইল। ঐ আলোকে যেমন পতঙ্গ সকল পড়িতে লাগিল, সাপটী সেগুলিকে খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই আবার সাপটী তাহা মুখে তুলিয়া লইল।

পৃদাকু।—অথর্ব্ববেদে পৃদাকুর খোলস ছাড়ার কথা দেখা যায় (১।২৭।১); আরও অনেক স্থলে ইহার নাম আছে (৩।২৭।৩, ৬।৩৮।১, ৭।৫৬।১, ১০।৪।১১, ১২।৩।৫৭)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১০) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় কামের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। সায়ণ ইহার নামের অর্থ করেন, কুৎসিত শব্দকারী। ইহার গাত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল (অ. বে. ৬।৩৮।১)। ইহাকে viper, adder বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা Lachesis gramineus; ইহা সমুদয় ভারতে দৃষ্ট হয়। ইহার পৃষ্ঠের রঙ্ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কদাচিৎ পীতাভ বা পিঙ্গলবর্ণ।

পৃশ্নি (অ. বে. ৫।১৩।৫)।—ইহার গাত্র বিন্দু-চিহ্নিত। আমরা কয়েক প্রকারের বিন্দু-চিহ্নিত বিষধর সর্পের নাম জানি। তন্মধ্যে দুইটী জাতি ভিন্ন অন্যগুলি আর্য্যাবর্ত্তে দৃষ্ট হয় না। Callophis macclellandi gorei নামক সর্প কেবল আসামে দৃষ্ট হয়, অন্যটী প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশে দৃষ্ট হয়; ইহার নাম Lachesis monticola; ইহার গাত্রে বড় বড় কাল চতুষ্কোণ দাগ আছে। ইহা পৃশ্নি হইতে পারে।

বভ্রু।—অথর্ব্ববেদে (৫।১৩।৫, ৬।৫৬।২) আমরা বভ্রুস্বজ বলিয়া উল্লেখ দেখি; ইহাতে মনে হয় যে, বভ্রুবর্ণ (অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ) স্বজ সর্পের কথা বলা হইতেছে। স্বজকে viper

জাতীয় সর্প মনে করা হয়। এক জাতীয় viper হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশ্মীরে বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাদের বর্ণ প্রায়ই সমভাবে পিঙ্গল; ইহার নাম Ancistrodon himalayanus। আর এক জাতীয় viper আছে, যাহার রঙ্ কখন (১) সমভাবে সবুজ, কখন (২) সমভাবে রক্তাভ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ, কখনও বা (৩) উভয় মিশ্রিত; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Lachesis purpureomaculatus। ইহাও উত্তর-ভারতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত সর্প খুব সাধারণ বলিয়া ইহাকেই বভ্রু বলিয়া মনে হয়।

মহানাগ (শ. ব্রা. ১১।২।৭।১২)।—কেউটিয়াকে নাগ বলা হয় (নাগ দেখুন)। এই জাতীয় বৃহত্তম সর্পকে Naia bungarus—King Cobra বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহানাগ হইবে।

রথর্বি, রথবৃহা।—অথর্ব্ববেদে (১০।৪।৫) ইহা বিষধর সর্পগুলির সহিত উক্ত হইয়াছে। ইহা কোন্ সর্প, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার নামের অর্থ, রথের ন্যায় বলবান্ বা বৃহৎ। বিষধর সর্প না হইলে ইহা বড় অজগর জাতীয় সর্প (python) হইতে পারে।

লোহিতাহি।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে ইহা বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে copper snake বলেন। অথর্ব্ববেদে তাম্রকে লোহিত বলা হইয়াছে; সুতরাং সর্পটীর গাত্রের রঙ্ তামার মত। সমভাবে তাম্রবর্ণ সর্প ঢেমনা ভিন্ন অন্য কোন সর্প ভারতে দৃষ্ট হয় নাই; ইহার গাত্রে কখন কখন কাল অনুপ্রস্থ দাগ থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Zamenis mucosus; ইহা ভারতের সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাই লোহিতাহি হওয়া সম্ভব।

বাহস।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) বায়ুর উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। অমরকোষে ইহাকে অজগর বলা হইয়াছে। বাজসনেয়ির টীকাকার ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন (পক্ষী—বাহস দেখুন)।

বিলিগি (অ. বে. ৫।১৩।৭)।—আলিগি দেখুন।

বৃক্ষসর্পী (অ. বে. ৯।২।২২)।—ইহা বৃক্ষবাসী সর্প। Dipsas এবং Dryophis জাতীয় সর্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ সর্পই বৃক্ষে বাস করে। তন্মধ্যে Dipsas ceylonensis নামক সর্পটী পশ্চিম-হিমালয় এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতগুলিতে দৃষ্ট হয়। লাউডগা সাপ (Dryophis mycterizans) খুব সাধারণ এবং সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটী, খুব সম্ভব শেষোক্তটী, বৃক্ষসর্পী হইবে।

শ্বিত্র (অ. বে. ৩।২৭।৬, তৈ. স. ৫।৫।১০।২)।—ইহার নামে মনে হয়, ইহা শ্বেতবর্ণ সর্প। অথর্ববেদে (১০।৪।৫) ইহাকে করিক্রত (হিস্ হিস্ শব্দকারী) দর্বী (ফণাবিশিষ্ট) বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সাদা গোখুরা (Naia tripudians)।

স্বজয়া।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) মিত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে শ্বেবতর্ণ সর্প বলেন। সম্ভবতঃ ইহা গোখুরা।

স্বজ (অ. বে. ৩।২৭।৪, ১০।৪।১০, ১৫, ১৭ ; ১২।৩।৫৮)।—এইরূপ কথিত আছে যে, পদদলিত হইলে ইহা দংশন করে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) ক্রোধের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। এক স্থলে ইহাকে বভ্রুবর্ণ বলা হইয়াছে (বভ্রু দেখুন)। সম্ভবতঃ ইহা চন্দ্রবোড়া (Vipera russelli)। ইহা কেউটিয়ার মত রাগী নহে।

(২) সরট বর্গ।—আমরা এই বর্গের অন্তর্গত কয়েকটী প্রাণীর বেদাদিতে উল্লেখ পাই।

কুণ্ড্নাচী।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) অপ্সরাগণের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে বনচরী এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার গৃহগোধিকা বলেন। ঋগ্বেদে (১।২৯।৬) ইহার নাম পাওয়া যায় ; সায়ণ অর্থ করেন, কুটিলগতি। গৃহগোধিকার গতি অনেকটা এঁকা-বেঁকা। সাধারণ গৃহগোধিকার (টিক্‌টিকি) নাম Hemidactylus gleadovii (maculatus)। আর এক প্রকার সরট আছে, যাহা জঙ্গলে, বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা গিরগিটি ; বৈজ্ঞানিক নাম Calops versicolor ; ইহা মহীধরের বনচরী হইতে পারে। সম্ভবতঃ দুইটীই কুণ্ড্নাচী নামে অভিহিত ছিল।

কৃকলাস।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৪০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৯) ত্বীরের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Chamaeleon calcaratus (জৈমিনীয় ব্রা. ১।২২১, বৃহদারণ্যক উপনি. ১।৫।২২)।

গোধা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) বনস্পতির জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদেও ইহার শব্দের উল্লেখ আছে (৮।৬৯।৯) ; গোধার জলে গমনের কথাও আছে (১০।২৮।১০, ১১)। অন্যান্য গ্রন্থেও (অ. বে. ৪।৩।৬, ২০।৯২।৬ ; পঞ্চবিংশতি ব্রা. ৯।২।১৪ ; বৌধা. শ্রৌ. সূ ২।৫) ইহার নাম পাওয়া যায়। গোধা গোসাপ (Varanus) জাতীয় সরট। চারি প্রকারের গোসাপ ভারতে দৃষ্ট হয় ; তন্মধ্যে দুই প্রকার সাধারণতঃ দেখা যায়,—একপ্রকার, Varanus salvator জলে সহজে সাঁতার দেয় এবং

ডুবিয়া থাকিতেও পারে। ইহাকে বাঙ্গালায় সোনা গোসাপ বলে। আর একপ্রকার গোসাপ V. bengalensis সচরাচর বাঙ্গালায় দেখা যায়; ইহাও সন্তরণপটু। সম্ভবতঃ V. salvatorটী গোধা হইবে। V. bengalensis গোলত্তিকা হওয়া সম্ভব (গোলত্তিকা দেখুন)।

গোলত্তিকা।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৬) অপ্সরাগণের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। উণাদিসূত্রে লত্তিকাকে একপ্রকার সরট (গোধা) বলা হয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে অঞ্জরীটকা অথবা পীতশুক্লা বলিয়াছেন। বাজসনেয়ির টীকাকার ইহাকে বনচরিবিশেষ বলেন। সম্ভবতঃ ইহা Varanus bengalensis; ইহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ পীতবর্ণ ও তলদেশ পীতাভ।

শয়াণ্ডক।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৪) মিত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। মহীধর ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে একপ্রকার সরট বলেন। আধুনিক অভিধানকারগণ শয়াণ্ডক শব্দের অর্থে সরট, কৃকলাস এবং সর্প করেন।

(৩) কুম্ভীরবর্গ। কুম্ভীর জাতীয় দুইটী প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

নক্র, মকর।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) সমুদ্রের উদ্দেশে এই দুই নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার নক্রকে দীর্ঘনাসা এবং মকরকে পর্য্যস্ত(প্রশস্ত)নাসিক বলেন। অমরকোষে নক্রকে কুম্ভীর (কুম্ভীল) বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশীয় ঘড়িয়ালের (Gavialis gangeticus) তুণ্ড দীর্ঘ ও সরু, সম্ভবতঃ ইহাই নক্র বা কুম্ভীর। কালক্রমে কুম্ভীব শব্দটী Crocodilus palustrisএ ন্যস্ত হইয়াছে। মকরই Crocodilus palustris বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহার তুণ্ডটী প্রশস্ত। অমরকোষে মকরকে জলজন্তু বলা হইয়াছে। Colebrooke সাহেব বলেন যে, মকরকে কেহ জলহস্তী অথবা কেহ গঙ্গার কুমীর বলেন। রাশিচক্রের মকরের মুখ হস্তীর মত শুণ্ডধারী এবং মধ্যদেহ মৎস্যাকার ও মৎস্যের মত পক্ষযুক্ত। ইহা কাল্পনিক অথবা কোন মৎস্যের আদর্শে গঠিত।

(৪) কূর্ম্মবর্গ।—বৈদিক-সাহিত্যে কশ্যপ ও কূর্ম্ম নামে দুইটী প্রাণীর উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৭) মাস সকলের জন্য কশ্যপের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩৪) দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে কূর্ম্মের নাম পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে আদিত্যকে কশ্যপ বলা হইয়াছে (১৭।১।২৭, ২৮); এই গ্রন্থে বহুস্থলে (১।১৪।৪, ২।৩৩।৭, ৪।২০।৭) কশ্যপের নাম দেখা যায়।

বাজসনেয়ি-সংহিতা (১৭।২৭, ৩০, ৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪।২।৯, ৫।২।৮, ৫।৪।৮) যজ্ঞানুষ্ঠানে কূর্ম্মের ব্যবহার লক্ষিত হয়। আহবনীয় অগ্নিবেদি নির্ম্মাণে কূর্ম্মকে প্রজাপতিরূপী মনে করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বের খুর কূর্ম্মের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (বা. স. ২৫।৩ ; তৈ. স. ৫।৭।১৩)।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কূর্ম্মকে আদিত্য (শ. ব্রা. ৬।৫।১।৬, ৭।৫।১।৬), প্রাণ (শ. ব্রা. ৭।৫।১।৭), দ্যাবাপৃথিবী (শ. ব্রা. ৭।৫।১।১০) এবং শিরঃ (শ. ব্রা. ৭।৫।১।৩৫) বলা হইয়াছে। আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহা হইতে কশ্যপ এবং কূর্ম্মের জন্ম, এ জন্য প্রজাগণকে কাশ্যপ বলা হয় (শ. ব্রা. ৭।৫।১।৫)। পৃথিবীকে জলে সিক্ত করিয়া যাহা ভেদ করিয়াছিল, তাহা হইতে পরে যে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা কূর্ম্ম হইল (শ. ব্রা. ৭।৫।১।৫)। পৌরাণিক বিষ্ণুর কূর্ম্মাবতারের কথা এই সকল বাক্যাবলি হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ ; ইহা স্থলে বাস করে। কূর্ম্ম সম্ভবতঃ জলচর। উত্তর-ভারতে গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি বড় নদীতে কয়েক প্রকার কূর্ম্ম দেখা যায় :—**Trionyx gangeticus** (গাতখোল), **Trionyx hurum** (হড়ুম), **Chitra indica** (চিত্রা) এবং **Emyda granosa** গঙ্গা, সিন্ধু, বড়খাল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

(৬) উভচর।—এই শ্রেণীর অন্তর্গত ভেকবর্গের আমরা উল্লেখ পাই।

তাদুরী (অ. বে. ৪।১৫।১৪)।—তাদুরী স্ত্রী-ভেক ; ইহাকে চারিপদ বিস্তারিত করিয়া পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতে বলা হইয়াছে ; ইহাকে বৃষ্টির জন্যও স্তব করা হইয়াছে। তাদুরী সোনাবেঙ—**Rana tigrina**। ইহার জলে লম্ফপ্রদান এবং সন্তরণ কাহারও অবিদিত নাই।

মণ্ডুক।—ঋগ্বেদে ইহার বহু উল্লেখ দেখা যায়। ইহার জলের জন্য কামনা (৯।১১২।৪), ও জলমধ্যে চীৎকার (১০।১৬৬।৫) প্রভৃতি কথা পাওয়া যায়। আবার দুই প্রকার মণ্ডুকের কথাও পাওয়া যায়—ধূম্রবর্ণ ও হরিৎবর্ণ। ইহারা উভয়েই বৃষ্টিপাতে হৃষ্ট হইয়া শব্দ করে (৭।১০৩।৪) এবং বর্ষায় গর্ত্ত হইতে নির্গত হয় (৭।১০৩।৯)। অথর্ব্ববেদে (৪।১৫।১২) পৃশ্নিবাহুক (বিন্দুচিহ্নিত বাহুযুক্ত) মণ্ডুকের উল্লেখ আছে ; ইহা জলের ধারে বাস করে। আবার (অ. বে. (৭।১২১।২) সবিরাম জ্বর আরোগ্যের মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যেন এই জ্বর মণ্ডুককে আক্রমণ করে।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২১, ৩৬) পর্জ্জন্য এবং সর্পের উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৭।৬) যজ্ঞপূর্ণের জন্য আহুতি মন্ত্রে ইহার নাম আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় অশ্বমেধের অশ্বের চর্ব্বণ-দন্ত মণ্ডুকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার উল্লেখ পাওয়া

যায় (৫।৭।১১)। ব্যাঘারণ এবং বৈশ্বকর্ম্মাহুতিতে একটী দীর্ঘ যষ্টির অগ্রে মণ্ডুক বন্ধন করিয়া, তাহাতে জলদ্বারা নির্ব্বাপিত জ্বলন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হইত।

আমরা দ্বিবিধ মণ্ডুকের উল্লেখ দেখিলাম—হরিৎবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ। অথর্ব্ববেদে বিন্দুচিহ্নিত বাহুবিশিষ্ট মণ্ডুকের নাম পাইলাম। হরিৎবর্ণ বেঙ্‌কে আমরা Rana tigrina (সোনাবেঙ্) মনে করি। ধূম্রবর্ণ মণ্ডুক আমাদের কোলা বা কট্‌কটিয়া বেঙ্ (Bufo melanostictus)। ইহাদের দেহের রঙ্ ধূমের মত এবং চারিপদ বিন্দুচিহ্নিত। ইহারা ভারতের সর্ব্বস্থলে সাধারণভাবে দৃষ্ট হয়।

(চ) মৎস্যশ্রেণী :—আমরা কয়েকপ্রকার মৎস্যের উল্লেখ দেখিতে পাই।

অন্ধাহি।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৭।১৭) অশ্বমেধের অশ্বের বৃহদন্ত্র ইহার উদ্দেশে উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদেও ইহার উল্লেখ আছে। ত্রিকাণ্ডশেষে ইহাকে একপ্রকার মৎস্য বলা হইয়াছে। ইহা কুচিয়া মাছ (Amphipnous cuchia)। এখনও বিহারে ইহাকে 'অন্ধাই' বলা হয়। ইহা অন্ধ সর্প নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে অন্ধসর্প বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

কর্বর।—অথর্ব্ববেদে (১০।৪।১৯) মৎস্যধরের কর্বর ধরিবার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহা কবয়ী—কই মাছ ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Anabas scandens.

জষঃ, ঝষঃ (অ. বে. ১১।২।২৫, গোপথ-ব্রা. ২।২।৫)।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৩) জলের জন্তু ইহার নাম আছে। অমরকোষে ইহাকে মৎস্যের পর্য্যায় বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে আমরা মৎস্যের সহিত ইহার নাম পাই। একপ্রকার মৎস্যকে (Oreinus sinuatus) কাশ্মীরে জিস্, দ্বারবঙ্গে জসির এবং চম্পারণে জাস্‌রা বলে। ইহা আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও হিমালয় পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই জষঃ।

মহামৎস্য।—বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৩।১৮) ইহার নাম আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১৪।৭।১।১৮) ইহার উল্লেখ আছে। ভারতে বৃহত্তম মৎস্য মহাশির, মসাল, মহাশোল প্রভৃতি নামে পরিচিত ; ইহা সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হইলেও পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যায় এবং বৃহত্তম আকারে পাওয়া যায় ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Barbus tor ; ইহাই কি মহামৎস্য ?

রজঃ (অ. বে. ১১।২।২৫)।—রজঃ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ ; ইহা জলজন্তুবিশেষ। আমরা সংস্কৃত ভাষায় রাজহাসক এবং রাজীব দুইটী শব্দ পাই ; শব্দ দুইটী কাতলা মাছের নাম। কাতলামাছের পৃষ্ঠ এবং পক্ষগুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Catla catla (buchanani) ; সম্ভবতঃ ইহাই রজঃ।

শকুল (অ. বে. ২০।১৩৬।১)।—ইহা শউল মাছ (Ophiocephalus striatus)।

আমরা এক্ষণে আর একটী দেশীয় (phylum) প্রাণিগণের আলোচনা করিব। এই দেশের নাম পর্ব্ববদী (Arthopoda)। খোলকী (Crustacea), লৌতের (Arachnida), সন্দংশমুখী (Chiloguatha), দ্বিযুগ্মপদী (Diplopoda) এবং ষট্‌পদী (Insecta) ইহার অন্তর্গত।

(ক) খোলকী।—(১) কক্কট।—তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫।১৫) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।৩২) অনুমতির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে কর্কট (কাঁকড়া) মনে করেন।

(২) কুলীকয়, কুলীশয়।—অথর্ব্ববেদে পুলীকয় (১১।২।২৫) শব্দ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার (৫।৫।১৩) সমুদ্রের জন্য এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২১, ৩৫) মিত্র এবং সমুদ্রের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক সংস্কৃত শব্দ কুলীর অর্থে কাঁকড়া ; সম্ভবতঃ ইহা সামুদ্রিক কাঁকড়া হইবে।

(খ) লৌতের।—আমরা উর্ণনাভ এবং শর্কোটের নাম পাই। এতদ্ভিন্ন ক্রিমিদিগের সহিত কয়েক প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা এই শ্রেণী এবং ষট্‌পদীর অন্তর্গত। সেগুলি সেই সঙ্গেই আলোচিত হইবে।

(১) উর্ণনাভ, উর্ণনাভী—(তৈ. ব্রা. ১।১।৩।৪, তৈ. আ. ৫।১।৪, ৫।১০।৯, শ. ব্রা. ১৪।১।১।৮)।—ইহা মাকড়সা ; ইহার উদরের পশ্চাদ্দেশে কতকগুলি গ্রন্থির (gland) ছিদ্র আছে। তাহা হইতে রস নির্গত হয় ; ঐ রস বায়ুস্পর্শে দৃঢ় হইয়া সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত হয়। এই জন্য ইহার উর্ণনাভ নাম হইয়াছে।

(২) শর্কোট। - অথর্ব্ববেদে (৭।৫৬।৫-৮) উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ভূমিতে পরিসর্পণ করে ; ইহার দুই বাহু, মস্তক অথবা মধ্য দেহে বিষ নাই, কিন্তু পুচ্ছে বিষ আছে। পিপীলিকা ও ময়ূর শর্কোটকে ভক্ষণ করে। ইহা বৃশ্চিক বা কাঁকড়াবিছা ; ভারতের বড়জাতীয় বৃশ্চিকের নাম Scorpio swarmmerdami.

(গ) সন্দংশমুখী।—অথর্ব্ববেদে (৭।৫৬।১) কঙ্কপর্ব্বণের নাম পাওয়া যায়। ইহার বিষ নষ্টের জন্য মধুকবৃক্ষের উল্লেখ আছে। ইহার নামের অর্থ, কঙ্ক—কঙ্কণ, পর্ব্বণ—পর্ব্ব ; অর্থাৎ যাহার দেহ কঙ্কণের ন্যায় পর্ব্বযুক্ত। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, ইহা তেঁতুলিয়াবিছা (শতপাদিক)। আমাদের দেশীয় বড় জাতীয় তেঁতুলিয়া বিছা Scolopendra গণভুক্ত।

(ঘ) দ্বিযুগ্মপদী।—ঋগ্বেদে (১।১৯১।১) কঙ্কত, নকঙ্কত এবং সতীনকঙ্কত, এই

তিনটীকে দাহকর প্রাণী বলা হইয়াছে। সায়ণ কঙ্কত অর্থে, বিষযুক্ত করিয়াছেন। কঙ্কত অর্থে চিরুণী। আমাদের মনে হয় যে, এই প্রাণী তিনটীর দেহ চিরুণীর মত বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে। বিছা এবং কর্ণকোটরীর দেহ দীর্ঘাকার এবং তাহা হইতে ছোট ছোট পদ দুই সারিতে বিস্তৃত থাকে; ইহাদিগকে চিরুণীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। কর্ণকোটরীর পদগুলি ক্ষুদ্র, সংখ্যায় অধিক এবং ঘনসন্নিবিষ্ট থাকায় ইহাকে চিরুণীর সহিত ভাল করিয়া তুলনা করা চলে। অধিকন্তু ইহাদের গাত্র হইতে একপ্রকার তীব্র রস নির্গত হয়। কঙ্কতের পদগুলি সম্ভবতঃ নাতিদীর্ঘ, নকঙ্কতের পদ অতি খর্ব্ব, নাই বলিলেই চলে। সতীন-কঙ্কতের দুই সারি পদ, সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে সজ্জিত থাকে (দুইদিকে দাড়াযুক্ত চিরুণীর মত)। এই সকল প্রাণী Julus, Spirostreptus প্রভৃতি গণভুক্ত।

(ঙ) ষট্‌পদী বা পতঙ্গ। আমরা নিম্নলিখিত কয় প্রকার পতঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই।

(১) অরঙ্গর (ঋ বে. ১০।১০৬।১০)।—অরঙ্গর অর্থে, যে গুন্ গুন্ করে (ক্ষীণস্বরে মন্ত্র পাঠ করে)। এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধু সঞ্চয় করে; সুতরাং ইহা মধুমক্ষিকা। মধুকর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায় (তৈ. ব্রা, শ. ব্রা.)। আবার সরঘ্ নামেও ইহা অভিহিত হইয়াছে (ঋ. বে. ১।১১২।২১, তৈ. ব্রা. ৬।১০।১০।১, পঞ্চ. ব্রা. ২১।৪।৪ ইত্যাদি)। সরঘ্ অর্থে, মনে হয়—যে হুল দিয়া আঘাত করে। ভারতবর্ষে সচরাচর দুই জাতীয় মৌমাছি দেখিতে পাওয়া যায়—Apis dorsata এবং Apis indica.

(২) অল্পশয়ু।—অথর্ব্ববেদে (৪।৩৬।১) এই মক্ষিকা হস্তীকে বিরক্ত করে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সায়ণ বলেন, ইহা অল্পকায় (ক্ষুদ্রাকৃতি), শয়ন-স্বভাব এবং সঞ্চরণাক্ষম (অর্থাৎ চলিতে পারে না) কীট। Oestridæ বংশীয় দ্বিপক্ষবর্গের এক প্রকার পতঙ্গ (Cobboldia elephantis) আছে, যাহা হস্তীর গাত্রে ডিম পাড়ে; ঐ ডিম ফুটিয়া কীটাবস্থা (larva) প্রাপ্ত হইলে ইহা চর্ম্মে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতের জন্য হস্তীটী শুণ্ড দিয়া গাত্রের ঐ স্থান স্পর্শ করিলে কীটটা শুণ্ডে সংলগ্ন হইয়া মুখে নীত হয়। তথা হইতে পাকস্থলীতে যাইয়া পূর্ণ-কীটাবস্থা এবং গুটিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ গুটিকা মলের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পতাঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিশুকীটকেই অল্পশয়ু বলা হইয়াছে।

(৩) ইন্দ্রগোপ (বৃ আ. উ. ২।৩।৬)।—ইহা সম্ভবতঃ Coccinella septempunctata, C. undecimpunctata ও C. repanda। ইহারা রক্তবর্ণ।

(৪) উপজিহ্বিকা, উপচীকা, উপদীকা এবং পৈপ্পলাদ শাখার উপজিকা।—অথর্ব্ববেদে (২।৩।৪, ৬।১০০।২) ইহার মৃত্তিকায় উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণের কথা আছে। ঐ মৃত্তিকা স্রাবরোগের

(রক্তস্রাব—স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব) ঔষধ ; ইহা বিষনাশক। ইহা উইপোকা ; সাধারণ উই-এর বৈজ্ঞানিক নাম Termes obesus.

(৫) খদ্যোত (ছা. উ.), জোনাকি পোকা।—Lucicola gorhami, L ovalis এবং Diaphanes maginella, এই তিন প্রকারের জোনাকি পোকা ভারতে দৃষ্ট হয়।

(৬) জভ্য, তর্দ (অ. বে. ৬।৫০।১-২)।—ইহারা শস্যনাশক পতঙ্গ। জভ্য অর্থে চর্ব্বণকারী ; তর্দ অর্থে ছিদ্রকারী। জভ্য ধান্য ভক্ষণ করে। তর্দ ধান্য ও যব নষ্ট করে। তর্দের ধারাল চোয়াল আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই জাতীয় পতঙ্গ (Calendra oryzæ এবং Calancha granarum) আছে ; ইহারা শস্য (ধান, যব, গম ও ভুট্টা) খাইয়া ফেলে। বাল্যাবস্থায় ইহাদের চোয়াল থাকে, পরে তাহা খসিয়া পড়ে। উভয়েরই মুখ দৃঢ়। ইহাদের দীর্ঘ চঞ্চু আছে। সম্ভবতঃ শিশু পতঙ্গকে তর্দ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পতঙ্গকে জভ্য বলা হইত।

(৭) তৃণস্কন্দ (ঋ. বে. ১।১৭২।৩)।—ইহাকে কেহ কেহ গঙ্গাফড়িঙ্ মনে করেন। গঙ্গাফড়িঙের বৈজ্ঞানিক নাম Tryxalis turrita।

(৮) দংশ (ছা. উ. ৬।৯।৩, ৬।১০।২)।—ডাঁশ অনেকজাতীয়। ইহারা Tabanus গণভুক্ত।

(৯) নদনিমন্ (অ. বে. ৫।২৩।৮)।—এই শব্দের অর্থ শব্দকারী। গঙ্গাফড়িঙ্ এবং উচ্চিঙ্গট উরু ও পাদে ঘর্ষণ করিয়া একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে। ঐ ফড়িঙের মধ্যে সাধারণ দুই জাতির নাম Heiroglyphus furcifer এবং Oxya velox। ইহারা ভারতের সর্ব্বস্থলেই (বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমে) দৃষ্ট হয়। উচ্চিঙ্গট Gryllusগণভুক্ত। সম্ভবতঃ উচ্চিঙ্গটকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(১০) পতঙ্গ (অ. বে. ৬।৫০।২, বৃ. আ. উ. ৬।১।১৯, ৬।২।১৪ ; ছা. উ. ৬।৯।৩, ৬।১০।২, ৭।২।১, ৭।৭।১, ৭।৮।১, ৭।১০।১)।—অথর্ব্ববেদে পতঙ্গ, পঙ্গপাল অর্থে ব্যবহৃত হইত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত ভ্রমণশীল পঙ্গপালের নাম Schistocerca tatarica. উপনিষদে পতঙ্গ অর্থে ষট্‌পদী মনে করা হইয়াছে।

(১১) পিপীল, পিপীলিকা (অ. বে. ৭।৫৬।৭, ২০।১৩৪।৬ ; প. ব্রা. ৫।৬।১০, ১৫।১৭।৮ ; বৃ. আ. উ. ১।৪।৯।২৯ ; ঐ. ব্রা. ১।৩।৮, ২।১।৬)।—পিপীলিকা আমাদের পিঁপড়া। বঙ্গদেশে আমরা কয়প্রকার পিঁপড়া দেখিতে পাই। (১) লাল বা লালসো পিঁপড়া Oecophylla smaragdina ; ইহাদের কীটের দেহ হইতে নির্গত রসে পত্র বদ্ধ করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। (২) ডেঁয়ে পিঁপড়া Camponotus compressus ; বড় ও কাল। (৩) কাঠপিঁপড়া

Sima rufonigra ; বক্ষ লাল, দেহ ও মস্তক কাল ; দংশন বেদনাদায়ক ; সম্ভবতঃ ইহাই প্লুসি (ঋ. বে. ১।১৯১।১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্লুসি অর্থে দাহকর। (৪) ক্ষুদে লাল পিঁপড়া Solenopsis gemminatus. (৫) ডিঁয়ে পিঁপড়া Holeomyrmes scabriceps. ইহাদের মস্তক রক্তাভ এবং পেট কাল। (৬) সুড়সুড়ে বা ধাওয়া পিঁপড়া—Prenolepis longicornis ; ইহার রঙ্ কটা ; শুঁড় দুইটী লম্বা।

(১২) ভৃঙ্গ (অ. বে. ৯।২।২২)।—ইহা একপ্রকার বড় মৌমাছি ; সম্ভবতঃ Xylocopa latipes অথবা X. aestuans।

(১৩) মক্ষি, মক্ষিকা।—ঋগ্বেদে (১।১৬২।৯) এবং অথর্ব্ববেদে (১১।১।২, ১১।৯।১০) ইহার অপক্ব ও পচা মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। আমাদের সাধারণ গৃহ মক্ষিকার নাম Musca domestica।

(১৪) মটচী।—ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১।১০।১) উক্ত হইয়াছে যে, কুরুদেশে মটচী দ্বারা সমুদয় শস্য নষ্ট হয়। টীকাকার ইহাকে বজ্রাগ্নি বলেন। ইহা পঙ্গপাল হওয়াই সম্ভব (পতঙ্গ দেখুন) [Journ. Royal Asiatic Soc., ১৯১১, পৃ. ৫১০]।

(১৫) মশক।—অথর্ব্ববেদে (৭।৫৬।৩) ইহাকে ত্রিপ্রদংশী এবং অর্ত্ত বলা হইয়াছে। সায়ণ ত্রিপ্রদংশী অর্থে—মুখ, পুচ্ছ ও পাদরূপ তিন অঙ্গের দ্বারা দংশনকারী এবং অর্ত্ত অর্থে অল্প-সামর্থ্য বলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রথম কথাটীর অর্থ, যে তিনটী অঙ্গদ্বারা দংশন করে। আমরা জানি যে, মশকের একটী দীর্ঘাকার শুণ্ড আছে, কয়েকটী সূক্ষ্ম সূচ্যাকার যন্ত্রসমষ্টিতে ইহা গঠিত। এই শুণ্ড চর্ম্মে বিদ্ধ করিয়া মশক রক্তশোষণ করে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী দণ্ডাকার স্পার্শন অঙ্গ আছে ; প্রকৃতপক্ষে ইহারা দংশন কার্য্যে কোন সহায়তা করে না। এই তিন অঙ্গকে ভ্রমক্রমে দংশনাঙ্গ বলা হইয়াছে। মশকগণ সচরাচর Culex এবং Anophelesগণভুক্ত। আমাদের সাধারণ মশক Culex fatigans।

(১৬) বঘ (অ. বে. ৬।৫০।৩)।—সায়ণ অর্থ করেন, যে নাশ করে ; তিনি ইহাকে পতঙ্গ মনে করেন। ইহার চোয়ালের কথা আছে। দৃঢ় পক্ষবর্গের (beetles) অন্তর্গত কতকগুলি পতঙ্গ ধানগাছ প্রভৃতির পত্র ভক্ষণ করিয়া বহু অনিষ্টসাধন করে। ইহাদের নাম Hispa aenescens, H. armigera।

(১৭) ব্যদ্ধর (অ. বে. ৬।৫০।৩)।—আরণ্য ব্যদ্ধরের নাম পাওয়া যায়। ইহার অর্থ, যে অরণ্যে নানাপ্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে। বহু প্রকার আরণ্য পতঙ্গ জানা আছে, যাহারা গাছের পাতা, ছাল এবং কাষ্ঠ ভক্ষণ করে ; কতকগুলি দারু-কাষ্ঠের ভিতর নালী

প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ভিতর বাস করে। সম্ভবতঃ এইরূপ পতঙ্গকেই লক্ষ্য করা

(১৮) সূচিক (ঋ. বে. ১।১৯১।৭)।—যাহারা সূচের মত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহারা সূচিক। মশক, ছারপোকা প্রভৃতিকে সূচিক বলা যায়। সম্ভবতঃ মশক বা ছারপোকাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(১৯) সৃজয় ।—তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে নীলমক্ষি বলেন ; সম্ভবতঃ ইহা কাঁটালে মাছি—**Pycnosoma flavicans**।

(২০) স্তেগ, তেগ।—বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫।১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৭।১১) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের দন্ত ইহার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে মক্ষিকা বলেন।

(২১) হলিক্ষ্ম।—(পক্ষীর মধ্যে দেখুন)। কাহারও মতে ইহা গঙ্গাফড়িঙ্ (**Tryxalis turrita**)।

ক্রিমি।—আমরা এক্ষণে ক্রিমি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে (২।৩১, ৩২ ; ৫।২৩) বহু কথা পাওয়া যায় (**Journ. of Ayurveda, IV**, ৫ম, ৮ম, এবং ৯ম সংখ্যা দেখুন)।

ক্রিমিকে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট নামক দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে (অ. বে. ৫।২৩।৬,৭)। দৃষ্ট ক্রিমি চক্ষের গোচর এবং অদৃষ্ট ক্রিমি চক্ষের অগোচর অথবা দেহের অভ্যন্তরে থাকায় দৃষ্টির অগোচর (আমরা শেষোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি)।

ক্রিমির বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহারা পর্ব্বতে, বনে, গাছে ও জলে দৃষ্ট হয় ; ইহারা পশু বা মানবের দেহে প্রবেশ করে (অ. বে. ২।৩১।৫) ; ইহা অন্ত্র, মস্তক ও পার্শ্বীতে থাকে (অ. বে. ২।৩১।৪) ; চক্ষু, নাসিকা ও দন্তেও ইহা দৃষ্ট হয় (অ. বে. ৫।২৩।৩)। এই সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য, তবে জানিতে হইবে যে, অথর্ব্ববেদে অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্গত অনেক প্রাণীকে ক্রিমি বলা হইয়াছে। আমরা দুই দেশীয় প্রাণীকে ক্রিমি বলি—চিপিট ক্রিমি (**Platyhelminthes**) এবং বর্ত্তুল ক্রিমি (Nemathelminthes)।

অথর্ব্ববেদে দুই প্রকার চিপিট ক্রিমির উল্লেখ দেখা যায়।

(১) শালুন (২।৩১।১,২) ইহা কুরীর অর্থাৎ জালের মত জড়াইয়া থাকে, বিশ্বরূপ (নানারূপধারী—দেহের বিভিন্ন স্থান বিভিন্নরূপ), চতুরক্ষ (চারিটী চক্ষু), সারঙ্গ (নানাবর্ণযুক্ত) এবং অর্জ্জুন (শ্বেতাভ)। ইহাকে আমরা ফিতাক্রিমি মনে করি (**Tapeworm—Tænia**

solium অথবা T. saginata)। ইহারা ফিতার ন্যায় চেপ্টা, দৈর্ঘ্যে ১০।১২ ফুট। মস্তক অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাতে ৪টী ভাণ্ডের মত অঙ্গ (sucker) আছে, ইহা দ্বারা অন্ত্রের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। ঐ ভাণ্ড চারিটীকে চক্ষু বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র মস্তকের পশ্চাতে বহুসংখ্যক পর্ব্ব ক্রমান্বয়ে সজ্জিত। এই পর্ব্বগুলির আকৃতি ও আয়তন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ ; এই জন্যই ইহা বিশ্বরূপ। Solium এবং শালুন শব্দে কিছু সম্বন্ধও থাকিতে পারে।

অথর্ব্ববেদে (২।৩২।৬) ক্রিমি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তোমার শৃঙ্গ দুইটী ছিন্ন করি এবং তোমার বিষাধার কুষুম্ভ (স্থলী) ভেদ করি। এই প্রাণী ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা Cysticercus cellulosae বলা হয়। ইহার মস্তকের পিছনে পর্ব্বগুলির পরিবর্ত্তে একটী থলি থাকে।

(২) অথর্ব্ববেদে (২।৩২।৪,৫) উক্ত হইয়াছে যে, ক্রিমিদিগের রাজা, সচিব, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নী সকলে হত হউক। ইহার বাসস্থান এবং বাসস্থানের চারিদিক্ নষ্ট হউক। ইহার ফুল্লকা (ক্ষুদ্র শিশু) হত হউক। আমরা ইহাকে Taemia echinococcus নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা (Hydatid বা echino coccuscyst) বলিয়া মনে করি। ইহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বৃহৎ স্থলীর আকারে বর্ত্তমান থাকে ; স্থলীটী আয়তনে শিশুর মাথার মত বড় হইতে পারে। ইহার ভিতরে জলের ন্যায় একপ্রকার রস থাকে। এই স্থলীর প্রাচীর হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলী প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহাদের ভিতরও ঐরূপ স্থলী প্রস্ফুটিত হইতে পারে। এইরূপে দুই তিন বংশ একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য রাজা, সচিব, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র স্থলীগুলিকে ফুল্লকা বলা হইয়াছে। এই স্থলী মানুষ বা গবাদি পশুর দেহের ভিতর (সচরাচর যকৃৎ ও ফুস্ফুসে, কখনও মস্তিষ্কে) বর্দ্ধিত হয়।

বর্ত্তুল ক্রিমির অন্তর্গত কয়েকপ্রকার ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) অল্গণ্ডু, অলান্দু (অ. বে. ২।৩১।২,৩ ; কৌ. সূ. ৪।৩)। ইহা অবস্কর (সায়ণের মতে যে নিম্নমুখ হইয়া গমন করে), ব্যধ্বর (নানা পথ প্রস্তুত করিয়া গমন করে), এবং পার্ষ্ণী হইতে নির্গত হয় (অ. বে. ২।৩১।৪) ; ইহা কুরীর (অর্থাৎ জালবদ্ধ)। এই সকল বিবরণ হইতে ইহাকে Dracanculus medinensis মনে হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে দুই ফুটের উপর। পূর্ণাবস্থায় ইহা চর্ম্মের ক্ষতস্থলে বাস করে। প্রায়ই পায়ের গোড়ালির ক্ষতে দৃষ্ট হয়। দেশীয় লোকেরা ইহাকে একটী কাটিতে জড়াইয়া প্রত্যহ ১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাহির করিতে থাকিয়া এক পক্ষে সমুদয় ক্রিমিটীকে বাহির করিয়া ফেলে। কৌশিক-সূত্রে এ কথার উল্লেখ আছে।

(২) এই ক্রিমি (অ. বে. ৫।২৩।৯) ত্রিশীর্ষ (তিনটী মস্তকবিশিষ্ট), ত্রিককুদ্, সারঙ্গ (নানাবর্ণযুক্ত) এবং অর্জ্জুন (শ্বেতাভ)। ইহাকে Ascaris lumbricoides মনে করা যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুটের উপর। মুখের চারি পার্শ্বে তিনটী গোলাকার প্রবর্দ্ধন আছে। ইহা অন্ত্রে বাস করে। যখন প্রথম নির্গত হয়, তখন ইহার বর্ণ রক্তাভ-পীত অথবা ধূম্রাভ-পীত থাকে ; কিছুক্ষণ পরে বর্ণ শ্বেতাভ হইয়া যায়।

(৩) এই ক্রিমি শিশুদের দেহে (অন্ত্রে) বাস করে (অ. বে. ৫।২৩।২, ৭)। ইহা যেবাষাদ (পৈপ্পলাদ শাখায় যবাযবা—যবের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ যবের ন্যায় দীর্ঘ), কষ্কষাস (লম্ফদায়ক), এজৎক (জোরে নড়িতে থাকে), শিপবিত্নুক (চাবুকের মত লম্বা) এবং দৃষ্ট বা অদৃষ্ট। ইহা আমাদের ছেলেদের ছোট ক্রিমি—Oryuris vermicularis। ইহা অনেক সময়ে মলদ্বার হইতে নির্গত হয়। এই জাতীয় ক্রিমি মাটি, জল প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয়। পৈপ্পলাদ শাখায় আমরা শিপভিন্নক কথা দেখি ; ইহার অর্থ যাহার চাবুকের মত একটী ভিন্ন দেহাংশ আছে, এইরূপ হইতে পারে ; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেহের এক অংশ চাবুকের মত সূক্ষ্ম এবং আর এক অংশ অন্যরূপ। যবাযবা অর্থে, আমরা দৈর্ঘ্যে দুইটী যবের পরিমাণ ধরিতে পারি ; তাহা হইলে ইহা Trichuris trichiura। ইহারা বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরে বাস করে।

অথর্ব্ববেদে আরও কতকগুলি ক্রিমির কথা দেখিতে পাওয়া যায় (অ. বে ৫।২৩।৪,৫) ; ইহারা সম্ভবতঃ ক্রিমির শ্রেণীভুক্ত নহে। ইহারা এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—(১) দুইটী সরূপ (দেখিতে এক রকম), (২) দুইটী বিরূপ (দেখিতে দুই রকম), (৩) দুইটী কৃষ্ণ, (৪) দুইটী রক্তবর্ণ, (৫) একটী বভ্রু (পিঙ্গলবর্ণ), (৬) একটী বভ্রুকর্ণ (অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ কর্ণ-বিশিষ্ট), (৭) গৃধ্র এবং কোক, (৮) শিতিকক্ষ, (৯) কৃষ্ণ ও শিতিবাহুক এবং (১০) বিশ্বরূপ।

(১) সরূপ ক্রিমিদ্বয় দুই প্রকারের ফিতা ক্রিমি হইতে পারে ; তাহাদের দেহের পার্থক্য অতি সামান্য (শালুন দেখুন)।

(২) বিরূপ।—যে ক্রিমিদ্বয়ের দেহের গঠন কতকটা একরূপ হইলেও কিছু অধিক প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইহারা কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

(৩) কৃষ্ণ।—আমরা সচরাচর দুই প্রকার কৃষ্ণবর্ণের উকুন দেখি। একটী মস্তকের চুলে বাস করে (Pediculus capitis) এবং অপরটী কামপীঠের চুলে দেখা যায় (Phthirius pubis) ; ইহাদিগকে বিরূপ বলা সম্ভব।

(৪) রক্তবর্ণ।—সম্ভবতঃ রক্তবর্ণ দুইটী ছারপোকা হইবে। ছারপোকার স্ত্রী ও পুরুষ দেখিতে কিছু ভিন্ন; সেই জন্য সম্ভবতঃ দুইটী পোকার নাম করা হইয়াছে।

(৫) বভ্রু।—ইহা পিঙ্গলবর্ণের এঁটুলি হওয়া সম্ভব। কুকুর ও গরুর লোমে, কখন কখন মানুষের গাত্রেও দৃষ্ট হয়। সাধারণ এঁটুলির বৈজ্ঞানিক নাম Ixodes recinus।

(৬) বভ্রুকর্ণ।—যাহার কর্ণ পিঙ্গলবর্ণ; সুতরাং মনে হয় যে, দেহের বর্ণ অন্যরূপ। একপ্রকার এঁটুলি (Ornithodoros savignyi) আছে, যাহা বাল্যাবস্থায় পীতবর্ণ। ইহার দুইটী গোল, উন্নত, কৃষ্ণাভ চক্ষু আছে। ইহার উন্নত চক্ষুদ্বয়কে কর্ণ বলিয়া মনে করা যায়। বভ্রুকর্ণ কি, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

(৭) গৃধ্র ও কোক।—সম্ভবতঃ গৃধ্র ও কোকের (কোকিলের) মত দেখিতে বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে। আমাদের দেশে Xenopsylla cheopis এবং Cteno-cephalus canis নামক দুইটী পক্ষহীন পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের দেহের আকৃতি গৃধ্র ও কোকিলের মত। ইহারা ইন্দুর ও কুকুরের গাত্রে থাকে এবং তাহাদের রক্ত পান করে। সময়ে সময়ে মনুষ্যকেও আক্রমণ করে। ঐ দুই প্রাণীকে লক্ষ্য করা হইতে পারে।

(৮) শিতিকক্ষা।—যাহার পার্শ্বদেশ সাদা। ইহা আমাদের খোস-পাঁচড়ার পোকা (Sarcoptes hominis) হইতে পারে। ইহা মাত্র দেখা যায়; ইহার রঙ সাদা, দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি চর্ম্মের ভিতর দিয়া দেখা যায় বলিয়া দেহের মধ্যস্থলে একটু কাল দেখায়।

(৯) কৃষ্ণ ও শিতিবাহুক।—ইহার রং কাল এবং বাহুগুলি সাদা। ইহা কোন এঁটুলি হইবে।

(১০) বিশ্বরূপ।—ইহা নানা মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহার দ্বারা সালুনকে উদ্দেশ করা হইয়াছে; অথবা পতঙ্গদের (যেমন মাছি, মশা ইত্যাদি) রূপান্তরকে (metamorphosis) লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য

তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে তন্ত্র শব্দের অর্থ ও তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা সঙ্গত। কারণ, তাহা না হইলে তন্ত্রমতের উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না।

তন্ত্র শব্দের অর্থ

ব্যাপকভাবে তন্ত্র শব্দ শাস্ত্রমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। তাই সাংখ্যদর্শনের অপর নাম কাপিল তন্ত্র বা ষষ্টিতন্ত্র ; ন্যায়দর্শনের নাম গোতমতন্ত্র ; বেদান্তদর্শনের নাম উত্তরতন্ত্র ; মীমাংসা দর্শনের নাম পূর্ব্বতন্ত্র। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদকে বৈনাশিক তন্ত্র নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের উপাধি ছিল 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র'। তন্ত্র শব্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভাগবিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় (বৃহৎসংহিতা ১।৯)।

তবে উপাসনাবিশেষপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেই তন্ত্র শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং এই অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য এই অর্থে আগম শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং 'তন্ত্র' আগমের একটী বিশেষ বিভাগরূপে গৃহীত হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তন্ত্র ও আগমের একই অর্থে প্রয়োগও দুর্লভ নহে। তন্ত্রসার, তন্ত্রসমুচ্চয়, তন্ত্রালোক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামই তাহার নিদর্শন।

বারাহী তন্ত্রে আগম, তন্ত্র, যামল, ডামর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে ইহাদের আলোচ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে[১]। কিন্তু সেই বিষয়-নির্দ্দেশ হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না।

তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় ও তন্ত্রোপসনার বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ উহাতে অনেক স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উপলভ্যমান তন্ত্রগ্রন্থগুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের অনুগত নহে।

> সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চনম্।
> সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ॥
> ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ।
> সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ইত্যাদি

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় (১০ অ) পাঞ্চরাত্র তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মতঙ্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা নামে চারি পাদে বিভক্ত হইয়াছে। টীকাকার রামকণ্ঠ যোগ ও চর্য্যা স্থলে উপাস্যা ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটী—(১) দর্শন, (২) ক্রিয়া। মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাগ-ভেদ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ তন্ত্রগ্রন্থের দুইটী শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন :—(১) যোগতন্ত্র, (২) ক্রিয়াতন্ত্র।

তন্ত্রোক্ত উপাসনা আলোচনা করিলে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, পূজায় মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন—এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কার্য্যে সিদ্ধি লাভের জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ এবং যোগানুষ্ঠান। অবশ্য কালক্রমে তন্ত্রোপাসনাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য দশ সংস্কার, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপেরও তান্ত্রিক ভেদ কল্পিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিক উপাসনার প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকত্ব

তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমানে যে সকল তন্ত্রগ্রন্থ আমরা পাই, তাহারা যে সময়কার লেখাই হউক না কেন, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নানা দেশের লোকের মধ্যে নানা ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত যে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নাই—তবে যে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আচার তান্ত্রিকতার অতি প্রাচীনতা সূচিত করে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রের ষট্‌কর্ম্মের ও কৌলাচারের অনুরূপ ক্রিয়া, উপাসনায় মদ্যাদির ব্যবহার, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস—বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাক্তন ধর্ম্মের এইগুলিই ছিল অঙ্গ।

অপরকে বশীভূত করিবার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাকারিগণ এইরূপ ক্রিয়াকে sym-

pathetic বা imitative magic নামে অভিহিত করিয়াছেন[১]। "মোম অথবা তজ্জাতীয় কোন দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া, ঐ প্রতিকৃতিকে অভিমন্ত্রিত করা এবং শত্রুর অঙ্গাদি অথবা প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য নখাদির দ্বারা ঐ প্রতিকৃতিকে আহত করা অথবা অগ্নিতে দ্রবীভূত করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল[২]।" কেহ কেহ অনুমান করেন, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ আচার বর্ত্তমান ছিল[৩]।

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কার্য্যাবলীর উদাহরণও বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস্ ও রোমে 'পান' পূজায় এইরূপ কার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রশান্তমহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে স্ত্রী-সঙ্গাদি কার্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়[৪]। এই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা বা লিঙ্গ-পূজার চিহ্ন পরবর্ত্তী যুগে নানা বেশে নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়[৫]। ওয়াল্ সাহেবের মতে সমস্ত ধর্ম্মে গৌণ অথবা মুখ্য ভাবে লিঙ্গ-পূজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়[৬]। নায়ক নায়িকার প্রেম ও রতিসুখ ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে রূপক কল্পনা করিয়া ভগবদুপাসনার বিবরণ সুফী, বৈষ্ণব এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া ভগবদুপাসনার প্রথা তন্ত্রে ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্ম্মোৎকর্ষ লাভের জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও নানাদেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যায়[৭]।

সমস্ত দেশেই অভিচার-কার্য্যে আপাততঃ নিরর্থক শব্দ-সমষ্টির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, যে শব্দটী সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য, তাহাই অধিক ফলোৎপাদক বলিয়া মনে করা হয়।

---

১ Principles of Sociology—Spencer—প্রথম খণ্ড—পৃ. ২৬২ ;
Golden Bough—J. G. Frazer—পৃ. ১০।

২ Semitic Magic—Its origin and developement—Thompson—পৃ. ১৪২-১৪৩।

৩ Journal of the Anthropological Society, Bombay, ৭ম খণ্ড—পৃ. ৪৪৭ প্রভৃতি।

৪ Sex-worship and Symbolism of Primitive Races—Brown—পৃ. ২৭-২৮।

৫ ঐ—পৃ. ২৩

৬ Sex and Sex-worship—Wall—পৃ. ২।

৭ Primitive Culture—Tylor—Vol. II—পৃ. ৪১০, ৪১৬ প্রভৃতি।

ভারতে তান্ত্রিকতা

তান্ত্রিক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য্য জাতির মধ্যে তান্ত্রিকাচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারতে এবং তৎসমীপবর্ত্তী দেশে প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন[১]।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে তান্ত্রিকতার নিদর্শন

কোন কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতে পাওয়া যায়। ব্রুস্ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যসমূহের মধ্যে কয়েকটী লিঙ্গ-মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন[২]।

অধ্যাপক শ্যামশাস্ত্রীর মতে খ্রীষ্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়[৩]। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় কতগুলি মুদ্রার উপর যে সমস্ত দুর্ব্বোধ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মতে তাহা তান্ত্রিক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার পূর্ব্ব রূপ নিঃসন্দিগ্ধরূপেই পাওয়া যায়। তান্ত্রিকদিগের মতে সমস্ত তন্ত্রানুষ্ঠানই বৈদিক—বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। এমন কি, বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্রাদি অনুস্যূত রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সাধারণ ধারণা এই যে, তন্ত্রমত অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর কালীকুলার্ণব তন্ত্রের পুথির প্রথমেই আছে—'অথাত আথর্বণসংহিতায়াং দেব্যুবাচ'। রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে মহাদেবীকে অথর্ব্ববেদশাখিনী বলা হইয়াছে। দামোদর-কৃত যন্ত্রচিন্তামণি-গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-প্রশংসা-প্রসঙ্গে উহাকে অথর্ব্ববেদ-সারভূত বলা হইয়াছে। কুলার্ণবতন্ত্রে (২।১০) কৌলাচারেরও বৈদিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে (২।৮৫) কুলশাস্ত্রকে 'বেদাত্মক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং

বৈদিকযুগে তান্ত্রিকতা

১ 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় (১৩৩৬-পৌষ—পৃ. ৬৪৫-৬৪৮) মল্লিখিত 'তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ B. Foote—*Collection of Indian Pre-historic and Proto-Historic Antiquities.* পৃ. ২০, ৬১, ১৩৯।

৩ *Indian Antiquary*—১৯০৬, পৃ. ২৭৪ প্রভৃতি।

কুলাচারের মূলীভূত কয়েকটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে (২।১৪০—১৪১)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামশাস্ত্রী দেখাইয়াছেন—তান্ত্রিক যন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়[১]। সৌন্দর্য্যলহরীর ৩২শ শ্লোকের টীকায় লক্ষ্মীধর শ্রীবিদ্যার বৈদিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদের মধ্যে তান্ত্রিকতার আভাস স্পষ্টতই অনুভূত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে (৪।২৭) তান্ত্রিকমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ একটী মন্ত্র পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্যের মতে ঐ মন্ত্র অভিচার-কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়।

ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নানা অংশে পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রী-সঙ্গাদির একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখাইবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বামদেব্য উপাসনার স্পষ্ট নির্দ্দেশ, কোনও স্ত্রীলোককেই পরিহার করিবে না।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখা যায়। সৌত্রামণি-যজ্ঞে ইন্দ্র, সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। বাজপেয় যজ্ঞেরও বিধি এইরূপ। যজ্ঞকার্য্যে বহুল ব্যবহৃত সোমরসের মাদকতা গুণের সবিশেষ বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে আছে।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পশুবলির ন্যায় বৈদিক যজ্ঞে পশু নিহত করিবার প্রথা ছিল। এই উপলক্ষে নর, অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল।

তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যুগেই পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের অধিকাংশই ত এইরূপ কার্য্যের বিবরণে পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১৪৫, ১৫৯ সূক্তে) সপত্নী-বিনাশন ও পতিবশীকরণের কথা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২।৩।৯।১) সাংগ্রহণী নামে এক ইষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইষ্টি ও তান্ত্রিক বশীকরণের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ হইতে (২।৩।১০) জানিতে পারা যায়, প্রজাপতি-দুহিতা সীতা সোমকে বশীভূত করিবার জন্য আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাদুর্ভাবকালেও তান্ত্রিক আচার প্রচলিত ছিল। তন্ত্র শব্দ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত না হইলেও তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচারের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy (পৃ. ১৯৬-১৯৭, ৩৩৭), Calcutta Review

বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্যে তান্ত্রিকতার উল্লেখ

১ Indian Antiquary—1906, পৃ. ২৬২—২৬৭।

(June, ১৯২৭, পৃ. ৩৬২-৩৬৩); ও বরোদা হইতে প্রকাশিত সাধনমালা গ্রন্থের ভূমিকা, A Peep into later Buddhism (Annals of the Bhandarkar Research Institute —Vol. X) প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তেবিজ্জ-সুত্ত হইতে জানিতে পারা যায়—একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীর-রক্ষা ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি বা অবনতি সাধনের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ব্রহ্মজালসুত্তেও তন্ত্রাচারসদৃশ একাধিক আচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্রগ্রন্থের প্রাচীনতা

তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও উপলভ্যমান তন্ত্রগ্রন্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, সুপ্রাচীন কোনও গ্রন্থে তন্ত্র শব্দের উল্লেখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বৈদিক সাহিত্যেও তন্ত্র শব্দের ব্যবহার আছে - তবে তাহা শাস্ত্রবিশেষ অর্থে নহে। তান্ত্রিক উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তাহাদের ভাব ও ভাষা বৈদিক যুগের বলিয়া প্রতীতি হয় না। পক্ষান্তরে কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থে (১ম খণ্ড — ১ম অংশ—ভূমিকা পৃ. ৫৫) দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণব ও শৈব আগমের অনেক গ্রন্থে ৭ম—১১শ শতাব্দীর ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের উল্লেখ আছে। তারার উপাসনা এবং তারোপসনাপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না – শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন [১]। অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোকে গ্রন্থের জয়রথ-কৃত টীকায় একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুলাচার মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে অবতারিত হইয়াছিল [২]। ষোড়শনিত্যাতন্ত্র নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে,—

'তন্ত্রং মদুক্তং ভুবনে নবনাথৈরকল্পয়ৎ (?)।'

---

১ Origin and Cult of Tara—Memoir, Archæological Survey, No. 20—পৃ. ১৯.

২ ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে।
কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছন্দেন মহাত্মনা॥
তৎসকাশাত্তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে।

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, নাথ-সম্প্রদায় কর্তৃকই তন্ত্র (অন্ততঃ কুলাচার) প্রবর্ত্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে নাথ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় নাই—ইহাই Wassiljew প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মত। তাহা হইলেই ধরিতে হইবে, ঐ সময়ের পূর্ব্বে কৌলতন্ত্র প্রচারিত হয় নাই।

কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। যোগিনীতন্ত্রে (১৩।১৪) কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুসিংহ বা বেণুসিংহের বিবরণ আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দপাদের জন্মবৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ হইয়াছে[১]। মেরুতন্ত্রে ইংরেজজাতি ও লণ্ডনের উল্লেখ আছে[২]। কোন কোন তন্ত্রে (বিশেষতঃ শাবর তন্ত্রে) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহার দ্বারাও ঐ সকল গ্রন্থের আধুনিকত্বই সূচিত হয়।

স্পষ্টতঃ আধুনিক এই সকল গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বা শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া চালাইতে গেলে স্বভাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাচীন কালেও যে এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে জাগে নাই, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য যামুনাচার্য্য[৩] স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন যে, একদল ভণ্ড বর্ত্তমান কালেও আগমের নামে আগম-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে।

তাহা ছাড়া এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের দোষোদ্ঘাটনের সময় উহার অর্ব্বাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসের ত্রুটি করেন নাই। পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যগ্রন্থে বেদোত্তম স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"কেনচিদর্ব্বাক্তনেনেন ক্ষেত্রজ্ঞেন মহেশ্বরসমাননাম্না ত্রয়ীমার্গবহিষ্কৃতেয়ং প্রক্রিয়া বিরচিতা। তন্নামসামান্যেন কেচিদ্ ভ্রান্তা মহেশ্বরোপদিষ্টমার্গমবলম্বিতবন্তঃ" অর্থাৎ মহেশ্বর নামে অর্ব্বাচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরুদ্ধ তন্ত্রমার্গ প্রচার করে। নামসাদৃশ্যনিবন্ধন কেহ কেহ ভ্রমে উহাকেই মহাদেব-প্রণীত মনে করিয়া ঐ মার্গ অবলম্বন করিয়াছে।

আবার যামুনাচার্য্য তাঁহার তন্ত্র-প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঞ্চরাত্রবিরোধীদিগের মত উপস্থাপন করিবার সময় বলিয়াছেন,—

১ মহানির্ব্বাণতন্ত্র (ইংরেজী অনুবাদ)—মন্মথনাথ দত্ত—ভূমিকা—পৃ. xi

২ ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ।

৩ অদ্যত্বেঽপি হি দৃশ্যন্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ।
অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণা বিচক্ষণাঃ॥

—আগমপ্রামাণ্য—পৃ. ৪।

বাসুদেবাভিধানেন কেনচিদ্ বিপ্রলিপ্সুনা।
প্রণীতং প্রস্তুতং তন্ত্রমিতি নিশ্চিনুমো বয়ম্॥

অর্থাৎ বাসুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে।

পাঞ্চরাত্রমত-নিরাস-প্রসঙ্গে কোন কোন পুরাণেও এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্ম্মপুরাণের মতে সাত্বতবংশীয় অংশু নামক ব্যক্তি কুণ্ডগোলাদি জাতির জন্য এক শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার নামানুসারে এই শাস্ত্র সাত্বত শাস্ত্র নামে পরিচিত।

বস্তুতঃ, ছলনার জন্য হউক আর নাই হউক,কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থ যে অনতিপ্রাচীন কালে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কোন কোন গ্রন্থ ভূতলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—আবার কোন কোন গ্রন্থ ব্যক্তি-বিশেষের রচনা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর শ্রীমতোত্তর তন্ত্র শিব কর্ত্তৃক পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহা শ্রীকণ্ঠনাথাবতারিত; মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় মৎস্যেন্দ্রনাথাবতারিত; ব্রহ্মযামলান্তর্গত যোগবিজয়স্তবরাজ স্বর্গ হইতে পিপ্পলাদ মুনি কর্ত্তৃক আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মূলগ্রন্থ শিবসূত্র মহাদেব কর্ত্তৃক বসুগুপ্তের নিকট স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছিল। আবার ঐ নেপাল লাইব্রেরীরই পূর্ব্বাম্নায়তন্ত্র রত্নদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থপুষ্পিকায় স্পষ্ট এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঐ লাইব্রেরীর জ্ঞানলক্ষ্মী বা জয়াখ্যসংহিতা চন্দ্রদত্তের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ আধুনিক—এমন কি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে অথবা তন্ত্রগ্রন্থমাত্রকেই আধুনিক বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর তন্ত্রের ভাবধারা যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। একাধিক পুরাণে যে তন্ত্র-নিন্দা বা তন্ত্রোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রকে অন্ততঃ সেই সেই পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তন্ত্রবিরোধী সম্প্রদায় মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের কোন কোন বচনকে তন্ত্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতসম্প্রদায়ের উল্লেখ একাধিক ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ, মহাভারত ও পুরাণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতগুলি তন্ত্রগ্রন্থের সময় একরূপ নিশ্চিত ভাবেই স্থির করা যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গুপ্ত-যুগের লেখা কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থের পুথি নেপাল দরবার

লাইব্রেরীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরণও তিনি ঐ লাইব্রেরীর গ্রন্থ-তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের পূর্ব্বরূপ স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু ধারণী সংবলিত সুরঙ্গমসূত্র পাঠ করিতেন। বীল সাহেবের মতে এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারে না—যেহেতু পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকের নিকট ইহা অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইউয়ান্-চোয়াঙের মতে মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তারনাথের মতে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গকর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন,—সরহ 'বুদ্ধকপালতন্ত্র', লুইপা 'যোগিনীসঞ্চর্য্যা', কম্বল ও পদ্মবজ্র 'হেবজ্রতন্ত্র', কৃষ্ণাচার্য্য 'সম্পুটতিলক', ললিতবজ্র 'কৃষ্ণযমারিতন্ত্র', গম্ভীরবজ্র 'মহামায়া' এবং পীতো নামক এক ব্যক্তি 'কালচক্র তন্ত্র' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন[১]।

ইহা ছাড়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হস্তলিখিত জাপানের হরিউজি বিহারে রক্ষিত পুথিতে পাঁচখানি তন্ত্রগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ অমোঘবজ্র ৭৪৬—৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় ৭৭ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উষ্ণীষচক্রবর্ত্তিতন্ত্র, গরুড়গর্ভগতন্ত্র, বজ্রকুমারতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীশ দীপঙ্কর চতুর্বিধ তন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন—এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়[২]। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তন্ত্রোপাসনা এবং কতগুলি তন্ত্রগ্রন্থ কাম্বোজে প্রবর্ত্তিত হয়। (P. C. Bagchi—Indian Historical Quarterly—পঞ্চম খণ্ড—পৃ. ৭৫৪-৭৬৮। এই সকল গ্রন্থ ভারতে যে ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্পষ্টতই অনুমিত হয়।

উপরিনির্দ্দিষ্ট বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি খুবই প্রাচীন। কালক্রমে পুরাণাদির মত তাহারও অনেক স্থান যে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত না হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তন্ত্র যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত।

১ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে সরহ প্রভৃতি খুব প্রাচীন কালের লোক—খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (J. B. O. R. S.—১৪শ খণ্ড—পৃ. ৩৪৩ প্রভৃতি।

২ শরচ্চন্দ্র দাস—J. B. T. S.—Vol. I. pt. I.—১ম খণ্ড—১ম অংশ—পৃ. ৮।

তন্ত্র-প্রামাণ্য

তন্ত্রগ্রন্থ বা তান্ত্রিক আচার যত প্রাচীনই হউক না কেন, ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক আচার্য্যগণ ইহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রাতিপাদন করিতে প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রের প্রামাণিকতা আলোচনার জন্যই একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যামুনাচার্য্য-কৃত 'তন্ত্রপ্রামাণ্য', বেদোত্তম-কৃত 'পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য', বেদান্ত-দেশিকাচার্য্য-কৃত 'পাঞ্চরাত্র-রক্ষা' ও ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত 'তন্ত্রাধিকারিনির্ণয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভাস্কররায়, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শাক্তগ্রন্থে পাঞ্চরাত্র-নিন্দা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যেও আবার তদন্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শাখার নিন্দা প্রচুর পরিমাণে করা হইয়াছে। কৌলমার্গাবলম্বিগণ সময়মার্গের, সময়মার্গাবলম্বিগণ কৌলমার্গের, পশ্বাচারিগণ কুলাচারিগণের, কুলাচারিগণ পশ্বাচারিগণের ভূয়োভূয় নিন্দা করিয়াছেন।

এইরূপ নিন্দার সূচনা আমরা প্রাচীন গ্রন্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে যে স্থলেই তান্ত্রিক আচার সদৃশ আচার উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলেই ইহা যে নিন্দনীয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক স্থলে ইহা দুক্কত বা দুষ্কৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনকে যে পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ তন্ত্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে, এমন কি, কোন কোন তন্ত্রেও স্পষ্টতই তন্ত্রের নিন্দাবাদ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

পুরাণাদিগ্রন্থে কেবল তন্ত্রনিন্দাস্থলেই যে তন্ত্রশাস্ত্রকে অবৈদিক ও বেদবাহ্য বলা হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখপ্রসঙ্গেও তন্ত্রোপাসনা ও বৈদিকো-পাসনা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পুরাণাদির মতে তন্ত্রোপাসনা বৈদিকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত নহে। গুপ্ত-যুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরীর নিশ্বাসতত্ত্ব-সংহিতা নামক তন্ত্রগ্রন্থে তন্ত্রের অবৈদিকত্ববাদের প্রথম সূচনা পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য-লহরীর

টীকায় লক্ষ্মীধর কৌলমার্গকে স্পষ্টই অবৈদিক বলিয়াছেন। ভৈরবডামরের মতে আপাততঃ সুগমরূপে প্রতীয়মান তন্ত্র দুষ্টদিগের প্রতারণার জন্য প্রণীত হইয়াছিল[১]।

কোন কোন তন্ত্রে আবার বেদের প্রতি একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির টীকাকার অপরার্ক একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈদিক শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে[২]।

নেপাল দরবার লাইব্রেরীস্থিত কাকচণ্ডেশ্বরীমত নামক তন্ত্রগ্রন্থের মতে 'স্থবিরত্ব প্রাপ্ত' বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। (বেদানাঞ্চ বয়োঽর্থেন ন সিদ্ধিস্তেন জায়তে।)

কুলার্ণব তন্ত্রে (১১।৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব প্রদর্শনের জন্য বেদকে গণিকা ও তন্ত্রকে কুলবধূর সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৩]।

কোন কোন পুরাণের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য অথবা বেদবহিষ্কৃত পতিত ব্যক্তিদিগের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। বরাহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি অনেক পুরাণেই এই মর্ম্মের কথা পাওয়া যায়[৪]। কূর্ম্ম-পুরাণের মতে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অন্যায্য[৫]।

বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত সাম্বপুরাণের মতে শ্রুতিভ্রষ্ট ও শ্রুতিপ্রোক্ত কার্য্যকরণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র[৬]।

কোন কোন গ্রন্থের মতে তান্ত্রিকদিগের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই সঙ্গত নহে।

---

১ দুষ্টানাং মোহনার্থায় সুগমং তন্ত্রমীরিতম্।—ভৈরবডামর—উত্তর ভাগ।

২ দীক্ষিতস্য চ বেদোক্তং শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিগর্হিতম্।—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা (আনন্দাশ্রম) পৃ. ১১।

৩ বেদস্মৃতিপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব॥

৪ কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বামমার্হতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥—কূর্ম্ম—পূর্ব্ব ১২।২৫৭।

৫ পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ ধর্ম্মাচার্য্যাংস্তথৈব চ।
পাঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥—
কূর্ম্ম—উপরিভাগ পঞ্চদশ অধ্যায়।

৬ শ্রুতিভ্রষ্টঃ শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥—বীরমিত্রোদয়—প্রথম খণ্ড—পৃ. ২৪।

অপরার্ক-ধৃত এক স্মৃতিবাক্য অনুসারে—'কাপালিক, পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই সূর্য্য-দর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে [১]।'

এইরূপ তন্ত্রনিন্দার কারণ অনুসন্ধান করিলে, মনে হয়, তন্ত্রের কতকগুলি আচার, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত ধারণার বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, সাধারণ লোক তন্ত্রোপাসনাকে সাধনার চরমপন্থা মনে না করিয়া ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সুসাধ্য সাধনরূপে মনে করিয়া ইহার উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হয়। যে তন্ত্রানুষ্ঠানকে কুলার্ণবতন্ত্রে অতি কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যাহা অপেক্ষা ক্ষুরধারাশয়ন ও ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনকেও সহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি সুসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া লইল। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্ম-রচিত মত্তবিলাস নাটকে কাপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল ঃ—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষিতব্যং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গো
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিণাকপাণিঃ॥ ১৭

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকেও এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

রণ্ডা চণ্ডা দিক্‌খিআ ধম্মদারা
মজ্জং মাংসং পিজ্জএ খজ্জএ অ।
ভিক্‌খা ভোজ্জং চম্মখণ্ডং চ সেজ্জা
কোলো ধম্মো কস্‌স নো ভাদি রম্মো॥ ১।২৩॥

যে ধর্ম্ম অনুসরণ করিলে মদ্য-মাংস উপভোগ করা চলে, সেই কৌলধর্ম্ম কাহার নিকটই বা রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না ?

মুত্তিং ভণন্তি হরিবম্ভমুহা হি দেআ
ঝানেন বেঅপঠনেন কদুক্কিআএ।
এক্কেণ কেবলমুমাদইএণ দিট্‌ঠো
মোক্‌খো সমং সুরঅকেলিসুরারসেহিং॥ ১।২৪॥

---

[১] কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ শৈবাশ্চ সহ কারুকৈঃ।
দৃষ্টাশ্চেদ্ রবিমীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেৎ স্নানমাচরেৎ॥

হরি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা বলেন,—মুক্তি পাওয়া যায়, ধ্যান, বেদপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা। কেবল উমানাথ মহেশ্বর সুরতকেলি ও মদ্যপানের সাহায্যে মোক্ষলাভের উপায় দর্শন করিয়াছেন।

জৈনদিগের ভরটকদ্বাত্রিংশিকানামক গ্রন্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্দ্রের নর্ম্মমালায় ও মাধবাচার্য্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশাধ্যায়ে তান্ত্রিকদিগের অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে শাক্তদিগের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেও এ জাতীয় কথার অভাব নাই।

'ন কষ্টকল্পনাং কুর্য্যান্নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান্॥
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্য্যান্নিত্যং সমাহিতঃ॥'—অদ্বয়সিদ্ধি।

উপবাসাদি ক্লেশ করিবে না—কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃন্ময় দেববিগ্রহের পূজা করিবে না—কেবল এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে।

সম্ভোগার্থমিদং সর্ব্বং ত্রৈধাতুকমশেষতঃ।
নির্ম্মিতং বজ্রনাথেন সাধকানাং হিতায় চ॥

বজ্রনাথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্যই সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুখেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুখং ন স্ত্রীবিয়োগতঃ।
—একল্লবীরচণ্ডমহারোষণতন্ত্র।

সুখের মধ্য দিয়া বোধি লাভ করা যায় এবং সুখ স্ত্রী-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না।

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানৈর্ন সিধ্যতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিধ্যতি॥
—তথাগতগুহ্যক।

কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না—সকল কামোপভোগের দ্বারাই মানব আশু সিদ্ধিলাভ করে।

এই সকল মতবাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থ ও তদনুযায়ী আচারসমূহ তন্ত্র সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ

অধ্যাপক বেণ্ডাল তাঁহার সম্পাদিত শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'অবস্থা এমন হইল যে, তন্ত্রশাস্ত্র কামশাস্ত্রের রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইল।' বঙ্গদেশে 'বৈষ্ণবী' ও 'বৈরাগী' শব্দ তাহাদের পূর্ব্বগৌরব হারাইল—ঐ দুই শব্দের সঙ্গে অধর্ম্মের একটা ভাব জড়িত হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে (পৃ. ৩১৮) 'হাতে খাপর যোগিনী' অমঙ্গলদৃশ্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

তান্ত্রিক আচার্য্যগণও তন্ত্রপ্রামাণ্যস্থাপনের চেষ্টায় তন্ত্রের সমস্ত আচারই যে সমর্থন করিয়াছেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি তান্ত্রিকচূড়ামণিগণকেও সদাগম ও অসদাগম, বৈদিক তন্ত্র ও অবৈদিক তন্ত্র, এই দুই ভাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই সমস্ত নিন্দা অসদাগম বা অবৈদিক তন্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সদাগম সম্বন্ধে নহে[১]। তাই বোধ হয়, তন্ত্রের এত নিন্দাবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তান্ত্রিকভাবে অনুপ্রাণিত। অবশ্য তন্ত্রের বীভৎস আচার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে তন্ত্রের যে সমস্ত আচার দোষ-দুষ্ট নহে, বর্ত্তমানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও তাহাদের আংশিক অন্তর্ভাব হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বঙ্গদেশে বিবাহাদি বৈদিক সংস্কারের মধ্যে গৌর্য্যাদিষোড়শ-মাতৃকা পূজাদি তান্ত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পূজার মধ্যেই বীজমন্ত্রাদি ও ন্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। উপনীত ব্রাহ্মণকেও তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হয়। তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার মন্ত্র বৈদিক গায়ত্রী অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম্য দেবতার পূজায় তন্ত্রের প্রভাব সবিশেষ আলোচনার বিষয়। এই গ্রাম্য দেবতাদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায়-বহির্ভূত দেবতাগণ তান্ত্রিকভাব ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।[২] কোথাও তন্ত্র সাহায্যে নূতন নূতন দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১ ভাস্কররায় তন্ত্রনিন্দার অন্য ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তিনি বলেন,—তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অতিশয় কষ্টসাধ্য। যাহাতে আপাততঃ সুগমবোধে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া লোকে প্রতারিত না হয়, সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকে নিন্দা করা হইয়াছে।

২ এই সম্বন্ধে মল্লিখিত The Cult of Baro Bhaiya of Eastern Bengal (J. A. S. B. Vol. XXVI) দ্রষ্টব্য।

অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য

পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ইহা আমার বাহিরে, আমা হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ সত্তারূপে নিজকে প্রকাশ করে। চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পক্ষি-বৃক্ষ-সরীসৃপাদি লইয়া ইহা একটা বিরাট্, আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাস্তব রাজ্য খাড়া করে। এই বিরাট্ রাজ্যের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ইহার সামান্য এক ধাক্কায় আমি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইয়া যাই। ইহার সামান্য এক তরঙ্গে আমাকে কোথায় কোন্ অজানা দেশে ভাসাইয়া লইয়া যায়। আমি ইহাকে কেবল দূর থেকে নিরীক্ষণ করিতে পারি মাত্র। ইহা আমার কোনো শাসন মানে না, ইহা আমার কোন প্রকারের অধীনতা স্বীকার করে না। আমি কেবল ইহার দর্শক, ইহার অবিরাম গতির সাক্ষী।

এই ভাবে যখন জগৎ আমার নিকট প্রতিভাত হয়, তখন ইহাকে একটা বিরাট্ 'অস্তি', একটা প্রকাণ্ড সত্তা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ইহার নিরপেক্ষত্ব এতই বিকটভাবে নিজকে প্রকাশ করে যে, ইহাকে আর কিছু মনে করা সম্ভব নহে।

কিন্তু এই জগৎ আবার আর এক দিক্ থেকে অন্য ভাবে আমার নিকট উপস্থিত হয়। ইহা আমার সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, ভাল-মন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহা কখনও আমাকে হাসাইতেছে, কখনও কাঁদাইতেছে, কখনও ইহার প্রতি আমি আসক্ত হইয়া পড়িতেছি, আবার কখনও বা ইহাকে বিরক্তির সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। ইহা কখনও আমার নিকট সুন্দররূপে উপস্থিত হইতেছে। আবার কখনও কুৎসিতরূপে আমার হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার করিতেছে। অর্থাৎ ইহা নানা ভাবে আমার ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহা আমার ব্যক্তিত্বের (personalityর) সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

জগৎ যখন এই ভাবে আমার সহিত জড়িত হয়, তখন আমি ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য

দেখি। ইহা তখন আর কেবল আমার নিকট 'অস্তি' হইয়া ইহার বিকট নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করে না, ইহা তখন আমার ব্যক্তিত্বের ছাপ গায়ে মাখিয়া নিজের পরিচয় দেয়।

অস্তিত্বের দিক্ থেকে দেখিতে গেলে, সবই অস্তি। কিছুই নাস্তি নহে। টেবিল, চেয়ার, ঘটি, বাটী, সবই অস্তি। এমন কি, শশবিষাণ ও আকাশকুসুমও অস্তি। যদি বলেন, আকাশকুসুম কি করিয়া অস্তি? তাহা হইলে বলিব—আকাশকুসুম নিশ্চয়ই অস্তি, আমাদের কল্পনার জগতে অস্তি, ছেলেদের গল্পের বইএ অস্তি, মেয়েদের ব্রতকথায় অস্তি। কিন্তু তাৎপর্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলে শশবিষাণ বা খপুষ্প একেবারেই তাৎপর্য্যহীন। রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতকল্পনা তাৎপর্য্যের দিক্ দিয়া দেখিলেই অসঙ্গত বোধ হয়, অস্তিত্বের দিক্ থেকে নহে। রজ্জুকে যে লোক সর্প মনে করে, সে সত্য সত্যই কিছু দেখে। তাহার দেখাটা মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইতেছে—কি দেখে, তাহার তাৎপর্য্য লইয়া। যাহা দেখে, তাহাতে সর্পের তাৎপর্য্য আরোপ করাই মিথ্যা। রজ্জুও মিথ্যা নহে, সর্পও মিথ্যা নহে। কিন্তু সর্পের তাৎপর্য্য রজ্জুতে আরোপ করাই মিথ্যা। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে না দিলে মিথ্যা হয় না।

ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, অস্তিত্বের রাজ্যে সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই। সত্য-মিথ্যা দুইই আছে তাৎপর্য্যের রাজ্যে। ঝুটো মুক্তা তখনই মিথ্যা হয়, যখন তাহার মূল্যের কথা উঠে। অস্তিত্বের দিক্ থেকে দেখিলে ঝুটো মুক্তারও যেমন অস্তিত্ব আছে, আসল মুক্তারও তেমনি অস্তিত্ব আছে। ছেলেরা খেলার সময় মূল্যের প্রতি নজর রাখে না, সেই জন্য তাহাদের নিকট আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার কোনো পার্থক্য নাই।

এখন দেখা যাক্, এই তাৎপর্য্যের স্বরূপ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আমার অন্তর্জ্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইহা গাছ-পালা, ঘর-বাড়ীর মত আমার নিরপেক্ষ কোন জিনিষ নহে। ইহাতে আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আমি যখন বলি, "এই গোলাপটী সুন্দর, অথবা এই পেঁচাটা কুৎসিৎ", তখন এই সৌন্দর্য্য অথবা তাহার বিপরীত আমার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধের পরিচয় দেয়।

কিন্তু তাৎপর্য্য যদি কেবল আমারই ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ইহা তাৎপর্য্য হইতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত জীবনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, ইহা তাৎপর্য্য হইতে সক্ষম হয় না। ইহার একটা সার্ব্বজনীনতা থাকা আবশ্যক, যাহাতে ইহা আমার তাৎপর্য্য হইয়া সকলের তাৎপর্য্য হইতে পারে। গোলাপকে যখন আমি সুন্দর বলি, তখন ইহা কেবল আমার পক্ষেই সুন্দর—ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহা আমার নিকট

মূল্যবান্, তাহা যদি আর কাহারও নিকট মূল্যবান্ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে মূল্যবান্ বলিতে পারি না। সুতরাং সার্ব্বজনীনতা তাৎপর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ।

বাস্তবিক, তাৎপর্য্যের বিশেষত্বই হইতেছে এই যে, ইহা একাধারে ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন। এক দিকে যেমন ইহা আমার জগতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেয়, অপর দিকে তেমনি আবার সর্ব্বসাধারণের জগতের খবর দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমার জগৎ ও অপরের জগতের মধ্যে যে ব্যবধান আমরা সচরাচর খাড়া করিয়া থাকি, তাহা অত্যন্ত কৃত্রিম। যাহা আমার জগৎ—এমন ভাবে আমার যে, তাহার মধ্যে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই,—তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। সে একেবারেই অব্যক্ত। ভাষাদ্বারা তাহাকে বর্ণনা করা যায় না ; কেন না, ভাষা সর্ব্বসাধারণের রাজ্যেই বাস করে। যেটা বিশেষরূপে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা ভাষায় অধিগম্য নহে।

একমাত্র অনুভূতির রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্যকেই এই ভাবে বিশেষরূপে আমার জগৎ বলা যায় না। কিন্তু এই অনুভূতির রাজ্য মনস্তত্ত্ববিদের অনুভূতির রাজ্য নহে। মনস্তত্ত্ববিৎ অনুভূতির মধ্যে যেটা দেখেন, সেটা আমার অনুভূতির বিশেষত্ব নহে, সেটা সার্ব্বজনীন। তেমনি আবার এই অনুভূতি যদি ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করার যোগ্য হয়, তাহা হইলে আর ইহা আমার নিজস্ব সম্পত্তি থাকিবে না। আমার গায়ে যদি জোরে একটা ধাক্কা লাগে, এবং তজ্জন্য যদি আমি বলিয়া উঠি, "উঃ, বড় বেশী লাগিয়াছে", তাহা হইলে এই ভাষা দ্বারা ব্যক্ত এই ব্যথাকে আমার এই নিতান্ত আপনার রাজ্যের বাহিরে স্থান দিতে হইবে। যেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাজ্য, সেটা একেবারেই অব্যক্ত।

এই জন্যই বোসাঙ্কে বলিয়াছেন যে, তাৎপর্য্যের রাজ্যে আমার তাৎপর্য্য ও সর্ব্বসাধারণের তাৎপর্য্য লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়, উহা অলীক সমস্যা। এ সমস্যা কেবল তখনই উঠে, যখন আমরা আমাদের চৈতন্য আর বাস্তব জগতের মধ্যে একটা ব্যবধান স্বীকার করি।* বাস্তবিক আমার চৈতন্য সার্ব্বজনীন তাৎপর্য্য সর্ব্বদাই সৃষ্টি করিতেছে। আমার চিৎশক্তির

* "This paradox—that in using names we refer to matters as independent of our individual thinking which in this very reference are only represented to us by an act of our own individual mind, certainly inadequate and possibly contradictory to the reference,—this paradox is inevitable if we maintain the ordinary line between the mind and the world" [*Logic*, First Edition, Vol. I, p. 44.]

ক্রিয়া-প্রসূত বলিয়াই যে, আমার তাৎপর্য্য অন্যের তাৎপর্য্যের সহিত ভিন্ন হইবে, তাহার কোন মানে নাই।

ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, তাৎপর্য্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, সর্ব্বসাধারণের, অথচ আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ইহাকে সত্তার রাজ্য (world of existence) হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। যাহার কেবল সত্তা আছে, তাৎপর্য্য নাই, তাহা আমা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন।

এই হিসাবে দেখিতে গেলে সত্তার রাজ্যকে দৃষ্টির রাজ্য, আর তাৎপর্য্যের রাজ্যকে সৃষ্টির রাজ্য বলা যাইতে পারে। কোন দ্রব্য যখন আমার নিকট কেবল "আছে" এই ভাবে প্রতিভাত হয়, তখন আমি সেই দ্রব্যের বিষয়ে কেবলমাত্র একটী দর্শক হইয়া থাকি। কিন্তু যখন আমার জীবনের সূক্ষ্ম তন্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন ইহা আর কেবল "অস্তি" হিসাবে আমার নিকট উপস্থিত হয় না, ইহার একটা তাৎপর্য্য আমি দেখিতে পাই।

প্রতি মুহূর্ত্তেই এইরূপে 'অস্তি' তাৎপর্য্যে পরিণত হইতেছে। সব 'অস্তি' এইরূপে তাৎপর্য্যে পরিণত হয় কি না, এবং যদি না হয়, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের হানি হয় কি না, ইহা দর্শনের একটা প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা বস্তুতঃ দর্শনের সেই মূল প্রশ্ন,—অস্তিত্বের সহিত তাৎপর্য্যের কি সম্বন্ধ।

এই প্রশ্নের এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর কোনও দার্শনিকই দিতে সক্ষম হন নাই। প্রায় সকলেই প্রথমে অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্যের মধ্যে একটা ব্যবধান কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ ব্যবধান রাখিতে পারেন নাই। তাৎপর্য্যকে শেষটায় প্রায় সকলেই অস্তিত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। মিন্‌ষ্টের্বার্গ, রিকার্ট ও হেফ্‌ডিঙ্গ এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই অস্তিত্বের রাজ্য আর তাৎপর্য্যের রাজ্যকে গোড়ায় পৃথক্ করিয়াছেন, কিন্তু শেষে তাৎপর্য্যকে একটা বিপুল 'অস্তির' মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ করাতে তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের মূলমন্ত্রই ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে।*

* মিন্‌ষ্টের্বার্গ তাঁহার চরম তাৎপর্য্য 'Over-self'কে 'Over-reality' বা চরম অস্তিত্ব বলিয়াছেন (Eternal Values, পৃ. ৪২০)।

রিকার্টও অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্যকে একটা বিরাট্ অনুভূতি অথবা জীবনীশক্তির (das Erleben, oder das Lebendige) মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তিকে তিনি পুরুষ বলিয়াছেন ("System der Philosophie. পৃ. ৩১৩")।

যাহা সত্তার দিক্ থেকে খুব বড়, তাহা তাৎপর্য্যের দিক্ থেকে খুব ছোট, এবং যাহা সত্তার দিক্ থেকে খুব ছোট, তাহা তাৎপর্য্যের দিক্ হইতে খুব বড় হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়—সত্তা ও তাৎপর্য্যের এই বিরোধ লইয়া প্রচলিত তাৎপর্য্যবাদের (theory of values) দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু শীঘ্রই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপভাবে উভয়ের পার্থক্য দেখান অসম্ভব। সত্তার দিক্ থেকে খুব বড় হইলেই যে তাৎপর্য্যের দিক্ থেকে খুব ছোট হইতেই হইবে, ইহার কোন মানে নাই। রিকার্টের এই স্থানে মস্ত ভুল হইয়াছিল। তিনি তাৎপর্য্যের রাজ্যকে একেবারে অবাস্তব (Irrealitaet) বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ করাতে তাৎপর্য্যের নিজের স্বরূপ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। তাৎপর্য্য যদি একেবারে অবাস্তব হয়, তাহা হইলে ইহা আর তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। বাস্তব জগতে সম্মান একেবারে হারাইয়া ফেলিলে নিজের রাজ্যেও তাৎপর্য্য মর্য্যাদা হারাইবে। এই জন্যই দেকার্ত্ত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার কথা উঠিতেই পারে না[১]।

এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অস্তিত্বও একটা তাৎপর্য্য। বাস্তবিক, অস্তিত্বকে তাৎপর্য্যের রাজ্যের বাহিরে ফেলার কোন অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অস্তিত্বের তাৎপর্য্য অন্য তাৎপর্য্য হইতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অস্তিত্বের তাৎপর্য্য নাই—এ কথা বলা চলে না। অস্তিত্বও আমাদের সহিত নানা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছে, অস্তিত্বও আমাদের একপ্রকার অভাব পূরণ করে। সুতরাং অস্তিত্বের তাৎপর্য্য আছে বলিতে হইবে। যে সকল দার্শনিক প্রথমে অস্তিত্বকে একেবারে তাৎপর্য্যহীন বলিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়, পরে অস্তিত্বকে একপ্রকার তাৎপর্য্য বলিয়া তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিন্‌ষ্টের্বার্গ প্রথমে অস্তিত্বের রাজ্যকে Nature আখ্যা দিয়া একবারে তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করেন, পরে কিন্তু আবার ইহাতে একপ্রকার তাৎপর্য্য তিনি আরোপ করেন, যাহাকে তিনি value of existence বলিয়াছেন।

তাহা ছাড়া, তাৎপর্য্যের রাজ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের রাজ্য স্বীকার করিলে, এমন একটা দ্বৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে তাৎপর্য্যের বিশেষ হানি হইবার সম্ভবনা। বাস্তব জগতে সত্তা না থাকিলে তাৎপর্য্যের কোন তাৎপর্য্যই থাকে না।

সুতরাং তাৎপর্য্য দুই জগতের অধিবাসী। এক দিকে যেমন ইহা তাৎপর্য্য-রাজ্যের লোক, অন্য দিকে তেমনি ইহা বাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। দুই রাজ্যেই সমান অধিকার না থাকিলে তাৎপর্য্য টিকিতে পারে না। পূর্ব্বে আমি যে রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদাহরণ দিয়াছি, তাহা

[১] "God would be the most imperfect of all beings if he did not exist." (*Meditations*

হইতেই ইহা দেখান যাইতে পারে। ভ্রান্ত ব্যক্তির যে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়, সে প্রত্যক্ষটা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ। সুতরাং অস্তিত্বের রাজ্যে স্থান আছে। কিন্তু তাৎপর্য্যের রাজ্যে ইহার স্থান নাই। ইহা এক রাজ্যের অধিবাসী, দুই রাজ্যের অধিবাসী নহে। এই জন্য ইহাকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়া থাকি। মেকি টাকার বেলায়ও তাহাই। অস্তিত্বের রাজ্যে ইহার স্থান আছে, কিন্তু তাৎপর্য্যের রাজ্যে ইহার স্থান নাই। টাকার মূল্য কেহ ইহাকে দিবে না। মূল্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, ইহা একেবারেই নগণ্য।

এখন দেখা যাক্, তাৎপর্য্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য্য আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই জন্য ইহাকে বোসাঙ্কেট ideal content বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঠিক কোথায়? বর্ত্তমান তাৎপর্য্যবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহার সম্বন্ধ আমাদের তৃপ্তির ভিতর দিয়া। যাহা আমার তৃপ্তি সাধন করে, তাহাই তাৎপর্য্য। কি রকম তৃপ্তি, এইখানে খট্‌কা বাধে। তৃপ্তি আমার অনেক রকম আছে। অনেক তৃপ্তি আছে, যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের সাধনে তাৎপর্য্য ত কিছু নাইই, বরং তাহাদিগকে পূরণ না করায় তাৎপর্য্য আছে। ভোগ-লালসার তৃপ্তিও তৃপ্তি। কিন্তু ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই, এ কথা সব ধর্ম্মশাস্ত্রই একবাক্যে বলেন।

এই জন্যই মিন্‌ষ্টের্বার্গ বলিয়াছেন যে, যে তৃপ্তি ব্যক্তিগত নহে, যেটা ব্যক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করে (Overpersonal), সেই তৃপ্তির নাম তাৎপর্য্য। "Value is an overpersonal satisfaction of the self." এখন দেখা যাক্, এই overpersonal satisfaction বলিতে কি বুঝায়। ইহা প্রথমতঃ একটা satisfaction বা তৃপ্তি। কাহার তৃপ্তি? Self বা আত্মার। কিরূপ তৃপ্তি? Overpersonal অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে।

এখানে প্রশ্ন উঠে, ব্যক্তিগত না হইলে কি কোন তৃপ্তি আমার তৃপ্তি হইতে পারে? Overpersonal satisfaction সোনার পাথর বাটীর মত শুনায়। যদি তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে সেটা ব্যক্তিগত হইতেই হইবে। সেটা overpersonal হইতেই পারে না। অথচ আমরা এইমাত্র দেখিলাম যে, তাহা overpersonal না হইলে তাৎপর্য্য হইতে পারে না। আমার তৃপ্তি হইয়াও, ইহা আমার ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে যাইতে সক্ষম না হইলে তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সম্বন্ধটা এইখানেই।

এ সমস্যার উল্লেখ আমি গোড়াতেই করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ইহাকে যতটা কঠিন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়, আসলে ইহা তত কঠিন নহে। 'আমার' বলিলেই যে তাহা কেবল আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে এবং তাহার ভিতর কোন সার্ব্ব-

জনীনতা থাকিবে না, তাহার কোন মানে নাই। আমার মধ্যেই সার্ব্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুতরাং মিন্‌ষ্টের্বার্গ Overpersonal satisfactionএর উল্লেখ করাতে যে সোনার পাথর বাটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। মিন্‌ষ্টের্বার্গের দোষ, আমার মনে হয়, এখানে নহে। তাঁহার দোষ হইতেছে এই যে, তাৎপর্য্যের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে ইহার রূপ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। Overpersonal satisfaction আর হেগেলের শিষ্যদের self-realizationএ বড় একটা পার্থক্য নাই। অস্তিত্বের দিক্ দিয়া বলা যায় যে, যাহা সব চেয়ে বড় অস্তি (হেগেলের Alsolute), তাহা চরম self-realization ; সুতরাং তাৎপর্য্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় রহিল ?

উত্তরে বলিতে পারেন যে, অন্তিমে তাৎপর্য্যে ও অস্তিত্বে কোনো পার্থক্য থাকে না এবং ইহা দেখানই মিন্‌ষ্টের্বার্গের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক মিন্‌ষ্টের্বার্গ তাঁহার "Eternal values" পুস্তকের শেষে যখন 'অতি-আত্মা' (Over-self)কে চরম তাৎপর্য্য বলিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অন্তে তাৎপর্য্য ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। কিন্তু অস্তিত্বকে গোড়ায় একেবারে তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, পরে আবার সেই অস্তিত্বের চরমকে তাৎপর্য্যের চরম বলা, কেমন যেন যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ঠেকে।

সুতরাং তাৎপর্য্যের লক্ষণ অতিব্যক্তিত্ব বলা যায় না। অতিব্যক্তিত্ব বরং অস্তিত্বের রাজ্যে গোড়া থেকেই আছে। তাৎপর্য্যের রাজ্যে আমাদের প্রথম প্রবেশ ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া। তাৎপর্য্যে যখন অতিব্যক্তিত্ব আসিয়া পৌছে, তখন তাহাকে অস্তিত্ব হইতে পৃথক্ করা একটা দর্শনের সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব যদি বলি যে, ইহা তৃপ্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, তৃপ্তি বলিতে কি বুঝি ? যদি বলি, যাহাতে আমার পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাই তৃপ্তি ; তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, এ তৃপ্তি হেগেল-কথিত self-realization হইতে কি হিসাবে ভিন্ন ?

সমস্যা কাজে কাজেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্যকে পৃথক্ করা ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অথচ তাৎপর্য্য ও অস্তিত্বের পার্থক্যটা উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। তাৎপর্য্যের মধ্যে আমরা এমন কিছু পাই, যাহা অস্তিত্বের মধ্যে পাই না। অস্তিত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেন কতকটা খাপছাড়া গোছের। অস্তিত্ব গর্ব্বিতপদবিক্ষেপে আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। আমাদের দিকে

ভুলিয়াও তাকায় না। ইহার গর্ব্বের কারণ হইতেছে এই যে, ইহা আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহার সত্তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা।

দর্শনের একেবারে গোড়া হইতেই একটা ভেদ চলিয়া আসিতেছে। সেটা হইতেছে—যাহা ঘটে ও যাহা ঘটা উচিত, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য। যাহা ঘটে, তাহার স্থান অস্তিত্বের রাজ্যে। যাহা ঘটা উচিত, তাহার স্থান আদর্শের রাজ্যে। আদর্শের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ দর্শনের একটা জটিল প্রশ্ন। যাহা আদর্শ, তাহা 'অস্তি' নহে, আদর্শ যদি 'অস্তি' হয়, তাহা হইলে তাহা আর আদর্শ থাকে না। অথচ, আদর্শ যদি একেবারেই ভুঁইফোড় আদর্শ হয়, যদি তাহার সহিত অস্তিত্বের কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ কাল্পনিক আদর্শ আমাদের কোনো কাজে আসে না। এরূপ আদর্শকে আমরা সৃষ্টিছাড়া বলিয়া উড়াইয়া দিই।

ভিণ্ডেলবাণ্ড প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক আদর্শকে তাৎপর্য্য বলিয়া ধরিয়াছেন। এবং তাৎপর্য্যের সংজ্ঞা ইঁহারা normative consciousness দিয়াছেন। কিন্তু অস্তিত্বের সহিত সম্বন্ধের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, আমরা তাৎপর্য্য ও আদর্শের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি—তাৎপর্য্যের সহিত অস্তিত্বের সেরূপ বিরোধ নাই, যেরূপ আদর্শের সহিত আছে। তাৎপর্য্যকে অস্তিত্বের বাহিরে নিক্ষেপ করা কিছুতেই যায় না। কিন্তু আদর্শ যতক্ষণ আদর্শ থাকে, ততক্ষণ ইহা অস্তিপদবাচ্য হয় না। এবং যে মুহূর্ত্তে ইহা 'অস্তি'তে পরিণত হয়, সেই মুহূর্ত্তে ইহা আর আদর্শপদবাচ্য থাকে না। অস্তিত্বের সহিত ইহার সম্বন্ধ কেবল এইখানেই যে, অস্তিত্বে পরিণত হইবার শক্তি ইহার আছে, অথবা অস্তিত্বে পরিণত হইবার চেষ্টা ইহা সর্ব্বদা করিতেছে।

সুতরাং তাৎপর্য্যকে আদর্শ বলা চলে না। তাৎপর্য্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।

বাস্তবিক তাৎপর্য্যই প্রকৃতপক্ষে অস্তি। যে অস্তিত্ব কেবল অস্তিত্ব, যাহাতে তাৎপর্য্য নাই, তাহা অস্তিত্বই নহে। সুতরাং তাৎপর্য্য প্রকৃত অস্তিত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে।

এই জন্যই উপনিষদে চরম সত্যকে "সত্যস্য সত্যম্" বলা হইয়াছে। ইহা সত্যের সত্য, অর্থাৎ যে সত্য কেবল অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সত্যের অন্তর্নিহিত যে তাৎপর্য্য, ইহা সেই তাৎপর্য্য। সত্যের ভিতরকার তাৎপর্য্যে যতক্ষণ না আমরা প্রবেশ করিতে পারি, সত্যের সত্যে যতক্ষণ না আমরা পৌঁছিতে পারি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না।

সুতরাং তাৎপর্য্য সত্যেরই এক অবস্থা। ইহা সত্যের চরম অবস্থা।

ইহাই ভারতের অধ্যাত্মবাদের বাণী। যে সত্য কেবল অস্তিত্ব লইয়া আছে, যাহা আমাদের চরম স্থানে ঘা দেয় না, তাহাকে ইহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। "যেনাহং নামৃতা স্যাম্। কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। যাহা অমৃত না দিতে পারে, সে সত্য কিসের সত্য?

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র

ধর্ম্মমঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্মদেবতার প্রাচীনতা

অতি প্রাচীন যুগ হইতে আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন এবং প্রকৃতির শক্তি অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। শত শত নদীপথে অপরিমেয় জলরাশি অবিরত প্রবাহে সমুদ্রগর্ভে নীত হইলেও সমুদ্র স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে না, ইহা লক্ষ্য করিয়া বৈদিক ঋষি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। আবার অপরাহ্ণ কালে নিম্নমুখী সূর্য্য বৃক্ষচ্যুত ফলবিশেষের ন্যায় অকস্মাৎ পড়িয়া যায় না, ইহাও তাঁহাদের কবিহৃদয়ে কৌতূহল জাগরিত করিয়াছে। শূন্যমার্গ-বিচরণশীল সূর্য্যের অবলম্বন বা আশ্রয় কোথায়, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা কূলকিনারা পান নাই। গাভীর বর্ণ কৃষ্ণই হউক আর পীতই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না; গোদুগ্ধ সর্ব্বত্রই শুভ্রবর্ণ। এই সকল এবং এবংবিধ অসংখ্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফলে, তাঁহারা এই সত্যে নীত হইয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের স্থিতি, গতি ও পরিণতি প্রভৃতির মধ্যে একটা অপরিবর্ত্তনীয় শক্তির প্রভাব নিহিত রহিয়াছে। এই শক্তির প্রভাবে অগ্নি দহনশীল, এই শক্তির প্রভাবে জল শীতল, এই শক্তির প্রভাবে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া সঞ্চরণশীল। এই শক্তি 'ঋত' নামে অভিহিত। ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্য্যগণ যখন একত্র অভিন্নজাতিরূপে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই তাঁহারা এই 'ঋত' শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। ইরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তায় এই শক্তি 'অষ' নামে অভিহিত। 'অষ' শব্দ ভারতীয় 'ঋত' শব্দের ইরাণীয় রূপ। এটী বিভিন্ন শব্দ নহে। এই অপরিবর্ত্তনীয়, অব্যর্থ, অবিচলিত প্রাকৃতিক শক্তিই উত্তরকালে আর্য্যগণের মধ্যে নৈতিক জগতেও আরোপিত হইয়াছে। ফলে, প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় নৈতিক জগতেও কেহ এই 'ঋত' বা 'অষ' শক্তির প্রভাব এড়াইতে পারে না। দেবতারাও এই শক্তির অধীন; গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, নর, সকলেই এই শক্তির অধীন। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-গুল্ম, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বত্রই এই 'ঋত' শক্তির অব্যাহত প্রভাব।

আবেস্তা-সাহিত্যে এই শক্তি দেবতারূপে পরিকল্পিত এবং অহুরো-মজ্‌দার পরিষদের মধ্যে ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। অহুরো-মজ্‌দা জরথুস্ত্রীয়গণের সর্ব্বপ্রধান দেবতা এবং

তাঁহার ছয়জন পারিষদের মধ্যে তিনজন পুং দেবতা ও তিনজন স্ত্রী-দেবতা। ইঁহারা 'অমেষ শ্‌পেন্ত' বা 'পবিত্র অমর' নামে পরিচিত। পরলোকের প্রধান নিয়ন্তা অহুরো-মজ্‌দার সভা নিম্নরূপ :—
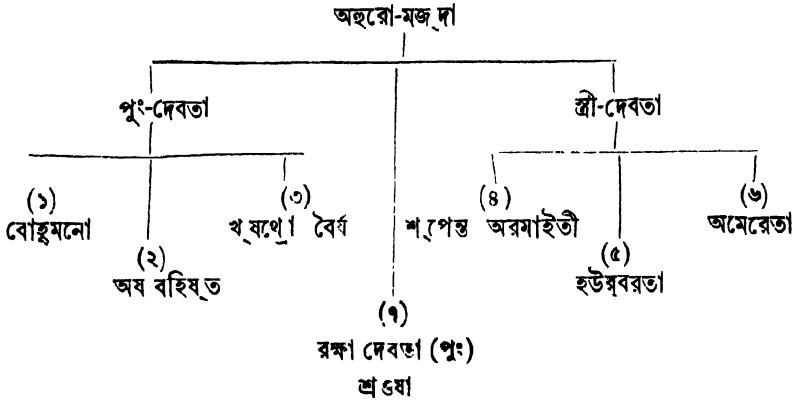
এই পবিত্র অমরগণের নামার্থ এইরূপ :—

১। বোহুমনো = ভাল মন। বিবেক বা সৎপ্রবৃত্তির মূর্ত্তি কল্পনা।

২। অষবহিষ্‌ত = শ্রেষ্ঠ ঋত বা অতি মঙ্গলময় ঋত শক্তি অষ = ঋত = right বহিষ্‌ত = বহু (বসু) + ইষ্‌ত (= ইষ্ঠ) ; অতি মঙ্গলময়।

৩। খ্‌ষথ, বৈর্য = বরণীয় ক্ষাত্র বা রাজশক্তি।

৪। শ্‌পেন্ত অরমাইতী = পবিত্র রতি। ইনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারে।

৫। হউর্‌বতা = সু-আত্মতা, সম্পূর্ণতা ও সুস্থতা। ইনি স্বাস্থ্যবিধাত্রী জলদেবতা। ইনি আমাদের সর্ব্বমঙ্গলা ও শীতলাস্থানীয়া।

৬। অমেরেতা = অমৃততা, অমরতা। দীর্ঘজীবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃক্ষ-দেবতা।

৭। শ্রওষা = শুশ্রূষা, সেবা। ইনি রক্ষা দেবতা। দেবগণের মধ্যে ইনি 'পুলিশ কমিশনার'স্থানীয়। ইহাঁর প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে ইনি উত্তরকালে দেবসঙ্ঘে আসন লাভ করিয়াছেন।

দেব-পরিষদের ন্যায় একটী দেবশত্রু-পরিষদও জরথুষ্‌ত্রীয়গণের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে। সেই পরিষদে দেব-পরিষদের দেবতাগণের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী দৈত্যগণ প্রতিষ্ঠিত। যথা :—

জরথুষ্ত্রীয় ধর্ম্মে অষ দেবতা অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। অহুরো-মজ্দার সৃষ্টিতে জল ও উদ্ভিদ্, পরিষ্কার ও পবিত্র জীবগণ ও সাধু সজ্জনগণ,—সকলের মধ্যেই অষ দেবতার বীজ নিহিত আছে [১]। যজ্ঞ দ্বারা হবনের যোগ্য দেবগণ 'অষ-বহিষ্‌ত' নামক দেবতার প্রভাবেই তাঁহাদের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন[২]। নক্ষত্রগণ, সূর্য্যগণ, এবং দিবালোক-বিধাত্রী উষারা এই দেবতার প্রভাবেই তাহাদের স্রষ্টার গুণকীর্ত্তন করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে [৩]। এই দেবতার অনুগ্রহ যাহার উপর বর্ষিত হয়, বোহুমন তাহার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন ; কিন্তু অষ-বিহীন অসজ্জনের নিকট তিনি কদাপি উপস্থিত হন না [৪]। এখানে বোহুমন অপেক্ষা অষ দেবতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত। আবেস্তা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশভূত গাথা সমূহে অষ দেবতার প্রভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়াই বেদ বাক্যের ন্যায় আবেস্তা বাক্যের অপ্রতিহততা এবং গাথামন্ত্র বিহিত যজ্ঞফল সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী [৫]। জগদ্রক্ষা কার্য্যে শ্রওষা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেন না তাঁহার সহিত অষ দেবতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছেন [৬]। বহু স্থানেই উক্ত হইয়াছে যে, অহুরো-মজ্দায় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা অষ-প্রভাবে। কিন্তু পাপীদিগের ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা প্রভাবে অষ দেবতার সুশাসিত উপনিবেশ সমূহেও নানাবিধ অশান্তি উপজাত হইয়া থাকে[৭]। শয়তানের সহচর দৈত্যগণের প্রভাবে জরথুষ্ত্রীয়গণের মধ্যে নানারূপ উৎপীড়ন সংঘটিত হইলে অহুরো-মজ্দা ও অষ দেবতার মধ্যে রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য যে কথোপকথন হয়, তাহাতে অষ দেবতার উক্তি হইতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে, যতদিন রক্ষকগণের মধ্যে কাম-ক্রোধাদির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইবে, ততদিন গো-নির্য্যাতনাদি অমঙ্গল

---

১ যশ্ন ৮,৪
২ যশ্ন ১।১৯ ; ৫,২৫ ; ৭।২৩ ৭১:৫ ইত্যাদি
৩ যশ্ন ৫০।১০
৪ যশ্ন ৩৪।৮।
৫ যশ্ন ৪৫।৪
৬ যশ্ন ৫৬।৩, ৪
৭ যশ্ন ৮।৩

দেশমধ্যে অবশ্যম্ভাবী[১]। অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির মোহ অষ দেবতার শান্তিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী।

এই সকল বর্ণনা হইতে অষ দেবতার প্রভাব ও তদ্‌বিরোধী মোহাদির প্রভাবাধিক্য যুগপৎ বিবৃত হইয়াছে দেখা যায়।

আবেস্তার 'অষ' দেবতার ন্যায় বেদের 'ঋত' অতি প্রাচীন কালেই আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুভূত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান দেবতাগণের ইচ্ছা ও অবেক্ষাবশতঃ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যে অব্যর্থ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই 'ঋত'। এই 'ঋত' শব্দ সত্য শব্দ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন হইলেও কালক্রমে 'ঋত' নৈতিক জগতেরও নিয়ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদের এই 'ঋত' শব্দ বহুকাল অক্ষুণ্ণ প্রতাপে নিজের আসন অবিচলিত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তরকালে 'ধর্ম্ম' শব্দ এই শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণের নিকট মহা সমাদর লাভ করিয়াছে। আবেস্তার 'অষ' শব্দের ন্যায় দেবতার স্থান অধিকার করিবার সৌভাগ্য ভারতীয় 'ঋত' শব্দের হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দ এ বিষয়ে ঋত শব্দ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্। ভারতের বৈদিক যুগেই ধর্ম্ম শব্দ ব্যক্তিত্ব-বাচকতা (Personification) লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দেববাচকতায় উন্নীত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণের (১৩শ কাণ্ডে, ৪র্থ অধ্যায়ে, ৩য় ব্রাহ্মণে) পারিপ্লব-কাহিনীর বিবরণ-প্রসঙ্গে সকল দিগ্‌দেশস্থিত রাজা, প্রজা, দেবতা ও জীবের উল্লেখ আছে। রাজা যম বৈবস্বতের প্রজা পিতৃগণ; রাজা বরুণ আদিত্যের প্রজা গন্ধর্ব্বগণ; রাজা সোম বৈষ্ণবের প্রজা অপ্সরো-গণ; রাজা অর্বুদ কাদ্রবেয়ের প্রজা সর্পগণ; রাজা কুবের বৈশ্রবণের প্রজা রক্ষোগণ; রাজা অসিত ধ্বানের প্রজা অসুরগণ; রাজা মৎস্য সাম্মদের প্রজা জলচর ও ধীবরগণ; রাজা তার্ক্ষ্য বৈপশ্যতের প্রজা পক্ষিগণ; রাজা ধর্ম্ম ইন্দ্র, প্রজা দেবগণ[২]। দেবগণের যিনি রাজা, তিনি অবশ্য দেবতা। সুতরাং শতপথ-ব্রাহ্মণের যুগেই ধর্ম্ম শব্দ ব্যক্তিত্ববাচক এবং দেবতাবাচক হইয়াছে। ধর্ম্ম দেবতার আসন দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত।

অপর এক ধর্ম্ম ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উদ্ভূত। ইঁহার তিন পুত্র—(১) শম, (২) কাম, (৩) হর্ষ।

---

১ যস্ন ২৯।২-৩ ২ শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।৬-১৪

পৌরাণিক যুগে ধর্ম্ম বহু স্থলে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমরাজা ধর্ম্ম অর্থে অদ্যাবধি পূজিত। ইঁহারই পুত্র ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। স্থানান্তরে বিষ্ণু ও ধর্ম্ম অভিন্ন দেবতারূপে পরিকল্পিত। অন্যত্র ধর্ম্ম প্রজাপতি এবং দক্ষ-জামাতা। অপর এক স্থলে ইনি 'ঘৃত' নামক পুত্রের পিতা এবং 'অণু' নামক পিতার সন্তান। অন্য এক স্থানে তিনি হৈহয়বংশীয় নেত্রের পিতা। ইহা ছাড়াও বহু স্থলে ধর্ম্ম নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ধর্ম্ম দেবতা নিতান্ত অর্ব্বাচীন যুগের দেবতা নহেন।

বৈদিক মন্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায় যে, বৈদিক যুগেই প্রাচীন ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণের গৌরব হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছিল। বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় একজন দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্তুতিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্তব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্যান্য দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতেন[১]। বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহাকেই সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজী ভাষায় হেনোথিজম্ (Henotheism) বলা হয়। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট উপলক্ষে, কোনও নির্দ্দিষ্ট দেবতা সর্ব্বোচ্চ দেবতা বলিয়া সমাদৃত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্ম্মবিষয়ে যুগান্তর-সৃষ্টির পূর্ব্ব সূচনা বলা যাইতে পারে। বহুদেবতাক সমাজে ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে সম্প্রদায়-ভেদে একেশ্বর-বাদিত্বের পূর্ব্বলক্ষণ এই কালেই সূচিত হইয়াছিল। এই কালেই আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা হারাইতেছেন। একজন ঋষি বলিয়া উঠিলেন :—

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?"[২]

কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইবে? কাহাকে হবি দান করা হইবে? ইহাই ঋষির সন্দেহ। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী ঋষি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন। অন্য এক ঋষি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পিতা বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন[৩]। অপর একজন ঋষি 'পুরুষ' দেবতাকে

---

১ Max Mueler's Six Systems of Indian Philosophy, ed. 1916,—পৃ. ২৪০, and note, S. N. Das Gupta, History of Indian Philosophy. Vol. I, পৃ. ১৮-১৯।

২ ঋগ্বেদ ১০।১২১, ঋগ্বেদ ১০।৮২।

সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন[১]। হয় ত আরও অনেক ঋষি আরও অনেক দেবতাকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই সকল দেবতার গৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দর্শনশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত 'ঈশ্বর'-দেবতা একাল পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আসনে বসিতে পারেন নাই।

নাসদীয় সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০।১২৯) প্রদত্ত সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিবরণ বৈদিক ও উপনিষদীয় ঋষিগণের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগরূক করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিসাবে এই সূক্তটী অত্যন্ত মূল্যবান্। এই সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা 'শূন্য'রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তখন 'সৎ' ছিল না, 'অ-সৎ'ও ছিল না। 'অন্তরীক্ষ' ছিল না, 'আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতল-স্পর্শ জলরাশিই কি ছিল? মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব 'ছিল-না'র মধ্যে তিনি ছিলেন,—নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগরূক হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শূন্যের মধ্যেই সদ্‌বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আলোকপাত হইল। তখন বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও উর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টি-রহস্য? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে? হয় ত তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?[২]

এই ঋষি সৃষ্টি বিষয়ে কেবলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিশ্বের আদিভূত অনাদি পুরুষ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন কি না, এবং এই সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন কি না, সে বিষয়ে ঋষির ঘোর সন্দেহ। কিন্তু সৃষ্টি হইবার

১ ঋগ্বেদ ১০।৯০

২ ঋগ্বেদ ১০।১২৯। এবং S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy, vol. I, পৃ. ২৪; Max Mueller's Six Systems, পৃ. ৪১।

পূর্ব্বে যে এই বিশ্ব ছিল না, সে বিষয়ে ঋষির কোনও সন্দেহ নাই। ভাবের বা সত্তার পূর্ব্বে তিনি অভাব বা অ-সত্তার কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সদ্‌বস্তু অনাদি পুরুষের সত্তা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই বিশ্বসৃষ্টি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে যাবতীয় দেবগণের অসত্তা স্বীকার করিয়া তিনি যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার এই সাহসিকতা হইতেই বৈদিক যুগে সাম্প্রদায়িকতা ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তাঁহার দল-বল না থাকিলে কি তিনি সাহস করিয়া বৈদিক দেবগণের অসত্তাবিষয়ক চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন ?

এই ঋষির সম্প্রদায়-ভুক্ত অপর একজন ঋষি ইঁহারই সৃষ্টি-বিবরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। ইনি বলেন, সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌বস্তুও ছিল না, অসদ্‌বস্তুও ছিল না। এই বিশ্ব না-সৎ না-অসৎ, এই ভাবে প্রতীয়মান ছিল। মনে হইত যেন বিশ্ব আছে, আবার মনে হইত যেন বিশ্ব নাই। তখন কেবলমাত্র সেই 'মন' ছিল। নাসদীয় সূক্তের ঋষি এই জন্যই বলিয়াছেন যে, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। কারণ, মন তখন প্রকাশিত হয় নাই। সৃষ্টির পর এই মন প্রকাশের ইচ্ছা লাভ করে, ইচ্ছার পর তপস্যাচরণ করে, এবং সেই তপস্যার ফলে ক্রমে ক্রমে এই মন প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে উপনিষদীয় ঋষিগণের তত্ত্বজিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হইয়াছে, নানা স্থানে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষির মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছে, বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মদর্শী ঋষিকে তর্কে পরাভূত করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে বহু দর্শন ও বহু ধর্ম্মবিপ্লব ভারতভূমিতে নূতন নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু নাসদীয় সূক্তের ঋষি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকেই এ বিষয়ে যুগ-প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। নাসদীয় সূক্তে যে পাঁচটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট-ভাবে উক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা মনে রাখিতে হইবে।

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ শূন্যময় ও তমসাবৃত ছিল।

(২) অনাদি পুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সত্তাবান্।

(৩) তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শূন্যের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া বিশ্বের বীজ-স্বরূপ তিনি প্রকাশমান হইয়াছেন।

(৪) বৈদিক দেবগণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন না ; তাঁহারা উত্তরকালে সৃষ্ট।

(৫) তাঁহারই দয়ায় বৈদিক কবি অসদ্‌বস্তুর মধ্যে সদ্‌বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন।

---

১ শতপথ-ব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।১। এবং S. N. Das Gupta পৃ. ২৪।

পরের আলোচনায় দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মপুরাণীয় সৃষ্টিতত্ত্বে এই পাঁচটী কথাই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক যুগে ধর্ম্মঠাকুরের বঙ্গবাসী ভক্তগণকে নাসদীয় সূক্তের ঋষির সম্প্রদায়-ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শতপথ-ব্রাহ্মণে ধর্ম্মদেবতা দেবগণের রাজপদে বৃত হইয়াছেন। দেবগণ ইঁহার প্রজা ('বিশঃ') এবং অপ্রতিগ্রাহক শ্রোত্রিয়গণ ইঁহার সভায় উপস্থিত। সামবেদ এই সম্প্রদায়ের বেদ, এবং ধর্ম্মদেবতার সভায় সামবেদের দশটী সূক্ত গীত হয়[১]। কৃষি-প্রধান আর্য্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র। সেই ইন্দ্রদেবতা ধর্ম্মদেবতায় বিলীন হইয়া গেলেন। এই ধর্ম্মদেবতার শক্তি ঋত শক্তি বা 'অষ'-দেবতার শক্তির ন্যায় অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য হইলেও ইনি কৃষিপ্রধান দেশে জলদেবতারূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে জল বা বৃষ্টির জলকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ধর্ম্মই জল; কেন না, যখন ইহলোকে জলের আগমন হয়, তখন সকল বিষয়ই ধর্ম্মের অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন বৃষ্টির অভাব হয়, তখন প্রবল দুর্ব্বলকে আক্রমণ করে। সুতরাং জলই ধর্ম্ম[২]। এই ভাবে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ধর্ম্মদেবতা বহুকাল ধরিয়া সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এইটী কোন্ সম্প্রদায়, তাহা নির্ণয় করা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি

১ শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৪ –অথ দশমেঽহন্। এবমেবৈতাস্বিষ্টিষু সংস্থিতাস্বেবৈবাবৃদধ্বর্যবিতি হবৈ হোতরিত্যেবাধ্বর্য্যু ধর্ম্ম ইন্দ্রো রাজেত্যাহ তস্য দেবা বিশস্ত ইম আসত ইতি শ্রোত্রিয়া অপ্রতিগ্রাহকা উপসমেতা ভবন্তি তানুপদিশতি সামানি বেদঃসোঽয়মিতি সাম্নাং দশতং ব্রূয়াদেবমেবাধ্বর্য্যুঃ সম্প্রেষ্যতি ন প্রক্রমান্ জুহোতীতি ॥১৪॥

And on the tenth day, after those (three) offerings have been performed in the same way, there is the same course of procedure. 'Adhvaryu !' he (the Hotri) says,—'Havai hotar !' replies the Adhvaryu —'King Dharma Indra', he says, 'his people are the Gods, and they are staying here ;'—learned Srotriyas (theologians) accepting no gifts, have come hither : it is these he instructs ; 'the saman (chant-texts) are the Veda ; this it is ;' thus saying, let him repeat a decade of the saman. The Adhvaryu calls in the same way (on the nasters of the lute-players), but does not perform the Prakrama oblations. S. B. E. XLIV. পৃ. ৩৭০.

২ শতপথে ১১।১.৬।২৪—অথোদীচীং দিশমপশ্যন্। তামপোঽ কুর্বন্তোপৈনামিতঃ কুর্গীমহীতি তং ধর্মমকুর্বত ধর্মো বা আপস্তস্মাদ্ যদেমং লোকমাপ আগচ্ছন্তি সর্বমেবেদং যথাধর্ম্মং ভবত্যথ যদা বৃষ্টির্ভবতি বলীয়ানেব তর্হ্যবলীয়স আদত্তে ধর্ম্মো হ্যাপঃ ॥২৪॥

এই দেবতার ভক্ত সম্প্রদায়ের একান্ত অভাব যে কখনও হয় নাই, তাহা আনুষঙ্গিক অনেক প্রমাণ হইতেই বুঝা যায়। উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই দেবতা নানা দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীব এই জগতে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে এবং কর্ম্মের অবসান হইলেই পুনর্জন্মেরও অবসান হয়, এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বকালেই প্রচলিত আছে। মৃত্যুর পরই এই কর্ম্ম অর্থাৎ জীবকর্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। যে দেবতা মৃত্যুর পরপারে জীবের পাপ-পুণ্য বিচার করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। এই জন্যই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ধর্ম্মদেবতা যমরাজের আসনে প্রতিষ্ঠিত। শতপথ-ব্রাহ্মণে তিনি ইন্দ্রের আসনে অধিষ্ঠিত। আবার কখনও বা তিনি বৃষরূপী অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ-স্থানীয়; পুরাণান্তরে তিনি বিষ্ণুদেবতা; আবার কখনও বা তিনি প্রজাপতি; কোনও স্থলে তিনি ব্রহ্মার পুত্র এবং শম, কাম ও হর্ষ নামক পুত্রত্রয়ের জনক। জৈনদিগের মধ্যেও তিনি পঞ্চদশ অর্হৎ-রূপে পূজিত, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সত্ত্ব-গঠনের সহায়ক। এই ভাবে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্মদেবতা নানাভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাস সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার; কারণ, ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের দার্শনিকগণের কোনও কালেই ছিল না। কত উপনিষদ্, কত দর্শন, কত ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল বিশাল দর্শন-সাহিত্যের সংগঠন করিয়াছেন, বা করিবার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও বিবরণ তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য দার্শনিক মতও অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকারে গ্রথিত। সেই সকল সংক্ষিপ্ত সূত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সে কালে সকলেই মুখে শুনিয়া শিখিতেন ও বুঝিতেন, এবং সেই জন্য সূত্রাকারে গ্রথিত দার্শনিক তথ্য কণ্ঠস্থ করিয়া সে কালের পণ্ডিতগণ দার্শনিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়েও একই কথা বলা যায়। মোক্ষমূলর্ সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভারত ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন গঙ্গা ও সিন্ধু ব্যতীতও অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী অসংখ্য ধারায় হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিত হইত, সেইরূপ ভারতবাসীর মানসিক উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্যও অতি প্রাচীন কালেই অসংখ্য ধর্ম্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল; উপনিষৎসমূহে আমরা তাহার অংশমাত্র দেখিতে পাই[১]।

[১] Max Mueller's Six Systems, পৃ. ৫।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে অসংখ্য ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 'ব্রহ্মজালসূত্র' হইতে সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই বৌদ্ধ 'সুত্ত' গ্রন্থখানিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব ৬২ প্রকার বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্ম্মমতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ধর্ম্মমতও আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া বুদ্ধদেব নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাভারতেও এই প্রকার বহু ধর্ম্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। জৈনগণও এইরূপ ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতবর্ষে শাখা প্রশাখা-সমন্বিত অসংখ্য ধর্ম্মমতের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একালে সেই সকল ধর্ম্মমতের নিরাকরণ চেষ্টায় কোনও ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ধর্ম্মমতের অনুরূপ অসংখ্য সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। উত্তরকালে অন্যান্য ধর্ম্মমতের সহিত সম্পর্কে তাহাদের ধর্ম্মমতের কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলেও মূলতঃ তাহারা তাহাদের অতি প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও সাধারণ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না।

সৃষ্টির কথা ভাবিতে গেলেই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার কথা মনোমধ্যে স্বতঃই আসিয়া পড়ে। নাসদীয় সূক্তেও যাহা, ধর্ম্মপুরাণেও তাহাই,—সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা সর্ব্বশূন্যময়। দর্শন-শাস্ত্রের যৌগিক সৃষ্টি, পরিণাম সৃষ্টি বা বিবর্ত্তবাদ, সর্ব্ববিধ মতেই সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় বা সর্ব্বশূন্যতা পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। "বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি? না, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি?"—এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন অসম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবপর হইলেও তেমনি ইহা দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের মূল পর্য্যন্ত পৌছান যায় না। সৃষ্টি-রহস্যের মূল ভাবনাই হইতেছে, এমন একটী যুগের ভাবনা, যখন বৃক্ষও ছিল না, বীজও ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা মানেই শূন্যময় অবস্থা। তাই বৈদিক ঋষি, দর্শনের পণ্ডিত এবং ধর্ম্মতত্ত্বের গুরু, সকলেই সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনাকালে অভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীনত্ব বা ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিষয়টী বুঝিতে গেলে নাসদীয় সূক্তের ঋষিকেই সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম্মঠাকুরের আত্মপ্রকাশ

শূন্যপুরাণের বর্ণনা অনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে রূপ, রেখা, বর্ণ, চিহ্ন, রবি, শশী, রাত্রি, দিন, জল, স্থল, আকাশ, মেরু, মন্দার, কৈলাস, সৃষ্টি বা চলাচল, কোনও কিছুই ছিল না।

দেবতাও ছিল না, সুতরাং দেউল-দেহারাও ছিল না। ঋষি, তপস্বী, ব্রাহ্মণ, পাহাড়, পর্ব্বত, স্থাবর, জঙ্গম, সুর, নর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আকাশ, পুণ্যস্থল, গঙ্গাজল,—কিছুই ছিল না। মহাশূন্য-মধ্যে একমাত্র 'পরভু' (প্রভু) ছিলেন, তাঁহার সঙ্গী আর কেহ ছিল না। তিনিও ছিলেন শূন্যময়, এবং শূন্যের উপর ভর করিয়া শূন্যমধ্যে ভ্রাম্যমান। এমন অবস্থায় দয়ার সাগরের দয়া উপজাত হইল—বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইল। "আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ॥ দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন। পরভুর সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥" এইরূপে শূন্যমূর্ত্তি প্রভু দিব্য-দেহধারী 'নিরঞ্জন'রূপে সপ্রকাশ হইলেন।

রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'অনিলপুরাণ' নামক গ্রন্থে ধর্ম্মঠাকুরের আত্মদেহের বিভিন্ন অবয়ব নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে।

> বায়ুবন্দ করিলেন কায়ার পরিবন্ধ।
> মূর্ত্তিমান্ হইলা ধম্ম দেখ্যা লাগে ধন্ধ॥
> কাঁকালি জিনিল জেন মাণিক্যের ডাড়ি।
> পাক দিয়া সৃজিল বত্তিস কোঠা নাড়ি॥
> বত্তিস কোঠা নাড়ি হতে না দস কোঠা সার।
> জেন তিন কোঠা নাড়ি বাখানে সংসার॥
> তাএ উদর কোঠা সৃজিল মহা ভাণ্ডার।
> জেন উদর চেষ্টায় মরে নর জগত সংসার॥
> রাজ্যময় পুষ্প জেন জন্মাইলা গাছ।
> সুচের মুখে গাথিলেন জেন ছোট বড় কাষ্ঠ॥
> বেগবন্ধে ঘর সাজে সুজল কামিলা।
> ব্রহ্মা আদি দেব জার বুঝিতে [নারে] লীলা॥
> ধম্মের বচনে পণ্ডিত রাম গায়।
> অনিলপুরাণ গীত সুন শ্যামরায়॥

অনিলপুরাণেও নিরঞ্জন ঠাকুর সঙ্গিহীন।

> নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহি কেহ।
> আমার, স্নান করিতে তীর্থ নাই পূজিতে নাই দেহ॥
> শূন্যের ঘাট শূন্যের পাট শূন্যের সিংহাসন।
> শূন্য আসনে একেলা নিরঞ্জন॥

পুনশ্চ—

স্থির হয় পুরুষ জন সপ্ত শূন্তে নিরঞ্জন
আর কোন দেব নাহিক প্রকাশ।
তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ
নমই একেলা ধর্ম্মরাজ॥ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সৃষ্টি উলূক

ধর্ম্মঠাকুর নিরঞ্জনরূপে স্বদেহ সৃষ্টি করিবার পরই উলূক পক্ষী বা উলূক মুনিকে সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে অনিলপুরাণ, শূন্যপুরাণ বা অন্য কোনও ধর্ম্মপুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না! অনিলপুরাণে আছে,—

শূন্তে ভর করতার এড়িল নিশ্বাস।
নিশ্বাসে জম্মিল উলূক পক্ষরাজ॥
গোসাঁইর নিশ্বাস গেল লক্ষি জোজন।
তরাতরি আইলা উলূক জথা নিরঞ্জন॥
উলূকে দেখিয়া ধর্ম্ম ভয়জুক্ত হল।
মিনতি করিয়া ধর্ম্ম বলিতে লাগিল॥
শুন শুন আরে পক্ষ বলিয়ে তোমারে।
তোমার জনম হইল কেমন প্রকারে॥
কর জোড় করি উলূক করে নিবেদন।
আমার জম্মের কথা শুন দিয়া মন॥
শূন্থ ভরে করতার ছাড়িলে নিশ্বাস।
তোহার নিশ্বাসে জম্মিলাঙ পক্ষিরাজ॥

অনিলপুরাণের ন্যায় শূন্যপুরাণেও ঠাকুরের 'হাই' হইতে 'উল্লুকাই' পক্ষীর জন্ম, এবং ঠাকুর আত্ম ভোলা হইলেও উলূক 'মুনি' (বা 'মুনিবর') স্থির-বুদ্ধি এবং স্মৃতিধর। ঠাকুর এই মুনির পরামর্শ ব্যতীত কোনও কর্ম্ম করেন না। সৃষ্টি-কার্য্যে উলূক মুনিই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা এবং নিরঞ্জন ঠাকুর তাঁহার নিকট যন্ত্র-চালিত পুতুলের ন্যায় ক্রিয়াশীল। উলূক মুনির বুদ্ধি ও কৌশলেই নিরঞ্জন ঠাকুর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা তিনি

সৃষ্টি করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। তৃষ্ণায় আকুল উলূক অনুরোধ করাতেই ঠাকুর তাহাকে মুখের অমৃত দান করিবার জন্য মুখ প্রসারিত করেন; সেই সুযোগে উলূক ওষ্ঠনাড়া দিয়া জল সৃষ্টি করান।

মায়া করি উলূক মুনি ওষ্ঠ নাড়া দিল।
শূন্যের উপরে এক বিন্দু খসিয়া পড়িল ॥
—অনিলপুরাণ।

শূন্যপুরাণের বর্ণনাতেও উলূকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া ঠাকুর যখন বিহ্বল, তখন উলূক মুনিই ঠাকুরকে বুদ্ধি দিল,—"মুখর অমৃত দিআ পরভু রাখহ জীবন।" তখন—"কিছু সংহারিল কিছু শূন্যে হইল থিতি। পরভুর বিন্দুকে জল হইল আচম্বিতি॥" তখন জলের উপরে উভয়েই টলমলায়মান। অনিলপুরাণের মতে উলূকের কৌশলে ঠাকুর নিজেই জলবিম্বে ভর দিয়া টলমলায়মান।

উলূক বোলেন্ত প্রভু শুন মায়াধর।
তিলমাত্র তুমি বিন্দুতে কর ভর॥
উলূক ছাড়িয়া প্রভু বিন্দু ভর কৈল।
বিন্দু কেবল ধর্ম্মের ভর সহিতে নারিল॥
ভাঙ্গিয়া ত জলবিন্দু হৈল ছারখার।
জলাকার পৃথিবী হইল একাকার॥

উলূকের বীর-পক্ষ হইতে পরমহংসের উৎপত্তি, এবং উলূকের পরামর্শেই ঠাকুর 'সৃষ্টির সাজন' করেন[১]। ঠাকুর উলূকের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,—

আক্ষা হইতে বুদ্ধিমান্ পুত্র উল্লুকাই।[২]
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাই॥

তখন উলূক মুনি যথারীতি পরামর্শ দিয়া ঠাকুরকে সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োজিত করিল। এবং উলূকেরই বুদ্ধিক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য চলিতে লাগিল। বাসুকি, বসুমতী, কর্কট, কূর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টি ত এই প্রকারেই হইল, তাহা ছাড়া এই জীব জগতের সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপা মহামায়ার সৃষ্টিও উলূক মুনির কৌশলেই সমাহিত হইল। তারপর পিতা ও কন্যার মিলন দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ত্রিদেবতার সৃষ্টিও উলূক মুনির ঘটকালিতেই সম্ভবপর হইল।

---

১. উলুক বোলন্তি গোসাঞি উপাঅ কারণ। জলের উপরে কর ছিষ্টির সাজন॥ শূ. পু. পৃ. ৯।

২ স্থানান্তরে—'আক্ষা হৈতে বুদ্ধিমান্ তুক্ষি মুনিবর।'—পৃ. ১৭।

কাজ্যের তত্ত কিবা উলূক জানিআ।
দেবী ধর্ম্মে দিল ছামুনি করিআ॥
ধর্ম্মঘট পুণ্য ঘট কৈল আরাধন।
আপুনি উলূক মুনি হইল ব্রাহ্মণ॥
নানা বর্ণে বাদ্য উলূক করিলা ততক্ষণ।
আপুনি হইল মাতাপিতা কৈল কন্যা সমর্পণ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে জয় জয় ধ্বনি।
দেবী ধর্ম্মে দুহে হইল পুষ্পের ছায়নি॥
ধর্ম্মের চরণে পণ্ডিত রামে গায়।
অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্ম্মরায়॥

মহামায়ার গর্ভে ত্রিদেবার জন্ম হইবার পরও উলূক মুনির পরমার্শেই ঠাকুর ঐ তিন দেবের উপর সৃষ্টির ভার অর্পণ করেন। আবার যখন নিরঞ্জনের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ 'ত্রিদেবা' বল্লুকার কূলে উপনীত হইলেন, মহামায়া সহমৃতা হইবার জন্য নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত-দেহা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, তখনও বল্লুকার তীরে বটবৃক্ষে উলূক বসিয়া দাহ-বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

অগৌর চন্দন কাষ্ঠ বোঝাএ বান্ধিয়া।
জতেক দেবতা নিল মস্তকে করিয়া॥
ললাটে চন্দন দিল দেবী সীমন্তে সিন্দূর।
সুবর্ণ চিরুণী দিল কবরী উপর॥
জয় জয় দিয়া দেবী চৌদলে চাপিয়া।
আগে পিছে জান সবে খৈ কড়ি ছাড়িয়া॥
মৃতকল্প হ'য়াছেন ঠাকুর নিরঞ্জন।
নানা শব্দে বাদ্য তোলাল ততক্ষণ॥
সেইরূপ উলূক দূরেতে আসিয়া।
পেচারূপ হইল উলূক আমোয়া পাতিয়া॥[১]
বল্লুকার কূলে আছে এক বটগাছ।
তথিভরে রহিল উলূক পক্ষরাজ॥

১ উলূক কি প্রকৃত পক্ষে পেচা নহে ?

বল্লুকার কূলে সবে উত্তরিল গিয়া।
শহ কাটেন সভে জুকতি করিয়া॥
অনাদ্যি চরণে ভরিয়া একমন।
রামাই পণ্ডিত গান সেবি নিরঞ্জন॥
শহ গুটি কাটিতে বিরোধ দিল পেচা।
অইখানে মর্‌য়াছে বায়ান্ন কুটি রাজা॥
করজোড় করিয়া বোলেন তিন দেবা।
এইখানে কতকাল আছ তুমি পেচা॥[১]
বার সিম্বুল অস্তে গেল আর চৌদ্দ তাল।
এইখানে আছি আমি আউট জুগকাল॥[২]
ধনজন প্রজা মর্‌য়াছে নির্ণ্ণয় নাহি জানি।
আপোড়া পৃথিবী নাই তিল-পরমাণী॥
বুদ্ধি বল পক্ষ রে বুদ্ধের পরকার।
কোন্‌খানে করাব বাপার সত্তকার॥
ব্রহ্মা হও হুতাশন বিষ্ণু হও কাষ্ঠ।
শিবের বাম উরাতে চিরিয়া করাহ সংকার্য্য॥

এই উলূক মুনি কে ?

মহাভারতে এক উলূক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাদের রাজার নামও উলূক। সুতরাং মহাভারতের এই উলূক শব্দ পেচকের প্রতিশব্দ নহে, এ শব্দ মনুষ্যবাচক ও জাতিবাচক। কৌরব কুলের পক্ষ বলিয়া এই রাজা ও তাহার প্রজাগণ যে সাধারণ হিন্দু সমাজে নিন্দিত ও অজ্ঞাত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। নাগবংশীয় একজন রাজার নামও উলূক।

আবার পুরাণাদিতে স্বয়ং ইন্দ্র উলূক নামে পরিচিত; সুতরাং সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে উলূক সম্মানার্হ ও দেবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য এক উলূক বিশ্বামিত্র

---

১ উলূকের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও যুক্তকর।

২ সাড়ে তিন যুগ।

ঋষির পুত্র ; আবার একজন শকুনির পুত্র। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই উলূক নামক কোনও ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি ঋষিত্বে ও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিল।

'যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্যৎকপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে॥'

—ঋগ্বেদ, ১০ম. ১৬৫ সূ, ৪ ঋক্।

এই উলূক যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ, এই কপোত অগ্নি স্থানে উপবেশন করিতেছে। যাঁহার প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার :

মৃত বাক্তির আত্মা স্বর্গে গিয়া রাজা যম ও রাজা বরুণকে দর্শন করে (১০।.৪.৭ ; ১০।১৫৪ ৪,৫)। যম স্বর্গীয় পিতৃগণের সহচর। তাঁহাদের সহিত যম যজ্ঞে আগমন করেন। যম পুণ্যাত্মাদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান। ইনি মৃত ব্যক্তিদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন (১০।১৮.১৩ ; ১০।১৪।৯)।

ঋগ্বেদে উলূক যমরাজের দূত[১]। যমরাজও ধর্ম্মরাজ বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত। সুতরাং রামদাস হনুমানের ন্যায় যমরাজের দূত উলূকও যে আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষে মুনিত্বে ও দেবত্বে উন্নীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? উত্তরকালে আবার সেই নাম কোনও রাজা বা সম্প্রদায়বিশেষের বৈশিষ্ট্য-সূচক নাম হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ঔলূক্য দর্শন বা বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের দর্শন ও ধর্ম্মমত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-সমূহের মধ্যে দুইটী দর্শনে ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে—মীমাংসা ও বৈশেষিক। এই দুইটী দর্শনই অতি প্রাচীন দর্শন—বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই দুইটী দর্শনের মূল সূত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল[২]। চরকের সূত্রস্থানে (১.৩৫-৩৮) বৈশেষিক দর্শনের একটী সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈশেষিকের সেই সূত্রটী আধুনিক সংস্করণে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, চরকের সময়ে (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন বৈশেষিক সূত্রগুলির একবার সংস্কার হইতেছিল। প্রাচীন বৈশেষিক ও প্রাচীন পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক মতে প্রভেদ নাই বলিলেই চলে। উভয় দর্শনই নিরীশ্বরবাদী এবং বেদে বিশ্বাসবান্। প্রাচীন কোনও মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ না থাকায় ইহাই অনুমিত হয় যে, ঐ কালে অন্য কোনও বেদ-বিরোধী সম্প্রদায়ের মত প্রচারিত হয় নাই।

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উলূক-প্রবর্ত্তিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল; তাহাদের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তাহা

---

১ উলূক যমের দূত।

২ S. N. Das Gupta's History of Indian Philosophy Vol. I, পৃ. ২৮০-২৮৫।

এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন ও আধুনিক বঙ্গীয় ধর্ম্মপুরাণসমূহের মতের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মতের মূল সূত্রগুলি পাওয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, এই ধর্ম্মপুরাণসমূহের সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা নাসদীয় সূক্তের সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত কতটুকু অভিন্ন। আমরা নাসদীয় সূক্তের বিশ্লেষণে যে পাঁচটী মূলসূত্র পাইয়াছি, তাহার সবগুলিই ধর্ম্মপুরাণীয় সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত অভিন্ন।

(১) সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ শূন্যময় ও তমসাবৃত ছিল ; 'অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার।

(২) অনাদি পুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই সত্তাবান্—'শূন্যত ভরমন পরভুর শূন্যে কল্লি ভর।'

(৩) তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শূন্যের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া বিশ্বের বীজস্বরূপ তিনি প্রকাশমান হইয়াছেন—

'কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর', 'আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ।'

'চ্যুতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ
নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম।
মায়াপতি ধর্ম্মরায় নির্ম্মাণ করেন কায়
আচম্বিতে জনমিল বিশ্ব॥'

(৪) দেবগণ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন না, তাঁহারা উত্তরকালে সৃষ্ট—

'স্থির হয় পুরুষজন সপ্তশূন্যে নিরঞ্জন
আর (কোন) দেব নাহিক প্রকাশ।
তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ
নমই একেলা ধর্ম্মরাজ॥"

'নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহিক কেহ।
আমার, স্নান করিতে তীর্থ নাই পুজিতে নাই দেহ॥
শূন্যের খাট শূন্যের পাট শূন্যের সিংহাসন।
শূন্য আসনে একেলা নিরঞ্জন॥'

(৫) তাঁহারই দয়ায় বৈদিক কবি অসদ্বস্তুর মধ্যে সদ্বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে।

'দআর আসনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।'
'সান্তি দয়াএ জর্ম্ম হইল তোমার।'
'দয়া হৈল বাপ ধর্ম্মের বিষ্ণু হইল মা।'

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায় একটী অতি প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধুনিক সংস্করণ। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের ঋষিই সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক এবং প্রাচীন বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়েরই দর্শন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ধনুর্ব্বেদ

১। প্রস্তাবনা

এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। মধ্যে মধ্যে দুই শত্রুদলের সহিত দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের যুদ্ধ, যুদ্ধকৌশল না শিখিয়া যুদ্ধ। কিন্তু ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামবাসীরা ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিত। আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি। দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের ভদ্র-ইতর অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিখিতে হইত। শুধু লাঠি-খেলা নয়, গুলতই দিয়া বাঁটুল-ছোঁড়া, তীর-ধনুক, ঢাল-তরোয়াল শিক্ষাও করিতে হইত। ডাকাতের দলপতি সর্দার শিক্ষা দিত। সর্দার ডাকাতের দলপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না; প্রকাশ্যে বাড়ীর দরোয়ান কিংবা গ্রামের দিগার (চৌকিদার) হইয়া থাকিত। বিবাহের সময়ে এই সকল খেলআড় ডাকা হইত, তাহারা বরযাত্রীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদায়ের সময়ে যুদ্ধবিদ্যা দেখাইত। এক এক সর্দার নিজের দেহের নানা স্থান চিরিয়া ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিত। সে সকল স্থানে পরে লম্বা লম্বা অর্বুদ হইয়া রহিত। আমার মনে পড়ে, ধারাল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে নখের আঁচড়ের তুল্য দেখাইত। তাহারা বলিত, ঔষধের গুণে দেহ কাটে না। ইহাও মনে রাখা উচিত, প্রবল বেগে কোপ না মারিলে তরোয়ালে কাটে না। কিন্তু মেলেরিয়ার আক্রমণের পরে দেশের সে শৌর্য-বীর্য চলিয়া গিয়াছে। সে ডাকাত নাই, পূর্বকালের যুদ্ধবিদ্যার স্মৃতিও নাই। দেড় শত বৎসর পূর্বে মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে মল্লক্রীড়ার যে পরিভাষা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান ছিল। কালীপূজা করিয়া ডাকাতি-যাত্রা করিত। কোথায় ধন গুপ্ত আছে, তাহা না বলিলে নারীকে ভয় দেখাইত, কিন্তু কদাপি দেহ স্পর্শ করিত না। নারী যে কালীমায়ের জাতি। আমাদের অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্তু চোর ছিল না। এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নয়, অনেকে মিলিয়া চুরি। তখনকার ডাকাতি এক গ্রামে হইলে পাঁচখানা গ্রামের লোক শুনিতে পাইত। যেখানে সে ভীমরবে ডাক নাই, কটিতে কিঙ্কিনী নাই, মালসাট নাই, সেখানে ডাকাতি নাই। আমার বোধ হয়, বর্গীর হাঙ্গামা হইতে কিছু রক্ষার আশায় লোকে যুদ্ধ

শিখিত, এবং ডাকাতরূপ যোদ্ধা পালন করিত। ওড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া বর্গীরা বর্দ্ধমান আসিত। এই পথে, কত লুটপাট, কত রক্তারক্তি হইয়াছে, ঠেঙ্গাড়া সে কাহিনী ভুলিতে দেয় নাই। ঠেঙ্গাড়া যুদ্ধ করে না, যদি বা করে, কূটযুদ্ধ করে।

বীর হনুমানের যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ, দুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর ২৫।৩০টি অনুচর-সহচর লইয়া এক গ্রামে বাস করে। আগন্তুক বীর অন্যের নিকট পরাজিত কিংবা দলভ্রষ্ট হইয়া গ্রাম-রাজ্য অধিকার করিতে আসে। যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে ভীত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু আয়ুধের মধ্যে নখর ও দন্ত, কদাচিৎ করতল। শত্রুকে ধরিতে না পারিলে দন্ত দ্বারা দংশন করা চলে না। নখর-চালনাতেও শত্রুকে কোলের কাছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মানব বৃক্ষশাখা দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিয়াছিল, সে দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। পরে নখর-পরিবর্তে শাণিত শিলার কিংবা তাম্রের শস্ত্র নির্মাণ করিয়া শত্রুর দেহ বিদারণ, ছেদন, কর্তনে সমর্থ হইল। কিন্তু শত্রু নিকটে না পাইলে শস্ত্র বৃথা। পাষাণ-নিক্ষেপ দ্বারা দূরস্থ শত্রুকে এবং উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ করা সম্ভব। অস্ত্র-নিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পারিলে আরও সুবিধা। কিন্তু বাহুবলে প্রহার, কিংবা বাহুবলে অস্ত্র নিক্ষেপ অপেক্ষা যন্ত্র-দ্বারা অস্ত্র-নিক্ষেপ করিতে পারিলে দূরস্থ শত্রুকেও সহজে বিনাশ করিতে পারা যায়। কোন্ কালের কোন্ মানব ধনু উদ্ভাবনা করিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে, ভেদন, ছেদন, কৃন্তন, প্রতিরোধন প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে ধনুর্যন্ত্র দ্বারা নিক্ষেপ্য অস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। লক্ষ্যভেদের পূর্বে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত। এইরূপে মান্ত্রিক অস্ত্রের উৎপত্তি। এই সকল অস্ত্র দিব্য-অস্ত্র নামে খ্যাত ছিল। যাহারা শত্রু-পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই জানে, যুদ্ধ করা হাসি-খেলা নয়। তখন যে অভীষ্ট দেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্ধ-যাত্রা করিবে, তাহাও ত স্বাভাবিক।

ধনুর্যুদ্ধে শরফলের আকার নানাবিধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিক ভারী করিতে পারা যায় না। ধনুতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আকর্ষণ, যোদ্ধার বাহুবলের পরিমাণ হইয়া দাঁড়ায়। যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, তাহার ধনুর্বলও তত। যুদ্ধকালে যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর-নিক্ষেপ করিতে পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে যন্ত্র দ্বারা ধনুর্গুণাকর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ করা চলে না। কারণ, তাহাতে কালবিলম্ব ঘটে। শর ও পাষাণ নিক্ষেপের একরূপ যন্ত্র ছিল, তাহাকে ক্ষেপণী বলিত। সে যন্ত্র ভারী হইত বলিয়া স্ব-স্থানে স্থির করিয়া রাখা হইত। কদাচিৎ চক্রযুক্ত করিয়া সে যন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও আনা হইত। কিন্তু যে দিন বাহুবলের পরিবর্তে অগ্নিবল, বাস্তবিক অগ্নিচূর্ণযোগে উদ্ভূত বায়ুবল আবিষ্কৃত হইল,

সে দিন হইতে ধনুঃশরের আদরও হ্রাস পাইতে লাগিল। বারুদ ও বন্দুক একদিনে আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহার কর্ম-সামর্থ্যও ঘটে নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর গিয়াছে, বন্দুক ও ধনু দুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্‌টা ভাল, তখন বুঝিবার সময় আসে নাই। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, বারুদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধনুর্বেদ চিরকালের তরে বৃথা হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাত দূরে শর-নিক্ষেপ নয়, বর্ম ও ঢালের কর্ম নয়, ইয়ুরোপের বিগত যুদ্ধে পনর মাইল, বিশ মাইল দূর হইতেও লক্ষ্যের প্রতি গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখন বাহুবল, অগ্নিবল ও বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত। জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, তিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছে। এখন প্রাচীন ধনুর্বেদ পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ধনুর্বেদের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অগ্নিপুরাণোক্ত সংক্ষিপ্ত ধনুর্বেদ ব্যতীত ধনুর্বেদ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুদ্ধশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। প্রায় দুই বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এম্ এ মহাশয়ের এবং সাংখ্য-ন্যায়-দর্শনতীর্থ পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে মহর্ষি বশিষ্ঠ-বিরচিত ধনুর্বেদ-সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিত্র-বিরচিত ধনুর্বেদ, শার্ঙ্গধর ও বৈশম্পায়ন-বিরচিত ধনুর্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের গ্রন্থ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। কোথায় পুথী আছে, শাস্ত্রী মহাশয় জানাইলে অনুসন্ধিৎসুর উপকার হইত। অন্যপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরুতে, বরাহের বৃহৎ-সংহিতায়, অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে যুদ্ধের বহু বর্ণনা আছে। কিন্তু সে সকলে ধনুর্বেদ শাস্ত্র পাওয়া যায় না। বশিষ্ঠ-ধনুর্বেদ-সংহিতার সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই ধনুর্বেদ-সংহিতা-মুদ্রণকার্য্যে আদর্শস্বরূপ একখানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে। অপর কোন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য পাওয়া যায় নাই। উক্ত অনুলিপিতে যেরূপ পাঠাদি আছে, সেরূপ এই মুদ্রিত পুস্তকেও পাঠাদি দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হেতু সকল স্থানের যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাই।" দেখাও যাইতেছে, স্থানে স্থানে পাঠে ভুল আছে। অনুবাদেও যে ভুল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। "বঙ্গবাসী-প্রেস" হইতে প্রকাশিত অগ্নিপুরাণেরও সেই দশা। কিন্তু মোটের উপর এই সংহিতা বুঝিতে কষ্ট নাই। শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আদর্শ পুথী পান নাই। কিন্তু পাঠকের দুঃখ, তিনি যে কোথায় অনুলিপি পাইয়াছিলেন, কি অক্ষরে অনুলিপি, কোন্ সময়ের অনুলিপি, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, কোন্ সালে সংহিতাখানি

ছাপা হইয়াছে, তাহাও জানান নাই। টীকায় বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, ইনি সে গ্রন্থ পাইয়াছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহাও লিখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি এরূপ গ্রন্থের গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। বুঝিতেছি, তাঁহারা অনুবাদে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন, এবং যাহা দিয়াছেন, সে জন্যই তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। এই ধনুর্বেদ না পাইলে শাস্ত্রজ্ঞান হইত না।

২। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ

এখন প্রথমে অগ্নিপুরাণ দেখি। আমরা জানি, অগ্নিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। ধনুর্বেদও সেইরূপ। ইহাতে সমরনীতিও আছে। এই পুরাণ ("বঙ্গবাসী" প্রকাশিত সংস্করণ) হইতে কিছু কিছু সংক্ষেপ করিতেছি।

অগ্নি বলিলেন, (২৪৯—২৫২ অঃ), "ধনুর্বেদ চতুষ্পাদ। ইহাতে রথ, গজ, অশ্ব, পত্তি এবং যোধ, এই পঞ্চবিধ বল কীর্তিত হইয়াছে[১]। ধনুর্বেদের গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। যুদ্ধে শূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু স্বয়ং শিক্ষা করিবে। [কিন্তু ধনুর্বেদ পাইবে না। কারণ, ধনুর্বেদ যজুর্বেদের অন্তর্গত।] দেশস্থ সঙ্করবর্ণ যুদ্ধে রাজার সহায়তা করিবে। অস্ত্র ও শস্ত্র ভেদে আয়ুধ দ্বিবিধ। যুদ্ধও ঋজু ও মায়া ভেদে দ্বিবিধ। আয়ুধ পঞ্চবিধ। যথা,—(১) ক্ষেপণী ও চাপ যন্ত্র দ্বারা যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যন্ত্রমুক্ত; যেমন, ক্ষেপণী দ্বারা পাষাণ, ও চাপ দ্বারা শর। (২) শিলাতোমরাদি (শূলবিশেষ) হস্তমুক্ত। (৩) প্রয়োগের পর যাহাকে প্রতিসংহার করিতে পারা যায়, তাহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে; যেমন, কুন্ত (কোঁচ বা খোঁচ)। (৪) খড়্গাদি অমুক্ত। (৫) হস্তপদ। ধনুর্যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, [কারণ দূর হইতে শত্রুবিনাশ করিতে পারা যায়]। প্রাস (হ্রস্ব কুন্তবিশেষ)-যুদ্ধ মধ্যম, খড়্গ-যুদ্ধ অধম, এবং আয়ুধহীন বাহুযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ (মল্ল-যুদ্ধ) জঘন্য[২]। ধনুর্বেদ-শিক্ষার প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, হস্ত, পদ দৃঢ় করিতে

---

১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে আয়ুধহীন যোদ্ধা, পঞ্চম বল ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (শল্য পর্ব ৬ অঃ) ধনুর্বেদ চতুষ্পাদ এবং দশাঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, তাহার উল্লেখ নাই। ধনুর্বেদের চতুষ্পাদ বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে পাওয়া যাইবে।

২ আয়ুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে। যথা, কৌটিল্যে,—

(ক) জামদগ্ন্যাদি স্থিত (অচল) যন্ত্র; (খ) গদা, শতঘ্নী, ত্রিশূলাদি চল যন্ত্র; (গ) শক্তি, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল, শূল, তোমরাদি হুলমুখ; (ঘ) ধনুঃশর; (ঙ) খড়্গ; (চ) পরশু কুঠারাদি ক্ষুরকল্প; (ছ) পাষাণাদি। অর্থাৎ দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্মভেদে আয়ুধের ভাগ করা হইয়াছে। একটা প্রচলিত ভাগ এই, (১) প্রহরণ, যেমন, খড়্গ; (২) হস্তমুক্ত, যেমন চক্র; (৩) যন্ত্রমুক্ত, যেমন শর। অগ্নিপুরাণের অন্যত্র বাহুকে আয়ুধের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদেও তাই। তদনুসারে আয়ুধ অমুক্ত, মুক্তামুক্ত, মুক্ত; মুক্ত,—হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত।

হইবে[৩]। [কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সকল অবস্থানের পারিভাষিক নাম 'স্থান'।] যথা,—জানুদ্বয় স্তব্ধ করিয়া এক বিতস্তি ভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে 'সমপাদ স্থান'। তিন বিতস্তির মধ্যে (পা ফাঁক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে 'বৈশাখ'। এই স্থানে জানুদ্বয় তোরণাকার করিলে 'মণ্ডল'। এইরূপ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, বিকট, সম্পুট, স্বস্তিক, এই আট প্রকার[৪]। ইহার পর ধনুর্গ্রহণ, জ্যা-আরোপণ, শরযোজন, ইত্যাদি। "চতুর্হস্ত ধনু শ্রেষ্ঠ, সার্দ্ধত্রয় মধ্যম, এবং ত্রি-হস্ত কনিষ্ঠ। এই ধনু পদাতির যোগ্য। ধনু নাভিদেশে এবং তূণ নিতম্বদেশে স্থাপন করিবে। দ্বাদশমুষ্টি (৩৬ইঞ্চি) দীর্ঘ শর শ্রেষ্ঠ, একাদশমুষ্টি মধ্যম ও দশমুষ্টি কনিষ্ঠ।" ইহার পর কেমন করিয়া শর অভ্যাস ও লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। "জিত-হস্ত, জিত-মতি, এবং দৃষ্টি ও লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে বাহনে আরোহণ করিয়া শর অভ্যাস করিবে।"

ধনুঃশর গেল। এখন অন্য অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। "পাশের পরিমাণ দশ হাত। তাহার দুই মুখে গোল পিণ্ড বাঁধা থাকিবে। কার্পাস, মুঞ্জ, ভঙ্গ (ভাং গাছের অংশু), স্নায়ু, অর্ক (আকন্দ গাছের অংশু), কিংবা অন্য সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা পাশের গুণ নির্ম্মাণ করিবে[৫]। পাশের স্থান কক্ষ দেশ। পাশ কুণ্ডলাকারে মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া চর্ম্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ

যুক্তিকল্পতরুতে অস্ত্র দ্বিবিধ। খড়্গাদি নিমার্য্য অস্ত্র, আর দাহনাদি (জল, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শব্দাদি, তপ্ত তৈলাদি) মায়িক অস্ত্র, অর্থাৎ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। শুক্রনীতিসারে, মন্ত্র, যন্ত্র ও অগ্নিদ্বারা যাহা নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহা অস্ত্র; তদ্ভিন্ন খড়্গা, কুন্তাদি শস্ত্র। আর এক ভাগ,—দিব্য, আসুর ও মানব। অস্ত্রের আর এক ভাগ,—মান্ত্রিক ও যান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্র উত্তম, নালিকাস্ত্র মধ্যম ও শস্ত্র কনিষ্ঠ বাহুযুদ্ধ ততোঽধম। শুক্রের নালিকাস্ত্র বন্দুক, অগ্নিদ্বারা অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

৩ তু° মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্ম-মঙ্গলে,—"প্রথমে করিল শিক্ষা সামীর হরণ"—সামীর—করতলের সংজ্ঞা লাপ করিতে শিখিল। করতলে আঘাত দ্বারা 'কড়া' পড়াইল।

৪ অমরকোষে "স্থান" পাঁচ প্রকার,—সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়। ইহাদের সহিত "বৈষ্ণব" যোগ করিয়া "স্থান" ষড়্বিধ। বাশিষ্ঠ ধনুর্ব্বেদ মতে অষ্টবিধ,—সমপাদ, বিশাখ, অসমপাদ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, দর্দ্দুর-ক্রম, গরুড়-ক্রম, পদ্মাসন। অগ্নিপুরাণের কয়েকটির নামান্তর। বৈষ্ণব=গরুড়, পদ্মাসন=স্বস্তিক মনে করা হইয়াছে।

৫ "গুণকার্পাস মুঞ্জানাং ভঙ্গস্নায়্বর্কবর্ম্মিণাম্"—ভঙ্গ, ভঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। "বর্ম্মিণাম্" পাঠ পরিবর্ত্তে "চর্ম্মিণাম্" পাঠও আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বোধ হয়। এই শ্লোকার্দ্ধ বাশিষ্ঠ ধনুর্ব্বেদ-সংহিতার অযথা স্থানে বসিয়াছে। শুক্রনীতিসারে. পাশের বহির্মুখে ত্রিহস্ত ও ত্রিশিখ দণ্ড বদ্ধ, এবং রজ্জু, লৌহনির্ম্মিত। পাশের মুখ সর্পাকৃতি হইলে নাগপাশ।

করিবে। বল্গিত, প্লুত, কিংবা প্রব্রজিত, শত্রু যে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তদনুরূপ বিধিতে পাশ প্রয়োগ করিবে। খড়্গ বাম কটিতে বিলম্বিত করিয়া বদ্ধ করিবে। শল্য সাত হাত দীর্ঘ। ইহার অয়োমুখ বিস্তারে ষড়ঙ্গুল। বর্ম নানাবিধ হইয়া থাকে। লগুড় গ্রহণপূর্বক সবলে লৌহবর্মোপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত।"

এখন অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ ও কর্ম। "খড়্গ ও চর্মধারণ বত্রিশ প্রকার, পাশধারণ এগার প্রকার, চক্রকর্ম সাত প্রকার, শূলকর্ম পাঁচ প্রকার, তোমরকর্ম ছয় প্রকার, গদাকর্ম বার প্রকার, পরশুকর্ম ছয় প্রকার, মুদ্গরকর্ম পাঁচ প্রকার, ভিন্দিপাল ও লগুড়কর্ম চারি প্রকার, বজ্র ও পট্টিশকর্ম চারি প্রকার, কৃপাণকর্ম সাত প্রকার। ত্রাসন, রক্ষণ, ঘাত, বলোদ্ধরণ এবং আয়ত (?) এই কয়টি ক্ষেপণীকর্ম ও যন্ত্রকর্ম। গদাকর্ম ও নিযুদ্ধকর্ম বত্রিশ প্রকার। বাহুযুদ্ধ চৌত্রিশ প্রকার[৬]"। এক এক গজে দুই জন অঙ্কুশধারী, দুই জন ধনুর্ধারী ও দুই জন খড়্গধারী আরোহণ করিবে। রথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অশ্ব, এবং অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধানুষ্ক, এবং ধানুষ্কের রক্ষার নিমিত্ত চর্মী নিযুক্ত করিবে[৭]। শস্ত্রকে স্ব স্ব মন্ত্রে, এবং ত্রৈলোক্যমোহন শাস্ত্র অর্চনা করিয়া যিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।"

৬ এই সকল কর্মের পরিভাষা পাইতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যার অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। শুক্রনীতিসারে নিযুদ্ধ অষ্টপ্রকার, যথা—(১) বাঃ হস্ত দ্বারা কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকেরা কেশ কর্তন করিত না), (২) বলপূর্বক ভূমিতে নিষ্পেষণ, (৩) মস্তকে পদাঘাত, (৪) জানু দ্বারা উদর পীড়ন, (৫) মুষ্টিকে শ্রীফলের আকার করিয়া কপোলে দৃঢ় তাড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফোণি দ্বারা ভূতলে পাতন, (৭) সর্বপ্রকারে করতল দ্বারা প্রহার, (৮) শত্রুর রন্ধ্র অন্বেষণ নিমিত্ত ছলপূর্বক ভ্রমণ। বাহুযুদ্ধে, সন্ধি ও মর্মস্থানে বর্ষণ, বন্ধন ও ঘাতন। মহাভারতে খড়্গসঞ্চারণ দ্রোণপর্বে (১৯১ অঃ) একুশ প্রকার, এবং কর্ণপর্বে (২৫ অঃ) চৌদ্দ প্রকার বর্ণিত আছে। রামায়ণে (লঙ্কা, ৪০) নিযুদ্ধ বর্ণিত আছে। হরিবংশেও কয়েকটি আছে। অসিযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ শিক্ষার্থী দেখিতে পারেন।

৭ এখানে পদাতির দুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী, গজ অশ্ব রথ মিলিয়া পাঁচ। সেনাভাগের হ্রস্বতম ভাগ, পত্তি। এক পত্তিতে ১ গজ, ১ রথ, ৩ অশ্ব, ৫ পদাতি = ১০। অশ্ব ও পদাতি, গজ ও রথের "পাদরক্ষক"। অমরকোষে, ৩ পত্তি = ১ সেনামুখ, ৩ সেনামুখ = ১ গুল্ম, ৩ গুল্ম = ১ গণ, ৩ গণ = ১ বাহিনী, ৩ বাহিনী = ১ পৃতনা, ৩ পৃতনা = ১ চমূ, ৩ চমূ = ১ অনীকিনী। ১০ অনীকিনী = ১ অক্ষৌহিণী। এক অনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ ২১৮৭, অশ্ব ৩ × ২১৮৭ = ৬৫৬১, পদাতি ৫ × ২১৮৭ = ১০৯৩৫। মহাভারতে রথের প্রাধান্য, পরে গজের প্রাধান্য হইয়াছিল, শেষে গজের হ্রাস পায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ, এক রথ প্রতি শত অশ্ব, এক অশ্ব প্রতি দশ ধনুর্দ্ধর, এক ধনুর্দ্ধর প্রতি দশ চর্মী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয়, উত্তরভারতে গজ সুলভ ছিল না বলিয়া এই বিধি করিতে হইয়াছিল

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ এইখানেই শেষ। কিন্তু আর এক অধ্যায়ে (২৪৫), রাজচিহ্ন বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধনুর্বাণ ও খড়্গ আসিয়াছে। অগ্নি বলিলেন, "ধনুর্দ্রব্য তিনটি—লোহ, শৃঙ্গ, এবং দারু। সুবর্ণ, রজত, তাম্র এবং কৃষ্ণায়স (ইস্পাত)-নির্মিত ধনু, লোহধনু। মহিষ, শরভ ও রোহিষ মৃগের শৃঙ্গ-নির্মিত ধনু শার্ঙ্গধনু। চন্দন, বেতস, সাল, ধম্বন্ ও ককুভ-নির্মিত ধনু, দারুধনু। কিন্তু শরৎকালের গৃহীত বংশনির্মিত ধনু সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ দারুধনুর প্রমাণ চারি হাত।" এই সকল দ্রব্য বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে প্রায় অবিকল পাওয়া যাইবে। "জ্যা-দ্রব্য তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বক্ (চর্ম)। বাণের কাণ্ড লৌহের, বাঁশের, শরের, কিংবা অ-শরের। শর ঋজু, হেমবর্ণ, স্নায়ু-শ্লিষ্ট (ফাটা নয়), সু-পুঙ্খ-যুক্ত ও তৈলধৌত সুবাণযুক্ত হইবে [৮]। রাজা এক বৎসরের কর দ্বারা পতাকা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন [৯]।" ইহার পর খড়্গ-লক্ষণ।

৩। সমরনীতি

অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুধের কথা বলা হইল। এখন সমরনীতির অল্প স্বল্প দেখা যাউক। পুষ্কর বলিলেন (২২৮ অঃ), "শুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদির চেষ্টিত) ও শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে রাজা শত্রুপুরে গমন করিবেন। বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তিবহুল সেনা, হেমন্তে ও শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা, এবং বসন্তে ও শরৎমুখে চতুরঙ্গ সেনা নিয়োগ করিবেন। পদাতি-বহুল সেনা সর্ব্বদা শত্রুজয় করে [১০]।"

অন্যত্র (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, "মৌল, ভৃত, শ্রেণী, সুহৃৎ, দ্বিষৎ ও আটবিক, এই ষড়্‌বিধ বল ব্যূহিত করিয়া রাজা দেবতা-অর্চনাপূর্বক রিপুর উদ্দেশে যাত্রা করিবেন [১১]।

---

৮ কাণ্ড, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈলধৌত—তেল-মাখানা, নইলে মর্চিা পড়িবে। পূর্বকালে যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র তৈলধৌত করা হইত। রামায়ণে ও মৎস্যপুরাণে বহু স্থানে উল্লেখ আছে।

৯ শুক্রের মতে রাজস্বের চতুর্থাংশ সেনা বিভাগে ব্যয় হইবে। অগ্নিপুরাণের খড়্গ-লক্ষণে লিখিত আছে, "বঙ্গের খড়্গ তীক্ষ্ণ ও ছেদসহ, অঙ্গদেশের তীক্ষ্ণ।" খড়্গ-লক্ষণ, বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় আছে। ভোজরাজ যুক্তিকল্পতরুতে সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন।

১০ কৌটিল্যে গজ, অশ্ব, রথের যুদ্ধ-শিক্ষা বর্ণিত আছে। মনুর মতে অগ্রহায়ণ কিংবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ইহার টীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন, পররাষ্ট্রে অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক শস্য এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বসন্ত শস্য পাওয়া যাইবে। কামন্দকের মতের সহিত অগ্নিপুরাণের ঐক্য আছে। রামায়ণের ও মহাভারতের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল।

১১ মৌল—সদ্বংশজাত পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত। ভৃত—বেতন-প্রাপ্ত। শ্রেণী—যুদ্ধকর্মপ্রিয়, কিন্তু স্বাধীন। সুহৃৎ—মিত্র রাজার। দ্বিষৎ—শত্রু রাজার সেনা হইতে পলায়িত। আটবিক—বন্য অশিক্ষিত। ইহারা

নায়ক (বলাধ্যক্ষ) প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। মধ্যে কোষ, স্বামী, কলত্র[১২] ও ফল্গুবল (অসার সৈন্য) গমন করিবেন। দুই পার্শ্বে অশ্ববল, অশ্বের পার্শ্বে রথ, রথের পার্শ্বে গজ, গজের পার্শ্বে আটবিক, পশ্চাৎ সেনাপতি[১৩]। সম্মুখে ভয় থাকিলে মকর ব্যূহ, পশ্চাতে ভয় থাকিলে শকট, পার্শ্বে ভয় থাকিলে বজ্র, এবং সর্বদিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবেন[১৪]। সুবিধা বুঝিলে প্রকাশ যুদ্ধ করিবেন,

---

পূর্ব পূর্ব বলবান্। বহুকাল হইতে এই ষড়্বিধ বল গণনা প্রসিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যে ও কামন্দকে প্রয়োগ বর্ণিত আছে। মনুসংহিতায় (৭।৫৪, ১৮৫) এই ষড়্বল। শুক্রনীতিতে বল বিভাগ ভিন্ন। যথা,—
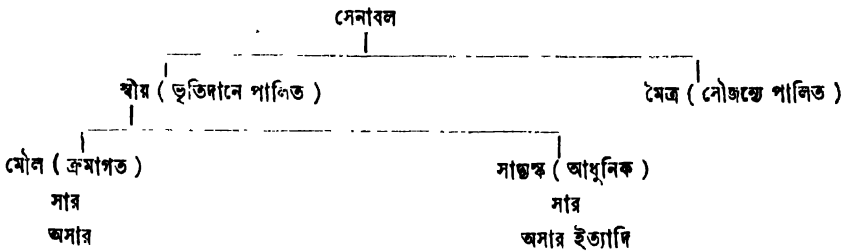
রাজার গুল্মীভূত সেনা ব্যতীত অগুল্ম সেনা থাকিত। ইহাদের নিজের সেনাপতি থাকিত। ইহারা উপরের "শ্রেণী"। এতদ্‌ব্যতীত, কিরাতাদি স্বাধীন আরণ্যক। শেষে রিপু-সেনা হইতে উৎসৃষ্ট সেনা। ইহারা দ্বিষৎ সেনা। অতএব সেই ষড়্বল, কেবল নামান্তর।

১২ শুক্রনীতিসারেও প্রায় এই শ্লোক (৪।৭)। যুদ্ধশিবিরে রাণীরা যাইতেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেনাদিগের নিমিত্ত বেশ্যা গিয়াছিল। মদ্যের ত কথাই নাই। নারী, সেনাদিগের অন্ন পাক করিত।

১৩ কৌটিল্যে চতুরঙ্গ বলের প্রত্যেকের দশ সেনার উপরে এক পদিক, দশ পদিকের উপর এক সেনাপতি, দশ সেনাপতির উপরে এক নায়ক। অর্থাৎ শত সেনা সেনাপতির, সহস্র সেনা নায়কের অধীন থাকিত। সেনাপতি শতিক, নায়ক সাহস্রিক। ইহারা হাজারী, এখন উপাধি হাজারা। এখানে একটা কথা মনে পড়িতেছে। সৎরঞ্চ খেলা চতুরঙ্গ বলে যুদ্ধ। কিন্তু এই খেলার বর্ত্তমান ব্যূহে রাজার পার্শ্বে উল্লিখিত বিন্যাস নয়। বোধ হয়, প্রাচীন খেলা পরিবর্তিত হইয়াছে। যেটা রথ, সেটা ফার্সীতে পড়া হইয়াছিল 'রোখ'। 'রোখ' ইংরেজীতে হইল 'রূক'। আশ্চর্য্য ভ্রম বটে, কোথায় রথ, আর কোথায় নৌকা! ইংরেজীতে "কাসেল" বলিয়া বরং রথের সাদৃশ্য রাখিয়াছে। পরে কিন্তু সংস্কৃতেও রথ স্থানে নৌকা হইয়াছিল এবং বোধ হয়, নদীনালার দেশে যেমন পূর্ববঙ্গে ইহার উৎপত্তি। জিজ্ঞাসু পাঠক রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে "চতুরঙ্গম্ অক্ষক্রীড়ায়াং ব্যাসযুধিষ্ঠিরসংবাদং" দেখিতে পারেন।

১৪ এইরূপ মনু (৭।১৮৭), কামন্দক, ইত্যাদি। যে দিকে ভয়, সে দিকে সেনা বিস্তার করিবে, অগ্নিপুরাণের এই অংশ প্রায় অবিকল কামন্দকে আছে।

এবং বিপর্যয়ে কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন [১৫]।” ইত্যাদি। এখানে হস্তিকর্ম, রথকর্ম, অশ্ব-কর্ম, পত্তিকর্ম ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ ব্যূহ বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক অধ্যায় (২৩৬) হইতে সংক্ষেপ করিতেছি। পুষ্কর বলিলেন, “যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন, বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিবেন। বহুর সহিত অল্পের যুদ্ধে সূচীমুখ অনীক (বল বিন্যাস) কল্পনা করিবেন। ব্যূহ দ্বিবিধ,—প্রাণীর অঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ। যথা, গরুড়, মকর, শ্যেন, চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্বতোভদ্র, সূচী। সকল প্রকার ব্যূহে পাঁচ স্থানে সৈন্য কল্পনা,—দুই পক্ষ (বা পার্শ্ব), দুই অনুপক্ষ (বা কক্ষ), এবং পঞ্চম উরঃ [১৬]। যদি একের দ্বারা না হয়, দুই ভাগে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের রক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন করিবে। রাজা স্বয়ং ব্যূহ কল্পনা ও যুদ্ধ করিবেন না। সৈন্যের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দূরে থাকিবেন। গজের পাদ রক্ষার্থ চারি রথ, রথ রক্ষার্থ চারি অশ্ব, অশ্ব রক্ষার্থ চারি ধম্বী, এবং ধন্বীরক্ষার্থ চর্মী নিয়োগ করিবেন। অগ্রে চর্মী, পশ্চাৎ ধন্বী, পশ্চাৎ অশ্ব, পশ্চাৎ রথ, পশ্চাৎ গজসৈন্য স্থাপন করিবেন। শূরদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে পশ্চাতে। রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আয়ুধ আনয়ন ও গজের প্রতিযুদ্ধ ও জলদানাদি, পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্ব-সৈন্যের রক্ষা ও সংহতের ভেদন, চর্মিকর্ম। যুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দূরে অপসারণ ও গমন, ধন্বিকর্ম। রিপুসৈন্যের ত্রাসন, রথকর্ম। সংহতের ভেদন, এবং ভিন্নের সংহতি, এবং প্রাকার, তোরণ, অট্টাল (প্রাকারের উপরিস্থ উচ্চ গৃহ, এখানে সেনা লুক্কায়িত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিত) ও দ্রুম-ভঙ্গ, গজকর্ম। পত্তির ভূমি বিষম, রথ ও অশ্বের ভূমি সম, এবং গজের ভূমি সকর্দম। এইরূপে ব্যূহ রচনা করিয়া দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া অনুকূল শুক্র, শনি, দিক্‌পাল ও মৃদু মারুতে, নাম গোত্র, (নাম ও সংজ্ঞা) ও অবদান নির্দেশপূর্বক যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। যাহাতে শত্রুগণের মোহ জন্মে, এরূপ ধূপ ও পতাকা ও বাদিত্রের ভয়াবহ সম্ভার করিবেন [১৭]”।

১৫ কূট যুদ্ধ—শত্রু যখন অসাবধান কিংবা অসমর্থ, তখন তাহাকে আক্রমণ। নিদ্রিত বা পরিশ্রান্ত শত্রুবধ ন্যায়যুদ্ধ নয়। মহাভারতে কূট যুদ্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছিল। কৌটিল্য কূট যুদ্ধ-নীতির প্রদর্শক। অগ্নিপুরাণ তাহাতেও কামন্দক অনুসরণ করিয়াছেন। মনুও শত্রু নিপাত নিমিত্ত তাহার অন্নজলে বিষ মিশ্রিত করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বিষ-দিগ্ধ বাণ-প্রয়োগ নিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয় দুই কালের দুই মনু।

১৬ এই পাঁচ প্রধান। উরসের সম্মুখে মূর্ধা, পশ্চাতে জঘন। রামচন্দ্র সপ্ত স্থানে বানর সেনা সন্নিবেশ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপ কামন্দকে। বোধ হয় নরাকার সাদৃশ্যে সপ্ত কল্পনা।

১৭ চতুরঙ্গের যোগ্য যুদ্ধভূমি ও প্রত্যেকের কর্ম কৌটিল্যে ও কামন্দকে বিস্তারিত আছে। পদাতির মধ্যে “বিষ্টি” বা বেঠি (বেগার) থাকিত। তাহারা পথ ঘাট বাঁধা, কূপ খনন, অশ্বাদির ঘাস সংগ্রহ করিত।

বহু পূর্বকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুর্বিধ উপায়ের দ্বারা রাজা রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাহ্যকোপ প্রশমনের এই চারি উপায়। সাধুজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি সপৌরুষে দান, পরস্পর ভীত ও সংহতের প্রতি ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে অদম্যকে দণ্ড প্রয়োগ, নীতিজ্ঞদিগের মত। বহিঃশত্রু শাসন করিতেও এই চারি উপায়। শেষ উপায় যুদ্ধরূপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্তু 'মায়া', 'উপেক্ষা' ও 'ইন্দ্রজাল' অন্য তিন উপায় গণ্য হইয়াছিল। শত্রু দুবল, অনিষ্ট করিতে পারিবে না, বুঝিলে উপেক্ষা। আর রণ-স্থলে শত্রুকে উদ্বেজিত করিবার নিমিত্ত মায়া ও ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ-জয়ের আনুষঙ্গিক দুই উপায় হইয়াছিল। কৌটিল্য ও কামন্দক এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অগ্নিপুরাণও ছাড়েন নাই। পুষ্কর বলিলেন (২৩৪ অঃ), "অধুনা

মনুও (৭।১৯২) একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন। ব্যূহ-কল্পনায় অগ্নিপুরাণ, কামন্দক আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু গজাশ্বাদির পৃথক পৃথক ব্যূহ ছাড়িয়া গিয়াছেন। সংগ্রামনীতিতে কামন্দক কৌটিল্যের শিষ্য। জীবানন্দ কৃত কামন্দকের সংস্করণ অশুদ্ধ। এই হেতু কৌটিল্য হইতে লিখিতেছি। "পদাতির শ্রেণীতে পরস্পর ব্যবধান থাকিবে ১ 'শম' (১৪ আঙ্গুল বা ১০ ইঞ্চি), অশ্বের শ্রেণীতে ৩ শম (৩০ ইঞ্চি), রথশ্রেণীতে ৪ শম (৪০ ইঞ্চি), গজ-শ্রেণীতে ৮ বা ১২ শম। চতুরঙ্গ বলের যাহাতে প্রত্যেকের ঘোরা ফেরা করিতে সম্বাধ না হয়, তাহা অবশ্য দেখিতে হইবে। বলগুলি মিশাইয়া গেলে সঙ্কুলাবহ সঙ্কর ঘটিবে। এক ধম্বীর এক ধনু পশ্চাতে অপর ধম্বী, এক অশ্বের তিন ধনু পশ্চাতে অপর অশ্ব, এক রথ বা গজের পাঁচ ধনু পশ্চাতে অপর রথ বা গজ। পক্ষ কক্ষ ও উরঃ স্থানের অনীক (সেনাদল) পৃথক রাখিতে তাহাদের মধ্যে পাঁচ ধনু অন্তর থাকিবে। এক অশ্বের প্রতি-যোদ্ধা তিন পদাতি, এক রথ কিবাং এক গজের প্রতি-যোদ্ধা পাঁচ অশ্ব, কিংবা পনর পদাতি থাকিবে; এবং ইহাদের এত এত জন পাদরক্ষক থাকিবে। প্রতি অনীকে তিনটি রথ লইয়া নয়টী রথ ব্যূহের উরঃস্থানে ও প্রত্যেক পক্ষে ও কক্ষে থাকিবে। অতএব রথব্যূহে ৫×৯=৪৫ রথ, ৫×৪৫=২২৫ অশ্ব, ২২৫×৩=৬৭৫ পদাতি; এবংএত জন পাদরক্ষক থাকিবে। এইরূপ গজব্যূহ। অশ্ব, গজ, রথ একত্রে যে ব্যূহ, তাহা মিশ্র"। ব্যূহ বিকল্পের সংখ্যা ছিল না। মহাভারতে ক্রৌঞ্চ (কোঁচ বক), গরুড়, চক্র বা মণ্ডল, বজ্র, শকট, অর্দ্ধচন্দ্র, মকর, সর্ব্বতোভদ্র, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রথম দিন যুদ্ধের পূর্বে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, দেখ, আমাদের সৈন্য অল্প। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সৈন্য অল্প হইলে শূচী-ব্যূহ করিবে। অর্জুন কিন্তু অচল দুর্জয় বজ্র-ব্যূহ রচনা করিলেন। এই ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, কারণ চারিদিকেই মুখ ইত্যাদি। এই সকল নাম চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে। মহাভারতে দেখিতেছি, বৃহস্পতি রাজনীতি ও সমরনীতি শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন। কৌটিল্য ব্যূহের চারি প্রকৃতি (প্রকার) ধরিয়াছেন। যথা,—দণ্ড, ভোগ (সর্প), মণ্ডল, ও অসংহত (পৃথক পৃথক)। দণ্ড-ব্যূহে সেনা পাশে পাশে দাঁড়াইবে; এই সেনা 'তির্য্যক্‌বৃত্তি' বাম কিংবা দক্ষিণে চলিতে পারিবে। ভোগ-ব্যূহে সেনা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাঁড়াইবে। এই সেনা 'অন্বাবৃত্তি' পশ্চাৎ হইতে অগ্রে সর্পাকারে চলিতে পারিবে। মণ্ডল-ব্যূহে চক্রাকারে দাঁড়াইবে, এবং চক্রাকারে চলিতে পারিবে। অসংহত ব্যূহে সেনা পৃথক পৃথক চলিতে পারিবে। এই চারির অমিশ্র ও মিশ্রভেদে সর্ব্ব প্রকার ব্যূহের উৎপত্তি। শুক্রনীতিসারে আট প্রকার ব্যূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

মায়া উপায় বলিব। বিবিধ মিথ্যা উৎপাতের (প্রকৃতির বিপরীত ব্যাপার) দ্বারা শত্রুর উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। বিপুল উল্কা করিয়া স্থূল পক্ষীর পুচ্ছে বাঁধিয়া রাত্রি-কালে শত্রু শিবিরে ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে উল্কাপাত দেখাইবে। বিবিধ কুহক (ইন্দ্রজাল) দ্বারা শত্রুর উদ্বেজন করিবে। রাজা ইন্দ্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ দেবতারা চতুরঙ্গ বলে আসিয়াছেন। প্রদর্শনান্তে রিপুর মস্তকে রক্ত-বৃষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে রিপুর ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিবেন।" কামন্দক লিখিয়াছেন, "সুষির দেবতা-প্রতিমা ও স্তম্ভ মধ্যে নর লুক্কায়িত হইয়া এবং রাত্রিকালে পুরুষ স্ত্রী-বস্ত্র পরিয়া অদ্ভুত দর্শন করাইবে; বেতাল, পিশাচ ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি মানুষী মায়া; ইচ্ছানুসারে নানারূপ-ধারণ, অস্ত্র-শস্ত্র-পাষাণ-মেঘ-অন্ধকার-বৃষ্টি-অগ্নি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাটিত-ভিন্ন-সৈন্য-প্রদর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রজাল দ্বারা শত্রুর ভয়ের নিমিত্ত উপকল্পনা করিবে।"

এই খানে অগ্নিপুরাণের ধনুর্বেদ ও সংগ্রাম-নীতি শেষ করি। ইহাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) ধনুর্বেদে কেবল ধনুর্বিদ্যা থাকিত না। প্রাচীনকালের জ্ঞাত যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা থাকিত। (২) এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণে বন্দুক কামানের নামও নাই। সে কালে জানা থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম অবশ্য থাকিত। ধূপ বা খ-ধূপ (হাউই) জানা ছিল। ভট্টিকাব্যেও (৩।৫) ইহার উল্লেখ আছে [১৮]। এই খ-ধূপ, বন্দুকের পূর্বজ।

অগ্নিপুরাণ সংহিতাগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত পরা ও অপরা বিদ্যা, নানাকালে রচিত নানা-শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের দ্বারা ধনুর্বেদের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূর্ব সীমা এক নয়, পর সীমা আরও অনির্দেশ্য। আরও এক অসুবিধা আছে। অগ্নিপুরাণে ভাগবতপুরাণ মতে, ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে ১৫০০০, এবং বঙ্গবাসী-মুদ্রিত অগ্নিপুরাণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০০ শ্লোক থাকিবার কথা। কিন্তু এই সংস্করণে বোধ হয়, ১২০০০ শ্লোক আছে। এবং আশ্চর্য এই, এই সংস্করণের ২৭২ অধ্যায়েও অগ্নিপুরাণের এই শ্লোক-সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব প্রাচীন পুরাণের ৩০০০ শ্লোক বহুকালপূর্বে লুপ্ত হইয়াছে।

সংগ্রাম-নীতি ও ধনুর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, প্রথমটির বক্তা শ্রীরাম ও পুষ্কর। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কখন্ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখাইয়াছিলেন, এবং পুষ্করই বা কে বলিতে পারি না।

১৮ উল্কাঃ প্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্ ধ্বজান্ ববন্ধুর্মুমুচুঃ খধূপান্—মুমুচুঃ খধূপান্ আকাশে ঘটিকাদিভির্ধূপান্ মুমুচুঃ প্রমুক্তবন্তঃ—জয়মঙ্গল টীকা। হাউইর নল-কে ঘটিকা বলা হইয়াছে।

কিন্তু দেখিতেছি, শ্রীরাম কামন্দকের সংক্ষেপ করিয়াছেন। পুষ্করও মায়া ও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনে কামন্দককে অনুসরণ করিয়াছেন। কামন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিল্যের ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কামন্দকের কাল প্রথম খ্রীষ্ট-শতাব্দ ধরা যাইতে পারে। অতএব অগ্নিপুরাণের সংগ্রাম-নীতি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

ধনুর্বেদ অগ্নির উক্তি, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ধনু, জ্যা, শরকাণ্ড, যদি বা কিছু আছে, শরের ফল সম্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্ম ও তৎকালে প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের লক্ষণ নাই। আছে কেবল খড়্গের, এবং তাহা এক পৃথক অধ্যায়ে। যে তিন সহস্র শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে, বোধ হয়, সেই লুপ্ত শ্লোকের কিয়দংশে এই সকল বিষয় ছিল। নানাকারণে মনে হয়, মূল অগ্নিপুরাণ পঞ্চম খ্রীষ্ট-শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।

কোন্ কালে বর্ত্তমান অগ্নিপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সে কালে কুব্জিকা তন্ত্র, ত্বরিতা তন্ত্র, অন্যান্য তান্ত্রিক বিদ্যা, যুদ্ধ জয়ার্ণব (১২৪ অঃ) ও পঞ্চস্বরা শাস্ত্রের প্রতি লোকের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে শ্মশানবাসিনী চামুণ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুঃষষ্টি যোগিনী সন্তুষ্ট করা হইত। ত্রৈলোক্যবিজয় বিদ্যা, সংগ্রামবিজয় বিদ্যা প্রভৃতির ফলদাতৃত্বে এত বিশ্বাস ছিল যে, আশ্চর্য হইতে হয়। শাকুন ও সুনিমিত্ত-বিচার বহুপূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি। জয় কি পরাজয়, কত অর্থ ও লোক-ক্ষয়, নিজের দুর্গতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনা যেখানে থাকে, সেখানে চিন্তাকুলিত চিত্তে বাহিরের সুলক্ষণ, সিদ্ধির আশা জাগাইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রত্যয় না হারাইলে কেহ দৈববলকে সিদ্ধির সহায় মনে করে না। কোন একটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না ; এটা ওটা সেটা, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়া দিগ্‌বিজয়ে যাত্রায় দৃঢ়সংকল্পের অভাব মনে হয়। এ যে বাংলা পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ! মহাভারত-রামায়ণের সময়ে কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গতি ঘটে নাই। মৎস্যপুরাণেও পৌরুষের প্রশংসা। কৌটিল্য লিখিয়াছেন, "যে নির্বোধ সর্বদা নক্ষত্র দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ দূরে চলিয়া যায়, অর্থই অর্থের নক্ষত্র, তারকা কি করিবে?" ভীরুর নিকট ব্যূহ-রচনায় বুদ্ধির তাৎপর্য প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা সংহত হওয়াও অনিবার্য। তখন সংহত ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইত। গজের প্রতি অটল বিশ্বাস মহাভারতে ছিল না, কৌটিল্যেও নাই। কামন্দক তাঁহার নীতিসারের শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "মদসত্ত্বগুণযুক্ত একটি গজরাজ শত্রু-অনীককে বধ করিতে পারে। নৃপতির বিজয় গজের উপরই নিবদ্ধ, অতএব তিনি সর্বদা গজবল অধিক রাখিবেন।" বোধ হয়, কামন্দকের দেশ গজের দেশ ছিল। কিন্তু গজরাজ যত শিক্ষিত

বা পদাতির দ্বারা রক্ষিত হউক, পশুমাত্র। সেনা-নায়ক গজারোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শত্রুর সাক্ষাৎ হইয়া পড়েন। গজে গজে, রথে রথে, অশ্বে অশ্বে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল। কিন্তু বিদেশীর সহিত যুদ্ধে সে নীতি নিষ্ফল। তা ছাড়া গজ-ভূমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও নাই। গজ ও রথে সুবিধা এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চালাইতে হয় না। পরে, রথযুদ্ধ হ্রাস পাইয়াছিল। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের (৭ম খ্রীষ্ট শতাব্দ) অশ্ব, গজ ও পদাতি ছিল, বোধ হয়, তাঁহার রথ ছিল না। শুক্রনীতিসারে, সৈন্য পদাতি-বহুল, অশ্ব মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বলা হইয়াছে। চতুর্বল ব্যতীত নৌ-বল ছিল। নদী-বহুল স্থানে নৌসেনা আবশ্যক হইত। বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) রথ-ভূমি নাই। রথের পরিবর্তে নৌ-বল আবশ্যক হইত। কিন্তু যে বলই হউক, বলাধ্যক্ষের গুণেই জয়। কত রাজা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং অগ্রণী হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ আছে।

অগ্নিপুরাণের ফল-জ্যোতিষ দেখিলে ইহার সংগ্রহ-কাল ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পরে এবং অষ্টম শতাব্দের পূর্বে, মোটামুটি সপ্তম শতাব্দ মনে করা যাইতে পারে। দশাবতার প্রতিমা-বর্ণনা ও অলঙ্কার শাস্ত্র অগ্নিপুরাণে আছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দে এই এই আকারে ছিল না, বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই।

৪। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ

এখন বাশিষ্ঠ-ধনুর্বেদ-সংহিতা দেখি। এখানি শ্লোকে রচিত। ব্যাখ্যার নিমিত্ত দুই এক স্থানে গদ্যও আছে। আরম্ভ গদ্যে, যথা,—"অথ একদা বিজয়কামী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র গুরু বশিষ্ঠ নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, 'হে ভগবন্, দুষ্ট শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ধনুর্বেদ বলুন।' মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি-প্রবর বশিষ্ঠ বলিলেন, 'ভো রাজন্ বিশ্বামিত্র, শুনুন। ভগবান্ সদাশিব যে রহস্য-সহিত ধনুর্বিদ্যা পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গো-ব্রাহ্মণ-সাধু-বেদ-সংরক্ষণ ও তোমার হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ-সম্মত সংহিতা'।"

এখানে একটা খট্‌কা আসিতেছে। গাধিসুত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ধনুর্বেদ শিখিতেছেন? রামায়ণে (আদি ৫৫।৫৬) দেখি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র পাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, ধনুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞের অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহাও স্মর্তব্য, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, দুই গোত্রের নাম। কিন্তু এই সংহিতায় বশিষ্ঠের নাম আর পাই না। আরম্ভের এই গদ্যটুকু পরে যোজিত বোধ হয়। এই সংহিতায় কেবল ধনুর্বিদ্যা লিখিত হইয়াছে, ধনুর্বাণ ব্যতীত অন্য আয়ুধের বর্ণনা কিংবা তদ্দ্বারা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত নাই।

এখানে প্রথম কিয়দংশ অনুবাদ করি। "ধনুর্বেদের চারিটি পাদ। প্রথম পাদে দীক্ষা, দ্বিতীয়ে ধনুঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে প্রয়োগ-বিধি। আয়ুধ চতুর্বিধ। হস্ত মুক্ত, যেমন চক্র; হস্ত-অমুক্ত, যেমন খড়্গ; হস্ত-মুক্ত-অমুক্ত, যেমন কুন্ত (কোঁচ); যন্ত্র-মুক্ত, যেমন শর। যুদ্ধ সাত প্রকার,—ধনুর্যুদ্ধ, চক্রযুদ্ধ, কুন্তযুদ্ধ, খড়্গ-যুদ্ধ, ছুরিকা-যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। [এখানে বন্দুক-যুদ্ধের নাম নাই।] ধনুর্বেদের গুরু ব্রাহ্মণ। ধনুর্বেদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার আছে। শূদ্রের যুদ্ধাধিকার আছে, কিন্তু নিজেরা শিখিয়া লইবে। [এই শ্লোকটি অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে।] আচার্য ব্রাহ্মণকে ধনুঃ, ক্ষত্রিয়কে খড়্গ, বৈশ্যকে কুন্ত, এবং শূদ্রকে গদা দিবেন [১৯]। যে গুরু সপ্ত প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি আচার্য; যিনি চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গব; এবং যিনি এক প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।" ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বার ও শিষ্যের জন্মরাশি দেখিয়া দীক্ষাকাল-নির্ণয়। দীক্ষার সময়, শঙ্কর কেশব ব্রহ্মা ও গণপতিকে তান্ত্রিক বীজে ধ্যান।

ধনু ও শর সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। 'চাপ দুই প্রকার,—শিক্ষার নিমিত্ত যৌগিক চাপ; আর যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ-চাপ' [চপ=বংশ নির্মিত বলিয়া চাপ।] কেমন বাঁশ? "অপক্ব, অতিজীর্ণ, জ্ঞাতি-ঘৃষ্ট (অন্য বাঁশ দ্বারা ঘৃষ্ট), দগ্ধ, ছিদ্রযুক্ত, গলগ্রন্থি ও তলগ্রন্থি হইবে না। চাপের পরিমাণ এক ধনু=চারি হাত। শিবের ধনু সাড়ে পাঁচ হাত। বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের, দীর্ঘে সাড়ে তিন হাত। গজারোহী, অশ্বারোহী শৃঙ্গের ধনু, এবং রথী ও পদাতি বাঁশের ধনু দ্বারা যুদ্ধ করিবে। লোহ, শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে ধনু নির্মিত হয়। স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং কৃষ্ণ-আয়স দ্বারা নির্মিত ধনু লোহ-ধনু। মহিষ, শরভ, ও রোহিত, ইহাদের শৃঙ্গে, শৃঙ্গ-ধনু। চন্দন, বেত্র, ধম্বন্, সাল, শাল্মলী, শাক, ককুভ, বংশ, অঞ্জন, এই এই কাঠ হইতে কাষ্ঠ-ধনু নির্মিত হয়।"

এই ধনুর্দ্রব্য অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে। সোনা, রূপা, তামা দিয়া ধনু হইতে পারে না। ইস্পাতের ধনু হইতে পারে, এবং বোধ হয়, তাহা সোনা, রূপা, তামা দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। এইরূপ বংশ ও দারুনির্মিত ধনু স্বর্ণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। মহিষের শৃঙ্গ ৮।৯ ফুট দীর্ঘ পাওয়া যায়। সুতরাং সাড়ে তিন হাত শার্ঙ্গ ধনু হইতে

---

১৯ যদি ধনুর্বেদে শূদ্রের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে আচার্য শূদ্রকে গদাই বা দেন কোন্ বিধানে? ব্রাহ্মণকে ধনু? ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পাই, সংগ্রামে যাত্রার পূর্বে পুরোহিত রাজাকে বর্ম পরিধান করাইয়া ধনুঃশর দিবেন। ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর তাহার শবের সহিত ধনুঃশর দেওয়া হইত। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকার, ব্রাহ্মণকে যুদ্ধাধিকার দেন নাই। আপৎকালের বিধি স্বতন্ত্র।

পারে। রোহিত ও রোহিষ মৃগ এক। অগ্নিপুরাণে রোহিষ আছে। লোহিত বর্ণ বলিয়া এই নাম। ইহার শৃঙ্গ ৪।৫ ফুট লম্বা হয়। শরভ এক অদ্ভুত মৃগ। এই সংহিতায় লিখিত আছে, "ইহার পা আটটি। তাহার মধ্যে চারিটি উর্দ্ধদিকে। ইহার শিং লম্বা। জন্তুটিও উটের ন্যায় উচু। বনে থাকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ।" মৃগের অষ্টপাদ নিশ্চয়ই কল্পিত। শরভ নামে এক জন্তু পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উল্লেখ মহাভারতে আছে। ইহার মুখ নাকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার নিকট সিংহও নাকি পরাজিত হয়। এটি যে কি জন্তু, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। ইংরেজী 'বাইসন' মনে হয়। বোধ হয়, কাশ্মীর দেশের দুর্গম বনাচ্ছন্ন পর্বতে এই মৃগ বাস করিত, এবং যাহারা ইহার শিং আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা মূল্য বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মৃগ অষ্টপাদ বলিয়া গল্প করিত। অতিশয় দ্রুত ধাবিত হয় বলিয়াও অষ্টপাদ মনে হইয়া থাকিবে। অবশ্য মৃগ অর্থে হরিণ নয়। রোহিষ ও শরভ যে মৃগ হউক, তাহাদের শৃঙ্গ নিশ্চয় মহিষ-শৃঙ্গের ন্যায় সুষির। সুশ্রুতে শরভ মাংসের গুণ বর্ণিত আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও শরভ আছে। কালিকা-পুরাণে বরাহ ও শরভ-যুদ্ধ বর্ণিত আছে, যদিও সেটা দক্ষযজ্ঞের ন্যায় আকাশে হইয়াছিল। রোহিষ ছাগবিশেষ মনে হয়। শিং চিরিয়া ছোট ছোট খণ্ড জুড়িয়াও শার্ঙ্গ ধনু করা হইত। কাষ্ঠের মধ্যে কেমন করিয়া চন্দনের ও সালের ধনু হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বরং পাতল শিমুল, সেগুন (শাক) ও অর্জুন (ককুভ) কাঠের ধনু হইতে পারে। কিন্তু অর্জুন কাঠ ফাটিয়া যায়, চন্দন কাঠ ভঙ্গুর। চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন না হইতে পারে। বকম গাছকেও চন্দন ধরা হইত। বোধ হয়, এই সকল কাঠ দিয়া গদা-যন্ত্র বা ক্ষেপণী নির্মিত হইত। বেত ও বাঁশের ধনু প্রসিদ্ধ। ধন্বন্, বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতে ধামন্। ইহার কাঠ স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে কাঁধে ভার বহিবার বাঁক বা বাঙ্গি হইয়া থাকে। অঞ্জন গাছ বুঝিতে পারিলাম না।[২০] যুদ্ধের ধনু যে বাঁশের হইত, তাহা উপরে দেখা গিয়াছে। কৌটিল্যে ধনুর্দ্রব্য দুই, কাষ্ঠ ও শৃঙ্গ। তাল কাঁড়ির ধনু কার্মুক, চপ-বাঁশের ধনু কোদণ্ড, দারু—টীকাকার মতে ধন্বন্—ধনুর নাম দ্রূণ, এবং শৃঙ্গ ধনুই ধনু। কার্মুক, কোদণ্ড, দ্রূণ, ধনু, দ্রব্যানুসারে নাম কিনা, সন্দেহ।

এখন ধনুর্গুণের কথা। "ইহা পট্টসূত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলের তুল্য স্থূল করিবে। অভাবে হরিণ ও মহিষের স্নায়ুর দ্বারা কিংবা তৎকালহত ছাগের তন্তু দ্বারা করিবে। বিশেষতঃ

---

২০ বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মাশহয় অঞ্জন শব্দে কুলগাছ বুঝিয়াছেন। কিন্তু কুল (বদরী) কাঠের ধনু টিকিবে না। অঞ্জন, কুলঞ্জন হইতে পারে। এটি হরিদ্রাদিবর্গের গাছ, কিন্তু ইহার ডাঁটা হিন্তালের মতন মোটা হয়। ইদানী কেহ কেহ ফুলের বাগানে বসাইয়া থাকেন।

পাকা বাঁশের চেয়াড়ির দুই মুখে পাটের সুতা দ্বারা ধনুতে বাঁধিবে। ইহা দৃঢ়, স্থায়ী ও সর্ব-কর্মসহ। এই সকল ব্যতীত আকন্দগাছের ছালের অংশু প্রশস্ত। ভাদ্র মাসে অংশু বাহির করিবে[২১]।

এখন শর-লক্ষণ। "শরৎকালে সুপ্রদেশ-জ শরগাছ আহরণ করিবে। পূর্ণগ্রন্থি [যাহার গাঁঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে], সুপক্ব, পাণ্ডুর বর্ণ, কঠিন, বর্তুল, ঋজু, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তুল্য স্থূল, দুই হাত কিংবা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। শরের পক্ষ ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। কাক, হংস, শশাদ (শ্যেন), মৎস্যাদ (মাছরাঙ্গা), ক্রৌঞ্চ (কোঁচবক), ময়ূর, গৃধ্র ও কুরব (কুরল), ইহাদের পক্ষ সুশোভন হয়। শার্ঙ্গধনুর পক্ষ দশাঙ্গুল পরিমিত। প্রত্যেক শরে চারিটি করিয়া পক্ষ স্নায়ু বা তন্তুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে।"

এখন ফল-লক্ষণ। "দেশভেদে ফলের নানা রূপ হইয়া থাকে। আরামুখ [মুচীর চর্মবেধনী সূচ্যাকার 'আরা'] দ্বারা চর্মছেদন [? বেধন ?], ক্ষুরপ্র [খুরপা] দ্বারা শর কর্তন বা বাহু কর্তন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা গ্রীবা মস্তক ধনু প্রভৃতি ছেদন, সূচীমুখ দ্বারা কবচ ভেদন, ভল্ল দ্বারা ধনুর্গুণ চর্বণ, দ্বিভল্ল দ্বারা বাণ-অবরোধন, কর্ণিক দ্বারা লোহময় বাণ ছেদন, কাকতুণ্ড দ্বারা বেধ্য বস্তুর বেধ করিবে।"

"যে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং তাহার মূলে বিষ উৎপন্ন হয়। পবন-অভাবেও সে ঝাড় কাঁপিতে থাকে। এইরূপ ঝাড়ের মূল শরের ফলে লেপন করিলে, তদ্দ্বারা ক্ষত স্থানের চিহ্ন থাকিয়া যায়।" ফলের পায়ন [পাইন]। 'পিপ্পলী, সৈন্ধব, কুষ্ট (কুড়),—এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ-পূর্বক শস্ত্রে লেপন করিবে। পরে আগুনে প্রতপ্ত করিবে। যখন তপ্ত অবস্থায় পীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নির্মল জল পান করাইবে[২২]। ইহার পর নারাচ, নালীক, ও শতঘ্ন অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে।

---

২১ শেষে এক শ্লোকার্দ্ধে আছে। সেটা অগ্নিপুরাণের পাশ-অস্ত্রের গুণ। এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছে, কে জানে। বোধ হয়, না বুঝিয়া সঙ্কলনের ফল। উপরে পট্টসূত্রের গুণ করিতে বলা হইয়াছে। ইহা খেলার ধনুর হইতে পারে। কৌটিল্যে আছে, মূর্বা, অর্ক (আকন্দ), শণ, গবেধু (গড়গড়া-ধান), বেণু (বাঁশ), স্নায়ু। বশিষ্ঠ-সংহিতায় তালের ধনু নাই, মূর্বার জ্যাও নাই। অগ্নিপুরাণেও নাই। ধনুর বৃক্ষগুলি দেখিলে বোধ হয়, অগ্নিপুরাণ ও এই সংহিতার দেশ মধ্যভারত ছিল।

২২ শরগাছ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে ও কৌটিল্যে বাঁশের শলাকা ও অন্য কাঠের শলাকার উল্লেখ আছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। যেন বিধাতা এই উদ্দেশ্যে শরগাছ

এখন শরাভ্যাসের কথা। ইহার পূর্বে অষ্ট 'স্থান,' ধনু ও জ্যা, মুষ্টি (ধারণ), জ্যা আকর্ষণ-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। "লক্ষ্য চারি প্রকার,—স্থির, চল, চলাচল, দ্বয়চল। চলাচল—যখন ধনুর্ধারী চলিতে চলিতে 'অচল' স্থির লক্ষ্য ভেদ করে। দ্বয়চল,—যখন দুই-ই চলিতে থাকে। ৬০ ধনু বা ২৪০ হাত দূরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ; ৪০ ধনু মধ্যম, ২০ ধনু কনিষ্ঠ। সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে যিনি চারিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ধনুর্ধারী।" এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর সাতটি দিব্যাস্ত্রের সন্ধান মন্ত্র। সাতটির নাম এই,—ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড, ব্রহ্মশির, পাশুপত, বায়ব্য, আগ্নেয়, নারসিংহ। দুঃখের বিষয় বাণের নির্মাণ ব্যক্ত করা হয় নাই।

তদনন্তর ওষধি-প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেহকে শত্রুর অস্ত্র-শস্ত্র হইতে অভেদ্য করিবার কথা আছে। একটা উদাহরণ তুলি। "রবি পুষ্যানক্ষত্রে থাকিবার সময় পাঠালতার [বৃদ্ধকর্ণি] মূল উৎপাটন করিবে। এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র [যে খড়্গের অগ্র গোল] দ্বারা দেহ কাটা যাইবে না।"

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহুযুক্ত যোগিনী এবং পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ত্ব দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা আছে। সর্বতোভয়ে দণ্ড-ব্যূহ, পশ্চাৎ ভয়ে শকট, পার্শ্বভয়ে বরাহ কিংবা গরুড়-ব্যূহ রচনা করিবে। পুস্তকের শেষে কয়েকপ্রকার ব্যূহের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সব ঠিক মনে হয় না। ইহার পর চতুরঙ্গ সেনা-শিক্ষা। লিখিত আছে প্রথমে 'ক্ষাত্রকোশ', ব্যাকরণ সূত্র, মনুর সপ্তম অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরার ব্যবহার অধ্যায়, জয়ার্ণব তন্ত্র, বিষ্ণুযামল, বিজয়াখ্য তন্ত্র, স্বরশাস্ত্র পাঠ করিবে, পরে ধনুর্বেদ।

সৃষ্টি করিয়াছেন। শরগাছের মূলে বিস জন্মে কি না, জানি না। বোধ হয়, ছত্রাক রোগ হেতু গাছ পীতবর্ণ হয়, এবং সে রোগে বিষও জন্মিতে পারে। কদাচিৎ হইত বলিয়া স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন গজমুক্তা। ফলের নানাবিধ আকার অনুসারে শরের নাম হইত। কৌটিল্য ফলের কর্ম, ছেদন ভেদন তাড়ন বলিয়াছেন। দ্রব্য,—লৌহ, অস্থি ও দারু। অস্থি ও দারুময় ফল পরে লুপ্ত হইয়াছিল। সংহিতায় কতকগুলি শরের নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশিত সংহিতায় কয়েকটির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মাতৃকায় ছিল কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সব ঠিক মনে হয় না। নামের অর্থ ও ফলের কর্মের সহিত মিলাইলেই ভ্রম ধরা পড়িবে। শরফল-পায়ন বিধিতে পিপ্পলী ও কুষ্ঠ লেপনের প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায় না। সৈন্ধব লবণ না দিয়া কাদা লেপিয়া দিলেও একই ফল, এবং তাহাই করা হইয়া থাকে। তাপ সমান করা ও রক্ষা করা উদ্দেশ্য। খড়্গ-পায়ন সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র ছিল। বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় কিছু আছে। সেখানে শুক্রাচার্য্য-সম্মত পায়ন-বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ভোজ রাজের যুক্তিকল্পতরুতে বাৎস্য, লৌহার্ণব, লৌহ-প্রদীপ, শার্ঙ্গধর হইতে খড়্গের গুণাগুণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন্ কালে সংহিতাখানি রচিত? রাজাকে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা পড়িতে বলা হইয়াছে। এই টীকা দ্বাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে প্রণীত। অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতার বর্তমান রূপ এই শতাব্দের পূর্বে নয়, পরের। কিন্তু কত পরের, তাহা বলা দুষ্কর। বোধ হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দের পরের নয়। এই সংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অন্ত্যজ এই পাঁচ বর্ণের সৈন্য হইত। ইহাদের এক এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিল (৬৫ পৃঃ)। পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত তখন পাঁজির দিক্‌শূলে প্রবল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সাতটি দিব্যাস্ত্র সত্য সত্য ছিল কিনা, সন্দেহ। কারণ এক এক বাণ-সন্ধানের পূর্বে দুই তিন লক্ষ, এক নিযুত বার গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা আছে। একবার জপ করিতে যদি এক সেকেণ্ড কাল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাশ আটাশ ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে! জপ করিয়া শত্রুর নাম করিয়া "হন হন হুম্ ফট্" বলিতে হইত। বোধ হয়, এগুলি আভিচারিক বাণ। অথর্ববেদের কাল হইতে শত্রু-নিপাতের নিমিত্ত আভিচারিক 'বাণমারা' অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। তাই, এই সংহিতা অথর্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের 'নরপতি জয়চর্যা' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। তাহাতে যুদ্ধে জয়লাভের যে কত তান্ত্রিক যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র আছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

কোন একখানি কিংবা দুইখানি প্রাচীন পুথী আধার করিয়া বাশিষ্ঠ-সংহিতা লেখা হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অগ্নি-পুরাণোক্ত ধনুর্বেদের কতক শ্লোক এই সংহিতায় আছে। হয়ত দুই-ই শিবোক্ত, অধুনা লুপ্ত, ধনুর্বেদ উভয়েরই মাতৃকা হইয়াছিল। সে সময়ে ক্ষত্রিয় রাজা সংস্কৃত জানেন না, অথচ ক্ষাত্রকোশ সংস্কৃত; সেনা-নয় ও সেনার প্রতি আজ্ঞা সংস্কৃতে বলিতে হইত। কাজেই তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর লট্ লোট্ মুখস্থ করিতে হইত। তিন বৎসর হইল বীরভূম বোলপুরের এক ভদ্রলোক, বোধ হয়, তিনি **Boy Scout Master**, আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাংলায় বালকদিগকে **Drill**-এর ভাষা ও **command** শেখানা উচিত, যদি বাংলায় মনে করি, তাহার প্রদত্ত **command**-গুলি বাংলার কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলায় শেখানা উচিত। কারণ তাহাতে শিক্ষা দেশীয় হইবে, বালকেরা শীঘ্র শিখিতে পারিবে, বড় হইলেও ভুলিবে না, এমন কি, অন্যেও বালকদের সহিত অক্লেশে যোগ দিতে পারিবে। চার-কোশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন বলিতাম, সংস্কৃতেও শিক্ষা দিতে পারেন, কারণ অনেক শব্দ পূর্বাবধি আছে, এবং অন্য প্রদেশের বালকেরাও একই কোশ শিখিতে পারিবে। লোটের পদগুলি হিন্দী করিলে আরও সুবিধা। সে কালের সেনা সংস্কৃত জানিত না, কিন্তু তাহারা বুঝিত। ইংরেজের আমলে

দেশী রাজ্যে বোধ হয়, ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। মোগল আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফার্সী কিংবা উর্দূ গ্রহণের কারণ ছিল না।

বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ-সংহিতায় নারাচ নালীক ও শতঘ্ন সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে (১৯ পৃঃ), পূর্বে ছাড়িয়া আসিয়াছি। প্রথম শ্লোকে নারাচের নির্মাণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে নালীক ও শতঘ্নের প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে। নারাচ এই—"যে সকল বাণ সর্ব লোহময়, তাহাদের নাম নারাচ। নারাচে পাঁচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ কেহ এই বাণে সিদ্ধ হয়।" নালীক ও শতঘ্নের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

নালীকালঘবো বাণা নল-যন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চ-দূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥
সিংহাসনস্থ রক্ষার্থং শতঘ্নং স্থাপয়েদ্ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো ধীমতা॥

নালীকা লঘুবাণ, নলযন্ত্র দ্বারা প্রেরিত হয়। অত্যুচ্চে দূরস্থে পাতিত করিতে হইলে এবং দুর্গযুদ্ধে লাগে। সিংহাসন রক্ষার্থ ধীমান্ 'গড়ে' শতঘ্ন এবং বহুল রঞ্জক ও বটি (বটী) স্থাপন করিবেন।"

নারাচ, নালীক ও শতঘ্ন, তিনই রামায়ণ-মহাভারতে আছে। নারাচ বাণ বটে, ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। কৌটিল্য, অগ্নিপুরাণ, ভোজরাজ, ইহার উল্লেখকরিয়া গিয়াছেন। শরে লোহার ফলা আঁটিয়া সাধারণ বাণ হইয়া থাকে। কিন্তু শর, বিপক্ষের বাণে ছেদ্য। নারাচের সবটাই লোহার। চতুঃশিরাল কিংবা পঞ্চশিরাল (যেমন এখানে), নির্গর্ভ, শিরাগুলি ধারাল। ছোট করিলেও ভারী। এই হেতু দূর লক্ষ্য বেধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাংঘাতিক। যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাঁকিয়া না যায়, এই কল্পনায় পূর্বকালের নালীকের উৎপত্তি। বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়া মুড়িয়া সরুমুখ নালীকা করা হইত। মুখের কিছু নীচে প্রায়ই দুইটি কাণ থাকিত। তখন হইত কর্ণী নালীক। নিম্নমুখ কর্ণ থাকাতে এই বাণ দেহে প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে পারা যাইত না। মহাভারতে নালীক-নারাচ, নারাচ-নালীক এইরূপ একত্র পাওয়া যায়। দুই-ই ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বাশিষ্ঠ সংহিতায় নারাচের সহিত নালীক আসিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন নালীক নয়। প্রাচীন 'বাণ' নামটি আসিয়াছে, কিন্তু নাল যন্ত্র দ্বারা প্রেরিত[২৩]। শুক্রনীতিসারে ইহার নাম ক্ষুদ্র বা লঘু নালীক।

২৩ বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মহাশয়ও লঘুবাণ নালীককে বন্দুক মনে করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসারে নালীকাস্ত্র বন্দুক না হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে পারা যাইত না। নারাচ ভারী, নালীক লঘু। এই হেতু

সেখানে বন্দুক এখানেও বন্দুক। এখানে নালীককে 'বাণ', শুক্রনীতিসারে 'অস্ত্র' বলা হইয়াছে। যে আয়ুধ নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহার নাম অস্ত্র, এই নির্বচন শুক্রনীতি-সারে। বাণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসার বন্দুককে 'অস্ত্র', বশিষ্ঠ 'বাণ' বলিয়াছেন। পুরাতন নাম নূতন দ্রব্যে প্রয়োগ করিতে গেলেই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। বটিকা বা গুলিকাকে বরং বাণ বলিতে পারি, বন্দুককে বলিতে পারি না। পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও বুঝায়, তাহা হইলে আপত্তি থাকে না। শতঘ্নী যন্ত্র পূর্বকালে দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত। কিন্তু সে শতঘ্নী, কামান নয়। এখানে রঞ্জক ও বটী না থাকিলে সে শতঘ্নী মনে হইত। আমরা কামানের বঞ্জক-ঘর এখনও বলি। রঞ্জক শব্দ সংস্কৃত, যাহা রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। এই অর্থে বারুদ। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসারের 'বৃহৎনালিক' এখানে 'শতঘ্ন', 'অগ্নিচূর্ণ' এখানে রঞ্জক, এবং 'গোল' এখানে 'বটী' নাম পাইয়াছে! শুক্রনীতিসারের দেশ ও কাল-বিচারে দেখিয়াছি, উহা একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে গুজরাট অঞ্চলে লেখা। বাশিষ্ঠ সংহিতা, দেশে ও কালে অধিক দূরে নয়। তথাপি এক শব্দ না হইয়া পৃথক পৃথক হইল কেন? বশিষ্ঠের এই তিন শ্লোক, বিশেষতঃ বন্দুক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই। পূর্বে গিয়াছে ধনু জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই দুয়ের মাঝে তিনটি শ্লোক যেন অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক কামান চালাইবার উপদেশ কোথাও নাই। কিন্তু সৈন্যেরা যে চালাইত, তাহা ধাতুরূপ উদাহরণে আছে। যথা "রঞ্জকাদবসিতং দহত" (বোধ হয়, পাঠ অশুদ্ধ). অবসিত সঞ্চিত রঞ্জক জ্বালাও ('ফায়ার' কর); "বটিকা আয়ান্তি নিপতত"— গুলী আসিতেছে শুইয়া পড়; "চর্মণা বটিকাং রুন্ধ"—ঢাল দিয়া গুলী রোধ কর। "রঞ্জকং দত্তং" —রঞ্জক দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের মধ্যেও একস্থানে রঞ্জক প্রয়োগ আছে (৪১ পৃঃ)।

একটির পর অপরটি যথাস্থানে আসিয়াছে। নালীক, নল যন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হয়, নালীক নিশ্চয় নলাকার। বন্দুক উদ্ভাবনার কালে নলে বারুদ ঠাসিয়া তদুপরি ধাতুময় প্রাচীন নালীক বাণ স্থাপিত হইত? বটিকাস্থাপন তখন ছিল না কি? এ সম্বন্ধে ফুৎ নল (blow-gun) স্মর্তব্য। আমেরিকা, বোর্ণিও ও ফিলিপাইন দ্বীপের অসভ্য জাতিরা শরের, কদাচিৎ বাঁশের ও কাঠের সরু লম্বা নলে শর' রাখিয়া মুখের ফুৎকারে দূরে নিক্ষেপ করে। নল-যন্ত্র ৪ ফুট হইতে ১৪ ফুট লম্বা। ভিতরের গর্ভ আধ ইঞ্চি। 'শর' খড়িকার মতন, ৩।৪ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। মুখে হাড়ের কল, বিষ-মাখানা। পক্ষ তুলার। এই নল-যন্ত্র দ্বারা একশত হাত দূরে 'শর' নিক্ষিপ্ত হয়। অসভ্যজাতিরা এতদ্দ্বারা যুদ্ধ ও মৃগয়া করে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল আমায় জানাইয়াছেন, অসভ্য ভীলজাতি এইরূপ ফুৎ-নল দ্বারা মৃগয়া করে। সংস্কৃতের ইষিকা অস্ত্র নলদ্বারা প্রেরিত হইত কিনা, কে জানে। ধনুর্দ্বারা হইত, তাহার উল্লেখ আছে।

"হে বিশ্বামিত্র, বাণে রঞ্জক-নালিকা বদ্ধ করিয়া বায়ু-মুখে নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ঘুরিয়া আসিবে। এই বাণের নাম খগ-বাণ।" রঞ্জক-নালিকা—বারুদ-পূর্ণ নালিকা, হাবুই তুল্য পশ্চাৎগামী হইবে। বিশেষতঃ সম্মুখ বাতাসের সাহায্য পাইলে।

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার প্রমাণ মূল্যবান্। বন্দুকের বাণের নাম নালীক, ইহা নূতন। একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে বন্দুকের নাম নালীকাস্ত্র। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতাব্দ পূর্ববর্ত্তী বলা চলে।

বন্দুক আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ লোপ করিয়াছে। কিন্তু এখনও পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতাল জাতি 'কাঁড় বাঁশ', (তীর ধনুক) ছাড়ে নাই। হাতে 'আহ্‌শার' (ধনুঃশর) থাকিলে বাঘকেও ডরায় না। তাহাদের ধনু বাঁশের কিন্তু চারি হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। মোটামুটি পাঁচ ফুট, পূর্ব্বকালের মধ্যম পরিমাণ। পূর্বকালের কার্ম্মুক চারি হাত বা ছয় ফুট লম্বা। সে ধনু ধারণ সোজা নয়। সে ধনুর নিম্ন কোটি মাটিতে টিপিয়া গুণ আকর্ষণ করিতে হয়। মাটি নরম হইলে সে ধনু অকর্মণ্য। ধনুর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা বাঁশের চেয়াড়ীর দুই মাথা দোড়ী দিয়া ধনুতে বাঁধা থাকে। 'লাদনা' (সাঁওতালী, 'চিট লাড়') গাছের ছালের আঁশের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। সাঁওতালী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে, উচ্চারণও প্রায় ঠিক আছে। এই ভাষায় শরকে বলে 'শার', ধনুর গুণকে বলে 'ঘুণা' (ণ উচ্চারণ চাই)। তাহাদের শর শরগাছের, কদাচিৎ বাঁশের শলার, পুঙ্খ ময়ূরের, ফলা কাঁচা ইস্পাতের। নরম পাইন দেওয়া হয়। কড়া পাইন ভঙ্গুর। সাধারণ ফলার আকার তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপ্‌ড়ি শার], (২) শিরাল, গো-পুচ্ছ (উগলি শার), (৩) ইহার নিম্নদিকে কর্ণ থাকিলে কর্ণী (গানারি শার)। এই ত্রিবিধ সামান্য শর ব্যতীত সমগ্র লৌহময় বাণ, সংস্কৃতের নারাচ আছে। ফাল্গুন মাসে পুষ্পোৎসবে ('বাহাপরব') দেবতার নিকট অস্ত্র-শস্ত্রের পূজায় এই নারাচ বসে, কুক্কুট ও ছাগ বলি হয়। এটি পূর্বকালের এবং এ কালেরও নীরাজনা। আশ্বিন শুক্লা নবমীতে অস্ত্র-নীরাজনার দিন। গজাশ্বের অন্য দিন ছিল। পণ্ডিতের যেমন সরস্বতী পূজা, যোদ্ধার তেমন নীরাজনা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পশু বধ করিতে ফলায় কদাচিৎ বিষ মাখানা হয়, ভালুক মারিতে ফলা অগ্নি-তপ্ত করা হয়। মনু (৭।৯০) কর্ণী ও বিষদিগ্ধ ও অগ্নিদীপ্ত বাণ-নিক্ষেপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কে অবধ্য, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সাঁওতাল ধানুক আলীঢ় ভাবে (দক্ষিণ জানু স্তব্ধ, বাম জানু হলাকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) দাঁড়াইয়া শর নিক্ষেপ করে। শিক্ষিত ধানুকী ২৫০ হাত দূরস্থিত লক্ষ্য অক্লেশে বিদ্ধ করিতে পারে। পূর্বকালেও

এই ছিল। অবশ্য, চল, চলাচল, দ্বয়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না পারিলে মৃগ পক্ষী মারিতে পারা যায় না। ওড়িষ্যার আটবিকেরা ব্যাঘ্র বধ করিতে যন্ত্র পাতে। সে যন্ত্র শরারোপিত বৃহৎ ধনুর্মাত্র (প্রাচীন নাম, মহাযন্ত্র)।

পরিশেষে ইতিহাস ছাড়িয়া একটু কাজের কথা লিখি। ইদানী দেশে ব্যায়াম, বাহুযুদ্ধ, যষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবার উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহাদের সহিত ধনুর্যুদ্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষতঃ বালিকাদের পক্ষে অন্য যুদ্ধ সম্ভব নয়, কিন্তু ধনুর্যুদ্ধে আপত্তি দেখি না। লোহার ফলা না করিয়া দৃঢ় কাঠের কিংবা শিঙ্গের মুণ্ড করিলে ব্যায়ামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইলে বাশিষ্ঠ সংহিতা পথ-প্রদর্শক হইবে।

৫। কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র

ধনুর্বেদ ও রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে স্বভাবতঃ প্রশ্ন ওঠে, সে কালে বন্দুক কামান ছিল কি না। অনেকে আগ্নেয়াস্ত্র নামে ভুলিয়াছেন; ব্রহ্মাস্ত্র, নালীক, ভুশুণ্ডী, শতঘ্নী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল দুরূহ। কিন্তু সেটা কি, বলা অপেক্ষা, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিন নয়। আমি এখানে 'নেতি নতি' বলিতে যাইতেছি।

ইহাতে কিন্তু মনস্তোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জানিতে কৌতূহল হয়। অস্ত্রের নামের কেবল অর্থ ধরিয়া কদাচিৎ বর্গ নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্ম, এই চারি না জানিলে গণ ও জাতি নির্ণয় হইতে পারে না। কৌটিল্য আয়ুধের জাতি রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নির্মাণ দেশ) মূল্য জানিতে বলিয়াছেন। ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে খড়্গের নানা জাতি ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে অস্ত্রের কর্ম, বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ বিশেষণ দ্বারা নির্মাণ জানিতে পারা যায়, এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অনুমিত হইতে পারে। যেখানে কেবল নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজ্ঞাত থাকিবে। বলা বাহুল্য, বন্দুক ও কামানে নল চাই, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি বারুদ না পাই, তাহা হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে না। এখানে কয়েকটা বিচার করিতেছি।

১। সূর্মি, সূর্মী। নামটি মনুসংহিতায় (১১।১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময় প্রতিমা।

বোধ হয়, সুষির। গুরুপত্নীগামীকে জলন্ত সূর্মী আলিঙ্গন করাইয়া বধের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া তাহা জ্বালাময়ী করা হইত। ঋগ্বেদে (৭।১।৩) সূর্মী অর্থে সায়ণ করিয়াছেন 'জ্বালা' (অগ্নি)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১।৫।৭।৬) 'কর্ণকাবতী সূর্মী' অর্থে সায়ণ করিয়াছেন "জলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী, সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অন্তরপি জলন্তীত্যর্থঃ।" জলন্তী লোহময়ী ছিদ্রবতী স্থূণা (স্তম্ভ)। ধাতু পুড়িতে পারে না, অতএব 'জলন্তী' - অগ্নি-দীপ্তা। তৈত্তিরীয়-সংহিতার (৫।৪।৭।৩) সূক্তেও সূর্মী শব্দের এই অর্থ। উক্ত সংহিতার (৪।৫।৯।২) সূক্তে সূর্মী শব্দের অর্থ সায়ণ বুঝিয়াছেন সু+উর্মী=শোভন উর্মীযুক্ত। অতএব বেদের সূর্মি, বন্দুক কামান কিছুই নয়। সায়ণ জলন্তী সূর্মী অর্থে, মনুসংহিতার সূর্মী বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল। সূর্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি সূর্মী অর্থে নালীকা করিতেন। পশ্চিম দেশের বৈদিক পণ্ডিতেরা সূর্মি শব্দে বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাজ করিত। অন্যত্র বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। ঋগ্‌বেদেও (৮।৬৯।১২) 'সূর্ম্য সুষির' আছে। অতএব এইটুকু পাইতেছি সূর্মী নলবিশেষ। কিন্তু নল এবং নলে কর্ণ থাকিলেই তাহাকে বন্দুক মনে করিতে পারা যায় না। যে কালে চক্‌মকি ঠুকিয়া, কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নিমন্থন করা হইত, সে কালে বারুদ কল্পনা অসম্ভব। এমনও হইতে পারে, সূর্মী কর্ণীও নলাকার অগ্নি-পাত্র। পাত্রে জলন্ত অঙ্গার থাকিলে তাহার উপরে এবং পাত্রের পার্শ্বে উত্তপ্ত বায়ুর উর্মী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই উর্মী হেতু পাত্রের নাম সূর্মী।

২। সীস। অথর্ববেদে সীস দ্বারা শত্রু বিনাশের কথা আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই সীস বন্দুকের বটিকা বা গুলিকা। কিন্তু এই বেদের সূক্তগুলি এবং সায়ণের ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে না। যথা, অথর্ববেদে (১।১৬।১২) বরুণ সীসকে বলিতেছেন, "হে সীস, অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র রাক্ষসাদি বধের জন্য আমায় সীস দিয়াছেন।" এখানে সায়ণ সীস শব্দের অর্থ করিতেছেন, নদীফেন, যদিও অগ্নি কেন নদীফেনকে রক্ষা করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। অগ্নিকে দেব মনে করিলে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বেদে (১।১৬।৪) "যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষং। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নো সো অবীরহা।" সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন,—হে শত্রু, যদি তুমি আমার গো অশ্ব ভৃত্যাদি বধ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সীস দ্বারা এরূপ প্রহার করিব যাহাতে তুমি আর কখনও এরূপ করিতে পারিবে না। উক্ত সূক্তের আরম্ভে সায়ণ লিখিয়াছেন,

অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বেষ্য মারণার্থ ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শত্রুকে সীস চূর্ণ-মিশ্রিত-অন্ন-প্রদান, শত্রুর গাত্রস্থ আভরণ-স্পর্শন ও তাহাকে বংশ-যষ্টি দ্বারা তাড়ন করিবে। এখানে সায়ণ কৌশিক সূত্র হইতে লিখিয়াছেন, সীস শব্দের অর্থ নদীফেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সীস শব্দ দ্বারা সীস ধাতু নয়, নদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং আভিচারিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন দ্বারা শত্রু বিনাশের কথা আছে। বোধ হয়, এই নদীফেন আয়ুর্বেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে এইরূপ 'বাণমারায়' এখনও বিশ্বাস করে, এবং যাহার উদ্দেশে মারা হয়, সে শুনিতে পাইলে শুখাইয়া মরিয়া যায়। অর্থাৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয়।*

৩। আগ্নেয়াস্ত্র। অর্থ, অগ্নিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত; ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, রামায়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ ল° ।১০০), শ্রীরাম ধনু দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (ল° ।১১০)। এই ব্রহ্মাস্ত্র কেমন?

"দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগং জাজ্বল্যমানং সুপুঙ্খং সধূমং।" "স [রামঃ] রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম-বিদারণম্॥" রাম কার্মুক অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মর্ম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজ্বলিত: জ্বলিবার সময় সাপের মত শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছিল। মৎস্য পুরাণে (বঙ্গবাসীর, ১৫৩ অঃ), জম্ভাসুর-বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্ণপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র বাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, এবং রামায়ণের ঐষিকাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, সৌরাস্ত্র প্রভৃতি সব আগ্নেয়াস্ত্রের ভেদ।

কেবল বাণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্য অগ্নিও শত্রুসেনার মধ্যে ফেলা হইত। রামায়ণে (ল° ।৭৩) ইন্দ্রজিৎ স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা সম্বলিত শূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এত ক্ষিপ্রহস্তে ও বেগে অগ্নিময় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শত্রু বাম কিংবা দক্ষিণে সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শত্রু মাত্র দুই শত কি আড়াই শত হাত দূরে থাকিত।

৪। শতঘ্নী। ইহা একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিল্যের শতঘ্নী অচলযন্ত্রবর্গের মধ্যে। টীকাকার লিখিয়াছেন,

---

* পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী আমায় বেদ হইতে সূর্মী ও সীসের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

বহু-লৌহকণ্টক সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তম্ভ, দুর্গপ্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়ন্তী-কোশে (১২শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের আদ্যে) শতঘ্নী "অয়ঃকণ্টকসংছন্না মহাশিলা"। শব্দকল্পদ্রুমে বিজয়-রক্ষিত "অয়ঃকণ্টক-সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা"। অর্থাৎ শিলা-স্তম্ভের গায়ে লোহার কাঁটা পুতিয়া রাখা হইত। শত্রুসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তম্ভটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত, তাহারা কাঁটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। যথা, রামায়ণে (ল° ।৩), "লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইষু-উপল-যন্ত্র (শর ও পাষাণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী) এবং শাণিত কৃষ্ণায়স-ময় শত শত শতঘ্নী আছে।" কৃষ্ণায়সময়,—ইস্পাতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয়া 'শতঘ্নী-মুষলায়ুধ', শতঘ্নী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (সু° ।৪)। এই দুই আয়ুধ পিষিয়া মারে, এই কর্ম সাদৃশ্য হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে। শতঘ্নী রণস্থলে লইয়া যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে শতঘ্নী লইয়া গিয়াছিল (ল° ।৭৮)। মহাভারতেও (দ্রোণপর্ব) চাকার উপরে শতঘ্নী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদে কামানের নাম শতঘ্ন হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তর প্রাপ্তির ভূরি ভূরি উদাহরণও আছে।

৫। ভুশুণ্ডী। শব্দটি ভূ-শুণ্ডী, কি ভুশুণ্ডী, কি ভুসুণ্ডী, জানা নাই। অমরাদি কোশে নাই। বৈজয়ন্তী কোশে, ভুশুণ্ঠি। অর্থ, "দারুময়ী বৃত্তায়ঃ কীল-সঞ্চিতা" গদা বোধ হয়, গোল-লৌহ-পিণ্ডাগ্র গদাবিশেষ; প্রয়োগ দেখি। মৎস্য পুরাণে (১৫১ অঃ), হরি কৃতান্ত-তুল্য ভুশুণ্ডী গ্রহণ করিয়া শুম্ভের মেষবাহন 'পিপেষ' পিষিয়া মারিলেন। রামায়ণে (ল° ।৬০) "নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভুশুণ্ডী, মুষল, ও গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল।" তিনই গদা। মহাভারতে (দ্রোণ, ১৭৭), "খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডী, মুষল, শূল, শরাসন ও হস্তীচর্ম-সদৃশ বর্ম।" এখানে গদা ও মুষলের মাঝে ভুশুণ্ডী থাকাতে মনে হয়, উহা তদ্বৎ কিছু হইবে।

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭) টীকাকার নীলকণ্ঠ (১৬শ খ্রীষ্ট-শতাব্দ) ভুশুণ্ডী অর্থে লিখিয়াছেন, 'পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জুময় যন্ত্র।' এই যন্ত্র অদ্যাপি আছে। এক টুকরা চর্মের দুই প্রান্তে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চর্মের উপরে পাষাণ রাখিয়া বেগে ঘুরাইয়া হ্রস্ব রজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাষাণ-খণ্ড বেগে দূরে গিয়া পড়ে। হুগলী আরামবাগে বলে হেঁটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্ডী। ইটা-ল কি-না ইঁট-ভাঙ্গা। অতএব শব্দটি ভূ-শুণ্ডী, যে শুণ্ডাকার যন্ত্র দ্বারা ভূ (মৃৎপিণ্ড) নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্য-বেধে অভ্যাস

থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘাতিক হয়। ছেলেরা তালপাতা কিংবা দু-ভাঁজ দোড়ীর করে। বাঁকুড়ায় বলে 'ডেলাস' (ডেলা-অস্ত্র)। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কালকেতু হাটে "ভূষণ্ডী ডাবুশ খরশাণ" ক্রয় করিয়াছিল। নীলকণ্ঠের ভুশুণ্ডী এইরূপ হইবে। বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদেও এই অর্থ। সেথানে আছে পদাতি সেনা, ভুশুণ্ডী কিংবা ধনু ধরিয়া গাছের আড়ালে থাকিয়া কিংবা গাছে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ ভুশুণ্ডী দ্বারা পাষাণ অথবা ধনুর দ্বারা শর নিক্ষেপ করিবে।

৬। ঔর্বাগ্নি। কেহ কেহ ঔর্বাগ্নি, বারুদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বারুদকে অগ্নি বলিতে পারা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতে, ঔর্বাগ্নি, বড়বানল। রামায়ণে (কিষ্‌। ৪৪), সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানর (অনার্য-মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন, "পূর্বদিকে সপ্ত রাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ অন্বেষণ করিবে। জলোদসাগরে ব্রহ্মা ঔর্বঋষির কোপজ তেজে সর্বভূত-ভয়াবহ এক বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।" এই বর্ণনা আগ্নেয় গিরির উৎক্ষেপের। সুমাত্রার নিকটস্থ ক্রাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, পূর্বকালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত, এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা। আগ্নেয় গিরিটি দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে। উর্বী, পৃথিবীর ভূমি-জাত অগ্নি ঔর্বাগ্নি। কালিদাসের শকুন্তলায়, "অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।" ঔর্ব বড়বানল, ঔর্বাগ্নি বড়বাগ্নি।

৭। নালীক। পূর্বে নালীক দেখা গিয়াছে। নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা কর্মে সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র লৌহময় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুঁড়িতে পারিত না। তখন সরু নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। বৈজয়ন্তী লিখিয়াছেন, নালীক বাণ। প্রয়োগ দেখি। রামায়ণে (অযোধ্যা, ২৫), "শ্রীরাম-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া নিশাচরেরা ভীম আর্ত্তস্বর করিতে লাগিল।" এথানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের "ধনুর্গুণচ্যুত বাণ"। নালীক, সুষির কিন্তু সূচ্যগ্র বাণ। কর্ণী, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণী বোধ হয়, দ্বিকর্ণীর রূপান্তর। রামায়ণে (আরণ্য, ২৬), "রাম এক শত কর্ণী দ্বারা একশত রাক্ষস বধ করিলেন।" মহাভারতে (ভীষ্ম, ৯৫, ৩১) "কর্ণী-নালীক-সায়কৈঃ", (ভীষ্ম, ১০৬, ১৩) "কর্ণী-নালীক-নারাচৈঃ", সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, কর্ণী-নালীক এক পদ। নালীকের

কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাণটি আরও ভীষণ। সৌপ্তিক পর্বে (১০, ১৫), "কর্ণী-নালীক দংষ্ট্রস্য খড়্গজিহ্বস্য সংযুগে।" যাহার দংষ্ট্রা কর্ণী-নালীক, জিহ্বা খড়্গ। অতএব নালীক সূচ্যগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২০), "মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণী নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শর-নিচয়-নির্মিত শয্যায় শয়ান আছেন।" এখানে নালীক স্পষ্ট শর। বন্দুক উদ্‌ভাবনার পর উহা নলাকার বলিয়া নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়াছিল।

৮। অয়ঃ কণপ। মহাভারতে (আদি, ২২৭, ২৫), কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির ভোজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাণ্ডব-বন রক্ষা করিতেছেন, "অয়ঃকণপচক্রাশ্ম ভুশুণ্ড্যুদ্যত বাহবঃ।" হাতে অয়ঃ-কণপ, চক্রাশ্ম, ও ভুশুণ্ডী লইয়া। নীলকণ্ঠ তিনটিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভুশুণ্ডীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জু। চক্রাশ্ম— 'অতি দূরে বড় বড় পাষাণ-নিক্ষেপের কাষ্ঠময় যন্ত্র। ইহার ঘূর্ণন-বেগে পাষাণ নিক্ষিপ্ত হয়।' চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের দুইটি যন্ত্র পাইলাম। অয়ঃ-কণপং—অয়ঃ-কণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধিবলেন গর্ভসম্ভূতা লোহগুলিকাস্তারকাইব বিকীর্যন্তে যেন তৎ যন্ত্রং লোহময়ং।" যে লোহময় যন্ত্রের গর্ভস্থ লৌহগুলিকা আগ্নেয়ঔষধিবলে তারকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অবিকল বন্দুক। কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিকা পান করে না, বমন করে। আর, হাতে বন্দুক থাকিতে কৃষ্ণার্জ্জুন পাষাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতি দূরে মহান্ পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। 'চক্রাশ্ম' এক পদ কিনা, কে জানে। সে যাহা হউক, নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। অমর কোশে (লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২০) কণপ শব্দ আছে। ক্ষীর-স্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভানুজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন কণং পাতি পিবতি বা। অর্থ যাহাই হউক। অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্দটি কণপ নয়, কণয়। সর্ব্বানন্দ অর্থ করিয়াছেন, শর-ভেদে। কেশবকোশেও কণয় শর-ভেদে। ইহাতে কণ-প নাই। মহেশ্বর টীকায়, কুণ-প আছে, কণ-প, কণয় নাই। কণ-প শব্দের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শর ভেদে। শব্দ-কল্পদ্রুমে, কুণপ শব্দের এক অর্থ বড়্‌শা ইতি ভাষা। অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন রূপ। নাগরী প য অক্ষরে ভ্রম হইয়া থাকিবে। য স্থানে প এর উদাহরণ আরও আছে। সে যাহা হউক, অয়ঃ-কণপ লোহার বড়্‌শা পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের না হইয়া লোহার। পাষাণের তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মৎস্যপুরাণে (১৫০-৭৩), "চক্র কুণপ প্রাস ভুশুণ্ডী পট্টিশ", পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের শ্লোকটিতেও 'কণপ ভুশুণ্ডী' আছে। নীলকণ্ঠ খ্রীষ্ট

ষোড়শ শতাব্দে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা যেমন বন্দুক কামান দেখিয়া প্রাচীন নানা অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি; তিনিও তেমনই পাইয়া থাকিবেন।

৯। অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে, কিন্তু বারুদ না দেখিলে বন্দুক কল্পনা মিথ্যা। মহাভারতে (বন-পর্বে, সৌভবধ বৃত্তান্তে) "দ্বারকাপুরী চক্র লগুড় তোমর অঙ্কুশ শতঘ্নী লাঙ্গল ভুশুণ্ডী অয়োগুডক খড়্গ চর্ম ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিতা। মৎস্যপুরাণে (১৫৩-১৩৩) "জম্ভাসুর দেব-সৈন্যের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্র মুদ্গর কুঠার খড়্গ ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড বর্ষণ করিতে লাগিল।" অয়োগুড= অয়োগুল, লোহগুলিকা। কিন্তু কে জানে লোহার গুলী বাটুলের মতন ছোঁড়া হইত কিনা।

সে কালে গুলতই বা গুলতি ও বাঁটুল অবশ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী তৎসম্পাদিত বাশিষ্ঠধনুর্বেদের ভূমিকায় অগ্নিপুরাণ হইতে উপক্ষেপক নামক চাপের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ইহা বাঁশের, দীর্ঘে তিন হাত, বিস্তারে দুই অঙ্গুলী। ইহাতে দুইটি রজ্জু থাকে'। (আমি বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অগ্নিপুরাণে এই শ্লোক পাই নাই।) অয়োগুড শব্দের অয়স্ অর্থে লৌহ ব্যতীত অন্য ধাতুও বুঝায়।

১০। তুলা-গুড। মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অ) অর্জুনের স্বর্গ-আগমনের নিমিত্ত ইন্দ্র স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি, শক্তি, ভীমগদা, দিব্যপ্রভব প্রাস, মহাপ্রভা বিদ্যুৎ, তথৈব অশনি, চক্রযুক্ত তুলা-গুড ছিল। তুলা-গুড কেমন? বায়ুস্ফোট, শনির্ঘাত, মহামেঘস্বান। রথে জ্বলিতানল ভীষণকায় নাগ, ও ধবল উপল ছিল।

ইন্দ্রের অস্ত্র বর্ণনায় কবি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কবি অজ্ঞাত অস্ত্র কল্পনা করেন নাই। নাগ, নাগপাশের মুখস্বরূপ নাগ। ধবল উপল স্ফটিক পাষাণ। কিন্তু চক্রযুক্ত তুলা-গুডের বর্ণনা পড়িলে হঠাৎ কামান মনে হয়। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "তুলাগুডাঃ ভাণ্ডগোলকাঃ ভাণ্ডানি তু নাল বন্দুখ্ ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষয়া প্রসিদ্ধানি। * * বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাদ্ বায়ুং জনয়ন্তঃ সনির্ঘাতা অশনিধ্বনিযুক্তাশ্চ মহামেঘস্বনাঃ।" কিন্তু নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। রথে কামান থাকিতে পাথর কেন? নরলোকে নাই থাকে, ইন্দ্রের অস্ত্রের মধ্যে অন্য কোথাও কামান পাই নাই, তুলা-গুড অস্ত্রও পাই নাই। অতএব শব্দার্থ ধরিতে হইতেছে। গুড=গুল=গোল (গোলা)। এই গোলা কিসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইত? তুলা দ্বারা। তুলা কি? শাশ্বতকোশ (৭ম খ্রীষ্ট-শতাব্দ) তুলা শব্দের পাঁচছয়টি অর্থ দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি অর্থ ভাণ্ড আছে বটে, কিন্তু সে ভাণ্ড পাত্র নয়, বণিক্‌ধন (দোকানের মাল), ও

মূলধন (ইংরেজী 'ফাণ্ড')। তুলা যাহা দ্বারা তুলিতে পারা যায়। শাশ্বতকোশে এই অর্থে ঘরের চালের তুলা। বাঙ্গালায় বলি, তোড়া। তুলা-যন্ত্রের তুলাদণ্ড হইতে বাঙ্গালায় বলি তোড়া (ইংরেজীতে 'লীভার')। আমার বোধ হয়, তুলা-গুড যে গোলা তুলা দ্বারা নিক্ষেপ্য। অয়োগুডও এই বোধ হয়। তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধূমের নামগন্ধ নাই।

উপরে দশটি অস্ত্র দেখা গেল। একটাকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে করিবার কোন হেতু পাওয়া গেল না। অস্ত্র শস্ত্রের অসংখ্য নাম ছিল। যত নির্মাণ, যত আকৃতি, যত কর্ম, তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাগ করিতে না পারিলে কেবল নাম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে, মায়া-যুদ্ধ ছিল, ইহাতে রাক্ষস ও অসুরেরা দক্ষ ছিল। মায়া, সবই মিথ্যা। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা-পূজার ঝাঁপানের দিন সর্পবিদ্যার গুণিন্ শত শত লোকের সম্মুখে নাগ-যুদ্ধ করিত। দুই পক্ষের গুণিন্ সর্প সৃষ্টি করিত। কেমনে করিত কে জানে। যাহাঁরা ভোজ বিদ্যা ও ভানুমতী-বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাঁরা জানেন ভারতীয় ইন্দ্রজাল অদ্বিতীয়। ইন্দ্রজালে দ্রব্য সত্য, মায়াতে দ্রব্যও মিথ্যা।

মায়িক অস্ত্র ব্যতীত কতকগুলি দিব্যাস্ত্র ছিল। এ সকলের কর্ম অদ্ভুত দেখিয়া 'দিব্য' এই নাম দেওয়া হইত। নির্মাণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখা হইত। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ গুপ্ত না রাখিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ। দিব্যাস্ত্র-লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইত, নির্মাণ ও সন্ধান শিখিতে অধ্যবসায়ী হইতে হইত। এই সকল অস্ত্রের নামে দেবতার নাম যুক্ত থাকিত। প্রয়োগের পূর্বে সে দেব-গুরুকে প্রণাম করা অবশ্য স্বাভাবিক। প্রয়োগের মন্ত্র, অর্থাৎ প্রয়োগ-ক্রম-জ্ঞাপক শ্লোক অভ্যাস করা হইত। মন্ত্র ভুলিয়া গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িত। দিব্যাস্ত্রের অপর নাম মান্ত্রিক হইবার কারণ এই। আসুর অস্ত্রের নাম মায়িক। এই দুই ভাগের অস্ত্র ব্যতীত যাবতীয় অস্ত্র মানুষাস্ত্র, অর্থাৎ সাধারণ।

রিপুসৈন্যের ব্যূহভেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে। এ নিমিত্ত রিপুসৈন্যের প্রতি মদ-মত্ত-গজ চালনা করা হইত। এই কারণে কামন্দক মদ-মত্ত-মাতঙ্গের প্রশংসা করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যূহে অগ্নি-বাণ-নিক্ষেপ। সংহত সেনার উপরে প্রজ্বলিত অগ্নি-পিণ্ড পড়িতে থাকিলে সেনা অসংহত হইয়া পড়ে। অলাত-চক্রের সম্মুখীন করিয়া যুদ্ধগজকে ভয়-হীন করা হইত। তথাপি পশুমাত্রেই আগুন যত ভয় করে, অস্ত্র শস্ত্র তত করে না। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে তেল ধূনা জউ (যতু) তুষ দিয়া অগ্নি-পিণ্ড-নির্ম্মাণ, এক কর্ম ছিল। বোধ হয়, পিণ্ড-নিক্ষেপের নিমিত্ত তাহাতে দোড়ী কিম্বা বাঁশ বদ্ধ করা থাকিত। মহাযন্ত্র

ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেত্রে সে সকল পিণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রিপুসৈন্যে নিক্ষিপ্ত করা হইত। মুসলমানদের মহরমে যে বনেটী খেলা দেখি, একখণ্ড বাঁশের দুই প্রান্তে প্রজ্বলিত অগ্নি-পিণ্ড, সেটা প্রাচীন কালের বাণ-যষ্টি। ভারতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ধূনা-জউর অগ্নিতে জল ঢালিলেও শীঘ্র নিবে না। গ্রীক বীর আলেকসন্দারের সহিত যুদ্ধকালে পুরু-রাজার সেনার অগ্নিবর্ষণ দ্বারা যবন সেনা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও অগ্নি-বাণ প্রচুর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এটি মানুষ-অস্ত্র। সকলেই জানিত, এবং অগ্নি নির্বাপণ নিমিত্ত রণক্ষেত্রে জল, বালি, ধূলি সংগৃহীত থাকিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ পড়িলে এই সকল বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে। বনপর্বে (২৮২ অঃ) লঙ্কাপুরী বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী অগাধজল-পরিপূর্ণ সাতটি পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাকারে খদির কাষ্ঠ-নির্মিত শঙ্কু (গুরুভার লাঠি); দ্বিতীয়ে কপাট-যন্ত্র (কৌটিল্যে ইহার নাম বিশ্বাসঘাতী, এমন নির্মিত যে, শত্রু সে কপাটপথে আসিলে কপাট পরিখার জলে নিমগ্ন হইত। ডাকাতের দেশে দুতলা বাড়ীর উপরের সিঁড়িতে এইরূপ কপাট-যন্ত্র থাকিত, ডাকাত পরিখার জলে না পড়িয়া উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার তলে পড়িয়া যাইত); তৃতীয় প্রাকারে লগুড় ও প্রস্তর গোলক; চতুর্থে সর্প ও যোদ্ধা; পঞ্চমে সর্জরস (ধূনা) ও ধূলিপটল; ষষ্ঠে মুসল আলাত নারাচ তোমর খড়্গ পরশু ও শতঘ্নী; সপ্তমে মোম ও মুদ্গর (এখানে মোম কেন, বুঝিতে পারিলাম না)।

ধনু দ্বারা যে অগ্নি-বাণ নিক্ষিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্নেয়াস্ত্র নামে আখ্যাত হইত। উপরে ব্রহ্মাস্ত্রের কর্ম দেখা গিয়াছে। আরও কয়েকটার দেখি। রামায়ণে (ল° ১০০), রাম ধনু দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কোনটা অগ্নিদীপ্তমুখ, কোনটা সূর্য-মুখ, গ্রহ-মুখ, নক্ষত্র-মুখ, মহোল্‌কামুখ। অগ্নিতে বাণের লৌহময় ফল উত্তপ্ত হইয়া এই এই রূপ দেখাইত। রামায়ণে (ল° ।১০১), রাবণের ধনু হইতে দীপ্তিমান্ চক্র (গোলাকার বলিয়া নাম 'সৌরাস্ত্র') নির্গত হইতে লাগিল। রাবণের অষ্টঘণ্টাযুক্ত ও সতেজে দীপ্যমান শক্তি জ্বলিয়া উঠিল এবং লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে নিমগ্ন হইল। মৎস্যপুরাণে (১৫০ অঃ) কুবের কার্মুকে দিব্য গারুড়বাণ সন্ধান করিলেন। তাহাঁর কার্মুক হইতে প্রথমে ধূমরাশি অনন্তর কোটি কোটি প্রজ্বলিত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। (১৫৩ অঃ), আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা শরীর রথ সারথি জ্বলিয়া উঠিল, ঐষিকাস্ত্র জ্বলিত হইয়া উঠিল ইত্যাদি।

কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত অন্য বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারুণাস্ত্র দ্বারা জলধারা পড়িত, বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা মেঘ (ধূম?) নিরাকৃত হইত। এ সকল অস্ত্রের নির্ম্মাণ অজ্ঞাত; এই হেতু মনে হয় কবি-কল্পনা। কিন্তু কৌটিল্য পড়িলে সে ভ্রম থাকে না। ইহাতে পর্জন্যক নামে

এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেটি স্থির যন্ত্র, এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। ইহাকে জলপূর্ণ করিয়া প্রাকারে রাখা হইত, বোধ হয়, শত্রু আসিলে নলপথে জল গিয়া তাহাকে প্লাবিত করিত। কবির অত্যুক্তি এই টুকু যে, ধনুদ্বারা এত জল প্রেরিত হইতে পারে না। এইরূপ বায়ব্যাস্ত্র নিশ্চয় ক্ষুদ্রাকার। কৌটিল্য পড়িলে সম্মোহন বাণেও অবিশ্বাস থাকে না। তৎকালে বম্‌ও ছিল, কিন্তু তাহাতে বারুদ থাকিত না। অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা নয়।

যে কালের কথা হইতেছে, মোটামুটি দ্বিতীয় খ্রীষ্ট-শতাব্দ পর্য্যন্ত, বারুদের কোন চিহ্ন পাই না। হরিবংশে না, মার্কণ্ডেয় পুরাণেও না। আমার বিশ্বাস, বারুদের উৎপত্তি এই দেশে, চীনে কদাপি নয়, পারস্যেও নয়। বন্দুক ও কামানের উদ্‌ভাবনাও এই দেশে হইয়াছিল, বোধ হয়, সপ্তম খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্ব্বে নয়। প্রাচীন ধনুর্ব্বেদের অঙ্গ নয় বলিয়া এখানে এ বিষয় আলোচনায় বিরত হইলাম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বঙ্গের পল্লীগীতিকা

১। ঐতিহাসিক গান

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যভাগবত বিরচিত হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—সে সময়ে লোকেরা সারারাত্রি জাগিয়া মনসা দেবীর ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল গান করিত, এবং যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গের গীত সর্ব্বত্র গীত হইত। এইরূপ আমোদ-প্রমোদকে বৃন্দাবন অতি অসার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এইরূপ জগতের ব্যর্থ কাজে যায়।"

কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বহু গীতি কথা দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল, তাহার উল্লেখ আমরা নানাবিধ প্রাচীন গাথা ও তাম্র শাসনে পাইতেছি। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' এবং 'ধানভান্‌তে মহীপালের গীত' এই দুইরূপ প্রবাদই প্রাচীনদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ শিবের গীতও অতি প্রাচীন; এই শিবগীতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটী প্রমাণ এই যে—প্রাচীন প্রায় সমস্ত গানেরই আরম্ভ শিবের গান দিয়া,—কি মনসামঙ্গল, কি চণ্ডীমঙ্গল সমস্ত কাব্যেরই গোড়ায়ই শিবের গান। এ পর্য্যন্ত প্রায় শতাবধি মনসামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে,—তাহার প্রত্যেকেরই মুখবন্ধ শিবের গানে। গোরক্ষ-বিজয় এবং শূন্যপুরাণেও শিবের গানের অংশ-বিশেষ দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত কাব্যই শিবের গানে আরব্ধ হইয়াছে;—ইহা ছাড়া রামেশ্বরী শিবায়ণখানিতো স্পষ্টই একটী অতি প্রাচীন ছড়া ভাঙ্গিয়া বিরচিত হইয়াছে। আমার নিকট সুপ্রাচীন শিবের ছড়া কতকগুলি আছে। এই শিবের ছড়াগুলি যে খুবই প্রাচীন,—তাহার প্রমাণ ছড়াগুলির ভিতরেই আছে। প্রাচীন গাথা-বর্ণিত শিবের একবারে গ্রাম্য দিগ্বসন মূর্ত্তি। বাঙ্গালা-ভাষার উপর পরবর্ত্তী কালে যে সংস্কৃতের ঢেউ চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে এই ভাষা পুষ্প-পল্লবশালিনী, বহু সমৃদ্ধিময়ী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শিবের ছড়ার ভাবে কি ভাষায় সে সমৃদ্ধির চিহ্ন মাত্র নাই। রামেশ্বরী শিবায়ণে শিবের চাষার বৃত্তি, চাষার নীতি-জ্ঞান ও তাহার ভাষা অমার্জ্জিত প্রাকৃত। এমন কি, এত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত ভারতচন্দ্রও শিবকে যে মূর্ত্তিতে আনিয়াছেন, তাহার ভাষা ভুজঙ্গ-প্রয়াতাদি

ছন্দে সাজাইলেও শিবকে তিনি একটা বুড় সাপুড়ে ও হীন ভিক্ষুকের বেশেই উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন ছড়ায় শিব কাইস্তে হস্তে ক্ষেত নিংড়াইতেছেন, আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিতেছেন, ইন্দ্রের নিকট ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও বলদ বাঁধা দিয়া এক খণ্ড ভূমি ইজারা লইতেছেন এবং ত্রিশূলের লৌহ ফলক কামারের কাছে দিয়া লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত করিতেছেন। ক্ষেতে জোঁক ও পোকার উপদ্রব হইলে তিনি চূণ লাগাইয়া সেগুলি ধ্বংস করেন; এবং রাত্রিকালে 'বাঘের মত বুড় শিব' সজাগ থাকিয়া ক্ষেতের পাহারা দেন। এই চাষ উপলক্ষে বাঙ্গালার ক্ষেতের সমস্ত শস্য ও আগাছার নাম শিবায়ণে পাওয়া যাইতেছে। পুস্তকখানি একখানি কৃষি বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের মতই হইয়াছে। শেষের দিক্‌টায় শিবের দাম্পত্য নীতি যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার সহিত শিবানীর যে ঝগড়া বর্ণিত হইয়াছে—তাহা বঙ্গভাষার গোড়াকার চিত্র,—সমস্ত শিবের ছড়ায়েই ইহা অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যসমূহে শিবের বর্ণনা এক সময়ে অপরিহার্য্য ছিল, গ্রন্থকারেরা উহা কাব্যের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট করিয়া একটা সুপ্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাজন্যবর্গের গান দেশময় প্রচলিত ছিল। এ পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন কাল হইতে যে সকল রাজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, তন্মধ্যে ত্রিপুরার রাজকুল বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইঁহাদের রীতিমত ইতিহাস আছে,—অবশ্য এই ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ কতকটা অলৌকিক সংস্কারে জড়িত ও কল্পনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে 'রাজমালার' বিবরণ—ঐতিহাসিক তথ্য-পূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য। প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচিত এই বিবরণ পাঠ করা। ইহাতে রাজ-শাসন সংক্রান্ত নীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সামজিক অবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের যথাযথ বিবরণ আছে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী হইতে আমি এই ইতিহাসখানিকে বেশী মূল্যবান্ মনে করি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, বাঙ্গালার প্রত্যেক প্রাচীন রাজবংশের এই ভাবের ইতিহাস ছিল। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আলেখ্যের যেরূপ দ্রুতভাবে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে এক বংশের প্রভাব ধ্বংস করিয়া যখন ভিন্ন রাজার বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজমালায় আমরা 'লক্ষ্মণ-মালিকার' উল্লেখ পাইতেছি, এই লক্ষ্মণ-মালিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ইতিহাস—ইহা এখন বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত। নব ধর্ম্ম-প্রচারক ব্রাহ্মণের দল ভক্তি ও ঐশ্বরিক তত্ত্বের উপর জোর দিয়া লৌকিক ইতিহাসকে একবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এ জন্য সেই সকল প্রাচীন ইতিহাসের এখন চিহ্ন মাত্র নাই। যাঁহারা তাম্র

শাসনে কয়েক বিঘা জমি ব্রহ্মত্র সূত্রে দান করার উপলক্ষে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রাজ-সভায় ইতিহাস হইত না—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

শুধু পুস্তকাকারে মাত্র এই সকল ইতিহাস লিখিত হইত না; এই সকল বিবরণ পালাগান স্বরূপ রচিত হইয়া জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিত। বৃন্দাবন দাস ইহারই কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।" (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড)। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্রলিপিতে রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাঁহার সম্বন্ধে পল্লীগীতি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল—'গোপৈঃ সীম্নি বনচরৈর্ব্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানদৈঃ। লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং যস্যাকর্ণয়ংস্ত্রপা বিবলিতা নম্রং সদৈবাননং" (রাজা ধর্ম্মপাল গ্রামোপকণ্ঠে রাখাল বালকগণের মুখে ও বনবিহারী পর্য্যটকগণের গানে, পল্লীশিশুদের কণ্ঠে ধ্বনিত,—নাগরিক বণিক্‌দের মুখে মুখে প্রচারিত এবং ধনী ব্যক্তিগণের বিলাস উদ্যানে গৃহস্বামী কর্ত্তৃক শিক্ষিত পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগ-কাকলীতে অবিরত তাঁহার স্তবযুক্ত গ্রাম্যগীত শুনিয়া সলজ্জভাবে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।) মহীপালের বাণগড়ের তাম্রলিপিতে (১০ম শতাব্দী) মহারাজ রাজ্যপালের সম্বন্ধে,—এবং একমাত্র পুত্রকে ন্যায়ানুরোধে যিনি বিচার-পূর্ব্বক শূলে দিয়াছিলেন, সেই মহারাজা রামপালের (১১শ শতাব্দী) শুভ্র যশঃসম্বলিত পল্লীগীতিকার উল্লেখ আমরা "সেকশুভোদয়া" নামক গ্রন্থে পাইয়াছি। লক্ষ্মণমালিকা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (১২শ শতাব্দী)। রাজমালায় ত্রিপুররাজ ধন্য মাণিক্য (১৫৭৮ খ্রীঃ), তাঁহার প্রধান মহিষী কমলা দেবী এবং অমর মাণিক্য (১৫৭৯ খ্রীঃ) সম্বন্ধে বাঙ্গালা গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। লিখিত আছে,—ধন্য মাণিক্য ত্রিহুত হইতে নর্ত্তক ও গায়ক আনিয়া এই সমস্ত পল্লীগান অভিনয়-পূর্ব্বক গানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গীতিকা ২।৩শত বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। আমরা রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার মাতা ময়নামতী রাণীর গানের বহুসংখ্যক বিভিন্ন পালা প্রাপ্ত হইয়াছি (১২শ শতাব্দী)। ১০ম শতাব্দীর মহীপালের গান এখনও রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আমরা তাহার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। যে সমসের গাজি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দস্যুবৃত্তি করিয়া এত প্রবল হইয়াছিল যে, কিছু কালের জন্য ত্রিপুররাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং তথায় রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-সংযুক্ত একটী সুদীর্ঘ বাঙ্গালা

গীতি সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে শ্রীযুক্ত লুৎফুল খবির সাহেব প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজমালা গ্রন্থে এবং ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই গীতিকার উল্লেখ আছে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত পল্লীগীতিকা

এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪টী পালা গান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও ১০টী যন্ত্রস্থ। এই ৪৪টি গানের মধ্যে ঐতিহাসিক পালা ১৫টী।

(১) জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান, বার ভূঞার শ্রেষ্ঠ ইশা খাঁ।
(২) দেওয়ান মনুর খাঁ।
(৩) দেওয়ান ফিরোজ খাঁ।
(৪) সুসুঙ্গ দুর্গাপুরের রাণী কমলা দেবী।
(৫) রাজা রঘু।
(৬) চৌধুরীর লড়াই।
(৭) সুরৎ জামাল ও অধুয়া।
(৮) যুবরাজ শ্যাম রায়।
(৯) নিজাম ডাকাইত।
(১০) বার তীর্থের গান, রাজা ভগদত্ত।
(১১) দেওয়ান ভাবনা।
(১২) ডাকাইত মনসুর।
(১৩) হাতি খেদার গান।
(১৪) মণিপুরের লড়াই।
(১৫) সুজা-তনয়া।

এই গানগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক সংস্কার ও আজগুবি গল্প আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও যে সকল গান আছে, তাহাদেরও ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নহে। বর্ণিত বিষয়ের পারিপার্শ্বিক ঘটনা,—সামাজিক রীতিনীতি,—যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা প্রভৃতি সমস্ত কাহিনীতেই তদানীন্তন ইতিহাসের প্রচুর আলো পড়িয়াছে ; এমন কি, অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা—ঐতিহাসিক চরিত্র, এবং তাহাদের সম্বন্ধে আখ্যায়িকা মূলতঃ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐতিহ্যপূর্ণ তত্ত্বগুলি ময়নামতীর গান অথবা গোরক্ষবিজয়ের ন্যায় নহে। সেই শ্রেণীর গানে আজগুবি

অংশই বেশী। কিন্তু এই সকল পালা গান মানুষী গণ্ডীর বাহিরে প্রায়ই যায় নাই, স্থানে স্থানে গ্রাম্য কবিরা কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন এবং কোথাও বা এমন সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার ঐতিহাসিক নিক্তির ওজন ঠিক যথাযথ হয় নাই। কিন্তু শিলালিপি ও তাম্রশাসনও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ? সেখানেও রাজসভার পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা-বহুল অবিশ্বাস্য উপকরণের সমাবেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সামান্য সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও একথা বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশের যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তিনি এই গানগুলি হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষেও ইহাদিগের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে আমরা যেন তাহাদের মূর্ত্তি চোখের সামনে দেখিতে পাই—লালরঙ্গের কুর্ত্তি পরা, মাথায় টুপি, এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে দূরবীণ লইয়া ইহারা ছোট ছোট ডিঙ্গায় কি ভাবে সমুদ্রে তীরবৎ ছুটিয়া বেড়াইত এবং লুট-পাট করিবার যোগ্য পান্‌সি ও সাম্পনির উপর চিলের মত ছোঁ মারিয়া আসিয়া পড়িত, কি ভাবে তাহারা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ধনবান্ বণিক্ ও বণিক্‌সীমন্তিনীদের হাতের তলা ছেঁদা করিয়া তন্মধ্যে দড়ি চালাইয়া তাঁহাদিগকে দাস-দাসীরূপে মাদ্রাজের উপকূলে বিক্রয় করিত,— সমুদ্রে ঝড় উঠিলে উন্মত্ত ঢেউগুলির তাণ্ডব নৃত্যের ফেরে পড়িয়া নাবিকেরা কিরূপ বিপন্ন হইত, বাঙ্গালী মাঝিরা শুক্‌নো মাছের পশারা লইয়া কিরূপে সমুদ্রের দূর দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিত,—নূতন চরায় তাহারা কিরূপে বসতি স্থাপন করিয়া অল্পকালের মধ্যে তাহা নানা তরু, নানা শস্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিত, তাহা কবিরা অতি নিপুণ তুলিকায় চিত্রালেখ্যের মত স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়াছেন, সেই সকল চিত্রের এক দিকে অতুলনীয় কবিত্ব-সম্পদ্, অপর দিকে সারবান্ ইতিকথা। আমরা আরাঞ্জিবের ভ্রাতা সাহ সুজা ও তাঁহার কন্যার দুঃখময় শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু পালা গান সংগ্রহ করিয়াছি।

এই ক্ষেত্র এত বড় যে, এখন যদি এই সংগ্রহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের এক অমূল্য ধন-ভাণ্ডার লুপ্ত হইবে। গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর সামান্য কিছু সাহায্য করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দেশে এতগুলি ধনকুবের থাকিতে আমাদের কয়েকটী গীতিসংগ্রাহকের বেতন জুটিবে না,—এই যদি আমাদের দেশপ্রীতি হয়, তবে "আমার দেশ" "আমার দেশ" বলিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইলে যে আমরা স্বরাজের দিকে বেশী অগ্রসর হইতে পারিব, এমন তো মনে হয় না। কয়েকটী সংগ্রাহক গত কয়েক বৎসর প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া যে অসামান্য দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাঁহাদের বহুদর্শিতা ও কর্ম্মপটুতার ফল হারাইব। তারপর এই গীতিগুলির কাব্য-কথা। ইহাতে যে

সুপ্রচুর কবিত্বের ছটা আছে, যাহা দেখিয়া বিদেশী পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা লইয়া আমাদের কতকটা আলোচনা করা প্রয়োজনীয়।

চণ্ডীদাস হইতে কৃত্তিবাস এবং কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্র—অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোটামুটি ধরিলে, যে সাহিত্য বঙ্গদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। কিন্তু পল্লীগীতিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। সময় হিসাবে আমরা এই গীতিকাগুলির মধ্যে খুব প্রাচীন নমুনা পাই না,—কতকগুলি গীতিকা চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কিংবা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করি; কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগীতিকাই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর, কতকগুলি আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর—এমন কি, তাহা হইতেও আধুনিক। কিন্তু কতকগুলি গীতি আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর। তাহাদের ভাষা এখন আর তত প্রাচীন নাই, যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়া তাহা বর্ত্তমান আকারে আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গীত-কথা ও পল্লী-গীতি—প্রাচীনই হউক কিংবা অপেক্ষাকৃত আধুনিকই হউক—ইহারা সকলেই এক ছাঁচে ঢালা—আমরা "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য" বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, এই পল্লী-সাহিত্য তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র সামগ্রী।

এই পল্লী-সাহিত্যের আদর্শ কি, তাহা জানিতে চাহিলে বঙ্গদেশের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করিব বলিয়া আমরা এই প্রস্তাবটীর সূচনায় বলিয়া রাখিয়াছি।

৩। নব ব্রাহ্মণ্য ও প্রাচীন আদর্শ

কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় বঙ্গীয় সমাজে হিন্দুর আদর্শ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রথমতঃ যৌন-প্রেম ও দাম্পত্য লইয়া এই নিবন্ধের সূচনা করা যা'ক্। আমরা দেবভাষায় দাম্পত্য ও যৌন-প্রেমের যে আকৃতি দেখিয়াছি, নবোত্থিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সেই রূপটী স্বীকার করে নাই।

সাবিত্রীই হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ—কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে বয়স্কা হইয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা মদ্ররাজ অশ্বপতি কন্যার যৌবনাগমে ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রীকে পাত্র মনোনীত করিবার জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। দময়ন্তী হংস-দূত দ্বারা নলরাজার নিকট প্রেম-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। রুক্মিণী কৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার সহিত গোপনে অভিযান করিয়াছিলেন। সুভদ্রাকে পূর্ণ যুবতী দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার

প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন। কাদম্বরীও পূর্ণবয়স্কা হইয়া অনুরাগের পথে পা দিয়াছিলেন। ইঁহারাই হিন্দু সমাজের আদর্শ সতী ও কুললক্ষ্মী—ইঁহাদের কেহই খুকী ছিলেন না; তবে বঙ্গসমাজে "গৌরীদান" প্রথা কোথা হইতে আসিল? কালিদাস যদি সত্যই হিন্দু সমাজের ভূষণ ও কবিকুলশিরোমণি হইয়া থাকেন, তবে তিনি কুমারসম্ভবে গৌরীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা তো একবারেই গৌরীদান সমর্থন করে না; গৌরী যখন তপস্যা করেন, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী। তাহা না হইলে কামের পঞ্চবাণ খাইয়া হঠাৎ গৌরীর মুখপদ্মের দিকে চাহিয়া শিবের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল কেন? কপট সন্ন্যাসীর বেশে শিব যখন বাক্‌ছলা দ্বারা গৌরীর পরীক্ষা করেন, তখন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় তিনি পরিপূর্ণ যৌবন-গরিমায় ঢল ঢল। স্বয়ং গৌরীর যখন এই অবস্থা, তখন "গৌরীদান" রূপ আকাশকুসুম কোথা হইতে আসিল? মোট কথা, নব ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি "অষ্টমে তু ভবেৎ গৌরী" প্রভৃতি নূতন পাঠ শিখাইয়া হিন্দু ধর্ম্মের যে আকারটী দিয়াছেন, প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় না। পল্লী-গীতিকার সমস্ত স্ত্রীচরিত্রই সেই প্রাচীন আদর্শের অনুগামী। তাঁহাদের প্রত্যেকেই পূর্ণবয়স্কা হইয়া বিবাহ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের একাংশের ভিত্তি ছিল পল্লীগীতিকা। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-প্রভাবযুক্ত কবিরা প্রাচীন গাথাগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। বেহুলা যৌবনকালেই লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করেন। পদ্মিনী নারীর যে যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহাতে 'নৃত্যগীতানুরক্তি' একটা প্রধান। বেহুলার নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে 'নাচুনী' আখ্যা দিয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রে স্বামী তাঁহার আলিঙ্গন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন এবং অব্যবহিত পরেই ভেলায় ভাসমানা যুবতী বেহুলার সৌন্দর্য্য দেখিয়া গাঙ্গুড় নদীর কূলে ধনা, মনা, গোদা এবং এক কবিরাজ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। খুল্লনা চতুর্দ্দশ বৎসরে ধনপতির সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, এবং উক্ত বণিক্ খুল্লনার বাক্‌চাতুরী ও যৌবনের রূপ-মাধুরিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এ কথা কেহ বলিতে পারেন, পরবর্ত্তী কবিরা যখন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল নূতন করিয়া লেখেন, তখন বেহুলার ও খুল্লনার বয়স কম করিয়া দিলেন না কেন? এ কথাটা আপনারা সকলেই জানেন যে, উক্ত দুই কাব্য মনসাদেবী ও চণ্ডীদেবীর মন্দিরে প্রাচীন কাল হইতে বৎসর বৎসর গীত হইত, সুতরাং বহু পূর্ব্বকাল হইতে কাব্যের বিষয়টী জনসাধারণের জানা ছিল। যদিও সেই প্রাচীন কাব্যের উপর নূতন শব্দচ্ছটা দিয়া এবং কোন কোন নগণ্য অংশের উন্নতিকল্পে তুলি চালাইয়া পরবর্ত্তী কবিরা পূর্ব্ব কাব্যের শোধন করিতেন—তাঁহারা মূল

বিষয়ের এমন কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না, যাহা লোকেরা কাব্যের অঙ্গহানি এবং তজ্জন্য মন্দিরে গাওয়ার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে পারিত। বেহুলার দেব-সভায় নৃত্য মনসামঙ্গল কাব্যের একটা মূল ঘটনা, বেহুলা তাঁহার মাতা অমলার নিষেধ সত্ত্বেও লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে বিবাহে আগ্রহান্বিতা ছিলেন, এটীও আর একটী মূল ঘটনা। কবিরা এতদুভয় ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। খুল্লনা ক্রীড়াচ্ছলে ধনপতি সদাগরের পায়রাটী হাতে পাইয়া যে সকল রহস্য করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীমঙ্গলের একটা অতি উপভোগ্য অংশ, তাহা বাদ দিলে কবি কখনই শ্রোতৃবর্গের নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। ধনপতির এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও খুল্লনার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় দারস্বরূপ গ্রহণ করেন—ইহাও কাব্যের একটা অপরিহার্য্য প্রধান অংশ, এ জন্য তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্তু কবি মুকুন্দরাম ছিলেন নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একজন পাণ্ডা। খুল্লনা যে বয়স্কা হইয়া বিবাহিতা হন, এ কথাটা প্রাচীন গল্পের খাতিরে তিনি রক্ষা করিলেও, খুল্লনার পিতা লক্ষপতিকে জনার্দ্দন ঘটকের মুখ দিয়া বজ্র-নির্ঘোষে নূতন স্মৃতির মর্ম্ম শুনাইয়া দিয়াছিলেন। পুরোহিত মহাশয় লক্ষপতির এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া সাত বৎসর কিংবা আট বৎসর—জোর দশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ চলিতে পারে, ইহার বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েকে বিবাহ না দেওয়া যে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে এক দীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহাই হইল নূতন ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি—সংস্কৃত প্রভাবাপন্ন বঙ্গসাহিত্যের ইহাই মূল সুর। কিন্তু পল্লীগীতিকার নায়ক-নায়িকারা পূর্ব্ব যুগের রীতি ও আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু বয়স্থাদের বিবাহের আলেখ্য দেন নাই—বিবাহের পূর্ব্বে রীতিমত পূর্ব্বরাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন—নায়িকারা 'ইচ্ছাবর' (স্বয়ম্বর) প্রথার অনুগমন করিতেন। যেখানে পিতামাতার মতের সঙ্গে তাঁহাদের মনোনয়নের সঙ্গতি হইত না, সেখানে কুমারীরা নিজের ইচ্ছার অমর্য্যাদা করিয়া কখনই শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষ সাজিয়া অভিভাবকের মনোনীত বরের অঙ্কশায়িনী হইতেন না। এ বিষয়ে পল্লীগীতিকার নায়িকারা সতী-চূড়ামণি সাবিত্রীর পন্থার অনুসরণ করিতেন। সাবিত্রীকে যখন নারদ ও দ্যুমৎসেন স্বল্পায়ু সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে নিষেধ করেন, তখন সাধ্বী দীপ্ত তেজের সহিত গ্রীবা হেলাইয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন,—"ইনি স্বল্পায়ুই হউন বা দীর্ঘায়ুই হউন—আপনি আমাকে স্বয়ং বর মনোনয়ন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন—এবং আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আমি সত্যবান্‌কে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছি, ইঁহাকে ত্যাগ করিলে আমি মনে মনে দ্বিচারিণী হইব। আমি কখনই আমার

মনোনয়নের অন্যথা করিব না।" পল্লীগীতির চন্দ্রাবতী—অতি নিষ্ঠাপূর্ণ দেবচরিত্র, আচারপূত ব্রাহ্মণ-কন্যা,—তিনি জয়চন্দ্র নামক এক যুবককে মনে মনে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক বিবাহের পূর্ব্বদিন এক মুসলমান রমণীর রূপ-মুগ্ধ হইয়া মুসলমান হইল, তখন চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস তাঁহাকে তাঁহার পাণিপ্রার্থী যুবকের মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিনয়, লজ্জা ও নিষ্ঠার আদর্শ চন্দ্রাবতী সে দিন সমস্ত লজ্জাশীলতা ও কুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—"একবার কোন লক্ষ্যে শর ছাড়িয়া দিলে তাহা আর ফিরান যায় না, আমি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে যখন বিবাহ হইল না—তখন আর পরিণয় হইবে না, আমি আজন্ম কুমারী থাকিব।" শুধু চন্দ্রাবতী নহেন, ভেলুয়া ও সোনাই তাঁহাদের অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় স্বীয় মনোনীত বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া পালাগানের প্রায় প্রত্যেকটী নায়িকাই বিবাহের পূর্ব্বে স্বীয় স্বামী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইঁহাদের বিনয় ও লজ্জা আদর্শ কুললললনার মত ;—কিন্তু ইঁহাদের দাম্পত্যের পণ ও অভিপ্রায়ের তেজ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত বিশ্ব-বিশ্রুত রমণীদের মতই অনিবার্য্য ও নির্ভীক। এই বিষয়ে এই সকল পালাগানের কবিরা কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবির জ্ঞাতি—তাঁহারা কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের কেহ নহেন। এই পল্লীকবিদের একজন কহিয়াছেন,—"গ্রীষ্মকালে ডাবের জল মধুর, বিরহের পর মিলন মধুরতর, কিন্তু রমণী যাঁহাকে মনোনয়ন করেন, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার সৌভাগ্য যদি তাঁহার হয়, তবে তাহা মধুরতম—জগতে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ কেহ কল্পনা করিতে পারে না।"

এই নির্ভীক ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত-শূন্য একব্রত প্রেম, যাহার উপর পৌরোহিত্যের কোন ছাপ নাই, যাহা আঁচল ও কোচার বন্ধনের প্রতীক্ষা করে না, যাহা বিবাহের বহিরাড়ম্বরের ঘটাশূন্য হইয়াও প্রকৃত বিবাহ ও দাম্পত্যের পূর্ণ আদর্শ রক্ষা করিয়াছে—যাহাতে কৃত্রিমতার লবলেশ নাই, সতীত্বের মুখোস নাই অথচ যাহা ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় নিশ্চিত, চন্দ্র-সূর্য্য ও দিবা-রাত্রির ন্যায় সত্য, যাহার মহিমার নিকট বিপৎ ও সম্পৎ তুল্যরূপেই অগ্রাহ্য—বঙ্গলক্ষ্মীর হৃদয়ের অন্তঃপুরের এই নিভৃত প্রেম—যাহা ফুলসম নির্ম্মল, বজ্রবৎ অচ্ছেদ্য ও মধুচক্রের ন্যায় মধুর,—তাহা যে পরিণয়ের ভিত্তি, সেই পরিণয়ের চিত্র যে কত উজ্জ্বল ও কিরূপ তীব্র ভাবে দীপ্ত, তাহার নিদর্শন পল্লীগীতিকায় যেরূপভাবে পাইতেছি, মনে হয়, তাহার তুলনা সাহিত্যে বিরল ও দুর্ল্লভ।

(৪) ব্যভিচারী প্রেম

এদিকে ব্যভিচারী প্রেমের কয়েকটী পালা আমরা পাইয়াছি। 'ধোপার পাট'-এর কাঞ্চনমালা ও শ্যামরায়, এই দুইটী পালা পল্লীগীতিরত্নহারের মধ্যমণি-স্বরূপ। পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও তাহার প্রতিদান—এই দুইটী গীতিকায় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমস্ত স্মৃতির বিধানের মাথা ডিঙ্গাইয়া নিজের হিমাদ্রি-উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেছে। বিষয়টী গুরুতরভাবে নিন্দনীয়; সুতরাং নিন্দা করিবার কোন সুযোগ পাইবার জন্য সংস্কারবশতঃ পাঠকের হয়ত বা একটা ইচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু শ্যামরায়ের প্রত্যেকটী ছত্র ঘাঁটিয়া তো আমরা তাহার কোন ছিদ্র খুঁজিয়া পাইলাম না। এই নির্ম্মল মণিটী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল—ইহার কোন একটী স্থানে একটা দাগ বা রেখা পাইলাম না। প্রত্যেক ছত্রে পাপের কথা অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারবশতঃ আমরা যাহাকে পাপ বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যেকটী ছত্র যেন অপাপ-বিদ্ধ। কই? পাপ বলিয়া চারিদিকে যে হৈ চৈ, চীৎকার—সেই পাপের কিছু তো এই গীতিকাব্যে পাইলাম না!—চোরের পিছন পিছন গেলাম, পরস্বাপহারক চোরের দর্শন মিলিল, কিন্তু যেন সাধু দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সংস্কার বলিল 'ছিঃ ছিঃ', সমাজ বলিল 'ছিঃ ছিঃ'। আদালত বসিয়া গেল, শাস্তি—কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইল। সেই শাস্তি শাস্ত্র-সঙ্গত; বিচারককেই বা দোষ দিব কিসে? সেরূপ শাস্তি না দিলে যে মানুষের সমাজ টিঁকে না; তবুও মন বলিল, "যাহাকে শাস্তি দিলে, সে যে দেবতা। সে যে মনের মস্ত বড় একটা ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া গেল, সে যে সমুদ্রমন্থন-লব্ধ সুধার ভাণ্ড দেখাইয়া গেল, যে অমৃত খাইলে লোক অমর হয়, সেই অমৃত দেখাইয়া গেল, ইহার শাস্তি হইল কেন? যাঁহাকে মাথায় রাখিবে, তাঁহাকে পায়ে দলিতে চাও কেন?" শত শত শ্লোক পড়িয়া শুনাইলে—তবু ত মন বুঝিল না। মন ঘাড় নাড়িয়া শত বার বলিল,—"একটুকুও বুঝিলাম না— পারি তো যিনি সমস্ত বিধানের বিধাতা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

কবি উপসংহারে একটা কথা বলিলেন, তাহাই মনে লাগিল—'ভাই, প্রেমই জীবনের সার বস্তু। রোগ, শোক, দারিদ্র্য-দুঃখ, এমন কি মৃত্যু—এ সকল সহ্য করিয়াও যে প্রেম কি তাহা বুঝিয়াছে—তাহারই জীবন সার্থক। অর্থ, সম্পত্তি, স্বগণ, আশার অতিরিক্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাংসারিক সফলতা—এ সমস্তই যে পাইয়াছে— অথচ প্রেম যে পায় নাই—তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে।'

পল্লীগীতিকাগুলি এই ভাবে—সমস্ত সামাজিকতা, সমস্ত সংস্কারের ঊর্দ্ধে আমাদিগকে লইয়া গিয়া এমন সকল কথা শুনাইয়া দিতেছে, যাহা নারদের বীণায় ঝঙ্কৃত স্বর্গ-সংগীত;

সে সুর অপার্থিব অত্যাশ্চর্য্য,—তাহা স্মৃতির উচ্ছিষ্ট নহে, কাব্যের শতবার পড়া পাঠ্য-নীতির আবৃত্তি নহে। নিরক্ষর কবিরা মহীয়সী শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতির নিজ মুখের উক্তি শুনিয়া তাহাই লিখিয়াছেন,— তাহা সহজে পাওয়া হইলেও জগতে এমন দুর্ল্লভ জিনিষ আর নাই। আমাদের এই দেবভাষার রীতি-শাসিত, সংস্কৃতের বেড়ী-পরা বঙ্গসাহিত্যে একান্ত নৈসর্গিক এবং নির্ভীক এই সাহিত্যের উদ্ভব কিসে হইল, তাহাই বিচার্য্য।

(৫) পূর্ব্বময়মনসিংহের ভিন্ন আদর্শ

সকলেই অবগত আছেন,—এই নূতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম,—যাহার পাণ্ডা ছিলেন কনোজাগত ব্রাহ্মণগণ,—তাহার আশ্রয়-তরু ছিলেন বাঙ্গালার সেন-রাজবংশ। সেনদের যতটা অধিকার ছিল, তাহারই মধ্যে কনোজের এই নব হিন্দুধর্ম্মের বীজ বিশেষরূপ ফলবন্ত হইয়াছিল। যেখানে সেনেরা যাইতে পারেন নাই, সেই সকল দেশে সাবেকী হিন্দুধর্ম্ম বিরাজ করিতেছিল।

এই পালাগানের পাঠকেরা অবশ্যই জানেন, ময়মনসিংহ—বিশেষ পূর্ব্বময়মনসিংহ হইতেই এই গানগুলির অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বময়মনসিংহ বহুকাল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এক সময় (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে) গুপ্ত সম্রাটের অধীন ছিল। পালদিগের সময় ঐ রাজ্য নামে-মাত্র তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু পাল রাজাদের প্রভাব কমিয়া আসিলে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর (কামরূপ) সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু কামরূপের শাসন ক্রমে শিথিল হওয়াতে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের দুর্গম নদনদী ও হাওরসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশের বন্ধনমুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতাগণ নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এই সময় সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ময়মনসিংহ দখল করিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন সম্রাট্‌দের প্রবল বাহিনী শীতকালে উক্ত দেশে যে বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া আসিতেন, বর্ষা ঋতুতে তাহার লব-লেশ সে স্থানে দৃষ্ট হইত না। এই বর্ষা কালে দুর্দ্দান্ত বেগে কংশ, ধনু, ভৈরব উদগ্র তরঙ্গমালা লইয়া পর্ব্বতে, কন্দরে খেলা করিতে থাকিত, তখন সেনরাজগণের বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িত। তদ্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত পাহাড়ের লোকেরা বন্যার মত উদ্দাম প্রবাহে কোথা হইতে আসিয়া কোন্ গিরি-গুহায় লুকাইয়া সম্রাট্‌-সৈন্য ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিত,— তাহা বিদেশী শত্রুরা জানিতে পারিত না। কাষ্ঠবিড়ালের আকস্মিক আগম-নির্গমের ন্যায় এই দুর্গম রাজ্যের অধিবাসীদের ক্ষিপ্র-কারিতা ও বিচরণ-কৌশলের সঙ্গে সেনরাজগণ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি,

বল্লালের শত্রুরা – তাঁহার অধিকার হইতে পলাইয়া পূর্ব্বময়মনসিংহের নিভৃত কন্দরে আশ্রয় লইয়া নিরাপদ্ হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকটী উদাহরণ আমরা পাইয়াছি।

এই পার্ব্বত্য ভূমির অধিবাসীরা ছিলেন আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মিলন-সম্ভূত। কিন্তু ইঁহারা কামরূপের অধীন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আর্য্য-সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সচরাচর হাজাং, কোচ এবং রাজবংশী নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্বময়মনসিংহে ইহাদের শাসন-কেন্দ্র ছিল—সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, গড়জরিপা, সেরপুর, বোকাই-নগর, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থান। সেনরাজগণের প্রবর্ত্তিত নব হিন্দুধর্ম্ম এদেশে প্রবেশ করিতে পারিল না। এখানে কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ ও বাণ কবির চিন্তা ও আদর্শ জয় লাভ করিয়াছিল, গৌরীদানের অধ্যায়ের আমলে এই প্রদেশ পড়ে নাই। মহুয়া, মলুয়া, কমলা—ইঁহারা শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতির ভগিনী এবং এক লক্ষণাক্রান্ত,—ইঁহাদের সঙ্গে ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ-বর্ণিত উমার কোন সাদৃশ্য নাই।

সেনরাজগণের হাত এড়াইয়া আরও কয়েক শতাব্দী পরে এই দেশগুলি মুসলমানদের হাতে আসিয়া পড়ে। সুতরাং সেনেরা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও কৌলীন্যের আশ্রয়তরু ছিলেন, এই দেশে তাহার হাওয়া বহিতে পারে নাই। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচ-বংশীয় গারো নামক এক রাজা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সনেই উত্তর-পশ্চিম দেশাগত সোমেশ্বর সিংহ নামক এক বিক্রান্ত ব্রাহ্মণ-যুবক ঐ প্রদেশ অধিকার করেন, তদবধি সেই ব্রাহ্মণবংশই দুর্গাপুরে রাজত্ব করিতেছেন। সেরপুর দীলিপ সামন্ত নামক এক রাজার অধীন ছিল, তাঁহার গড়কে এখনও তদ্দেশবাসীরা 'গড় দীলিপা' অথবা 'গড় জরিপা' নামে অভিহিত করে। ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিস হুমায়ুন দীলিপ সামন্তকে নিহত করিয়া ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দেশ দখল করেন। জঙ্গলবাড়ীতে লক্ষ্মণ হাজরা নামক আর একজন দেশী অধিনায়ক রাজত্ব করিতেছিলেন; ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইসা খাঁ সহসা গভীর রজনীতে তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া অতর্কিত ভাবে লক্ষ্মণ হাজরার রাজত্ব অধিকার করেন। লক্ষ্মণ হাজরা ও তাঁহার ভ্রাতা রাম হাজরা কোথায় পলাইয়া যান, তাহা জানা যায় নাই। এই ভাবে মদনপুর, বোকাই নগর, কালিয়াজুরী প্রভৃতি প্রদেশও ময়মনসিংহের আদিম অধিনায়কদের হাত হইতে মুসলমানদিগের হস্তগত হয়।

সুতরাং বহুকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বময়মনসিংহ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, এই দেশ বহুদিন নবব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতাপ তাঁহাদের গৃহের সীমানা হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। এ জন্য ময়মনসিংহে 'বন্দ্যোপাধ্যায়','মুখোপাধ্যায়', 'গঙ্গোপাধ্যায়', ও 'চট্টোপাধ্যায়' নাই। শ্রীহট্ট জেলার লাউড়ের ব্রাহ্মণগণের উপাধি ছিল দত্ত, ধর, কর। তথাকার কৃষ্ণদাস নামক জনৈক

ব্রাহ্মণ রাজার লিখিত "বাল্যলীলাসূত্র" নামক পুস্তকে আমরা এ কথার সমর্থন পাইতেছি। ময়মনসিংহ-দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজাদের উপাধি 'সিংহ'। সেই দেশে চক্রবর্ত্তীরাই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন। কায়স্থদের মধ্যে দত্তরাই প্রাচীন—ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের আমল তথায় নাই। অবশ্য আধুনিক সময়ে বঙ্গদেশ হইতে কৌলীন্যের হাওয়া তথায় ঢুকিয়া প্রাচীন ইতিহাসের পত্রগুলি উলট-পালট করিয়া দিতেছে। এমন কি, পল্লীগীতিকাগুলিতে বাল্য বিবাহের কথা না থাকিলেও এখন গৌরীদানের পাণ্ডা হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গের অন্যান্য দেশের মত এই প্রদেশে নব্য সংস্কারের আমদানী করিতেছেন। বঙ্গদেশের স্মৃতিশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সেনরাজাদের অধিকারের বহির্ভূত স্থানে সে নিষেধবাণী সম্প্রতি মাত্র উচ্চারিত হইতেছে। পালাগানগুলিতে সমুদ্র ও বড় বড় নদীর উপর গমনাগমনকালে পল্লীকবিগণ ঝড়ের যে উপদ্রব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চাক্ষুষ ঘটনার ন্যায় জীবন্ত।

(৬) নায়িকাদের বিশেষত্ব

বস্তুতঃ, এই পল্লীগীতিগুলি আমাদিগকে এক নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। এ পথের পথ-ঘাট আলঙ্কারিকেরা কবিদের জন্য আগেই বাঁধিয়া রাখেন নাই। কবিরা প্রাচীন সংস্কারের কোন ধার ধারেন না। ইঁহারা কাব্যজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইঁহাদের নায়িকারা বীরবিক্রান্ত, অদ্ভুতকর্ম্মা, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে উচ্ছ্বসিত আনন্দময়ী; ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না, তাঁহারা নবনীত-কোমলা নহেন। তাঁহারা মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে, মন্ত্রিমণ্ডলীপূর্ণ রাজ-সভায় দাঁড়াইয়া নিজের প্রেমের কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না (কমলা)। ইঁহারা কখনও অশ্বারোহণে বহু ক্রোশ পাহাড়িয়া প্রদেশে গমনাগমন করিতে হয়রাণ হইয়া পড়েন না (মহুয়া)। ইঁহাদের সংযম এত বড়—যে অগ্নিগত প্রদাহে পাহাড়-পর্ব্বত ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়, ইঁহারা সেই অগ্নি বুকে লইয়া মৌন গাম্ভীর্য্যে বসিয়া থাকেন; অধর একটু বক্র হয় না; নিশ্বাসের গতি একটুকু চঞ্চল হইয়া হৃদয়-ব্যথার পরিচয় দেন না (চন্দ্রাবতী)। ইঁহারা এত নির্ভীক যে, যখন দুটী বড় বড় চোখ উৎকট-বীর্য্য আগুনের গোলার ন্যায় কপালে তুলিয়া যম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তখনও ইহাঁদের চক্ষু তাঁহার চক্ষুর আরক্তচ্ছটা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে ভয় পায় না।

সংস্কৃতের অলঙ্কার পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে; আজানুলম্বিত বাহু, গৃধিনী-কর্ণ, খগরাজ-নাসিকা, বিম্বাধর প্রভৃতি উপমা কৃষকেরা কোথায় পাইবে? রাজবাড়ীর এই সকল বহুমূল্য সাজ-সজ্জার কথা তাহারা জানে না। তাহারা এই সকল কবিত্বের বোঝা কাঁধে করিয়া কখনই পথে চলিতে জানে না। কিন্তু

রাজপ্রাসাদে যে মনের সন্ধান পাওয়া যায়, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে বোধ হয়, সেই মন জিনিষটীর তত্ত্ব বেশী পাওয়া যায়। কুঁড়ে ঘরে যে অনাবিল পবিত্রতা, সরলতা ও গুণের আদর আছে— রাজার বিরাট্ হর্ম্ম্যেও বোধ হয়, এই সকল গুণের তেমন সমাদর নাই। রাজারা উদ্যান-লতা দেখিয়া যে আনন্দ পান, চাষীরা বোধ হয় বন-লতা দেখিয়া তদপেক্ষা বেশী আনন্দ পায়। টবে বর্দ্ধিত ফুলের চারা যেন ধাত্রী-ক্রোড়ে শিশু। কিন্তু প্রকৃতির দৃশ্য-পটে ফুলের চারা যেন মাতৃকোলে শিশু। এই কৃষকগণের সাহিত্যে সদ্যোজাত পুষ্পের সমস্ত সুরভি দিয়া গড়া—মন ভুলাইবার পক্ষে ইহাদের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য যতটা শক্তিশালী, নানা ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কার-দৃপ্তা রাজসভার কবি-বর্ণিত নায়িকারা ততটা সমর্থ নহে।

(৭) বিদেশীয়দের মতামত

এই পল্লীগীতির অনেকগুলি অতুলনীয়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন,—"এই পল্লীগীতিগুলির মধ্যে যে সরলতা এবং ভাবের গভীরতা আছে, তাহা আশ্চর্য্য; কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্য, এই নিরক্ষর কবিদের অসামান্য শিল্পদক্ষতা।" মহুয়া, চন্দ্রাবতী, শ্যামরায় প্রভৃতি পালাগুলির মধ্যে কবিদের অসামান্য সংযম দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এত প্রখর যে, সকল দৃশ্য ও ঘটনা যে বিষয়টীকে কবিত্ব-গৌরবে উজ্জ্বল করিবার উপযোগী, ইঁহারা শুধু তাহাই গীতিকাগুলিতে দিয়াছেন; বাজে বক্তৃতা নাই, বাক্যপল্লব নাই; আখ্যানবস্তুর আদ্যন্ত বাহুল্যপূর্ণ বিবৃতি নাই; ঠিক যে অংশগুলি মানুষের মনে কবিত্বের ভাব রাখিয়া যায়— কবিরা তাহাই বাছিয়া লইয়াছেন। কোন কোন গীতিকা, যথা শ্যামরায়, এত সংক্ষিপ্ত যে, বারংবার না পড়িলে পাঠকের মনে হইতে পারে যে, কবি অনেকাংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন, এবং কাব্যটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নহে। সুদক্ষ মালী যেমন বাগানে ফুলের চারার পাশের আগাছা তুলিয়া ফুলগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখায় কিম্বা পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া শুধু ফুল দিয়া ফুল-হার প্রস্তুত করে—অসার ও কবিত্বহীন জিনিষগুলি তেমনি আখ্যায়িকা হইতে বাদ দিয়া যাহা সুন্দর, যাহা কৌতূহল-উদ্রেককারী, সেই সকল অংশ চূড়ান্ত সাহিত্যিক শিল্পের সঙ্গে পর পর সাজাইয়া দৃশ্যগুলি চোখের সম্মুখে আনিয়াছেন। গীতিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে, এই বর্জ্জননীতি দ্বারা গল্পাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, বরং আবর্জ্জনা-রহিত হইয়া আরো স্পষ্ট হইয়াছে। রোমাঁ রোলাঁ "দেওয়ানা মদিনা" পালাটীর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। রোটেনষ্টাইন

বলিয়াছেন,—"এই পালাগানের অপূর্ব্ব নারীচরিত্রগুলি অজন্তার নারী-চিত্রের প্রতিরূপ, ইহারা তাহাদেরই জাতি।" তিনি লিখিয়াছেন,—"সেই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, বৌদ্ধ জাতক ও গুহার চিত্রাবলীতে নারীচরিত্রের যে পবিত্র সৌন্দর্য্য পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়,—পল্লীগীতিকার নায়িকাগুলি দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস-বিশ্রুত নারী-চরিত্রের শুভ্র প্রতিষ্ঠা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে।" সিলভাঁ লেভি তো উচ্ছ্বসিত হৃদয় আবেগে বলিয়াছেন,—"ফরাসী দেশের শীতল হাওয়ায় বসিয়া ষড়্‌ঋতুর ক্রীড়াকানন, এই ভারতবর্ষের বসন্ত কালের শোভা তিনি এই সকল গীতিকায় উপভোগ করিয়াছেন।" অভিনব দাম্পত্যের বহু চিত্রে তিনি একবারে মসগুল হইয়াছেন। লর্ড রোনাল্ডশে তাঁহার লিখিত ভূমিকায় মহুয়ার নানা সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এবং এমেরিকান পণ্ডিত এলেন বলিয়াছেন,—"এই সকল গীতিকায় দেখা যায় যে, ভারতের লোক তাহাদের যৌবনের অফুরন্ত বীর্য্য এখনও হারায় নাই, নব উৎসাহে পৃথিবীতে যে সকল জাতি সভ্যতার পথে ধাবিত হইয়াছেন, সেই সকল জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সকলই এই ভারতীয় লোকের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান।" সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর এবং লেখিকা ম্যাডাম্ সিলা এণ্ডি্রু হগমান এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রগুলিকে সেক্সপীয়রের বিশ্ব-বিশ্রুত নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

(৮) সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বহু পণ্ডিত এই গাথাগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ইহাদের মূল্য এত বেশী করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা দরিদ্র বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে এগুলি একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া আছে। আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে কয়েকটী মাত্র পালার পরিচয় দিয়া যাইব। এ পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় চৌত্রিশটী পালা প্রকাশিত করিয়াছেন, আরও পাঁচটী যন্ত্রস্থ আছে।

প্রথম সংখ্যায় এই দশটি :—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ান মদিনা; দ্বিতীয় সংখ্যায় বারটী,—ধোপার পাট, মহিষাল বন্ধু, কাঞ্চনমালা, শান্তি, ভেলুয়া, রাণী কমলা, মাণিকতারা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নিজাম ডাকাইত, ইশাখাঁ মসনদালী, সুরৎজামাল ও আধুয়া, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। তৃতীয় সংখ্যায় বারটী—মাঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতি খেদা, আয়নাবিবি, কমল বণিক্, শ্যামরায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনীকীর্ত্তন, সুজাতনয়ার বিলাপ, বার তীর্থের গান, মণিপুরের

লড়াই। চতুর্থ সংখ্যায় পাঁচটী—রাজারঘু, নসর মালুম, নূরন্নেহা, শিলাদেবী, মুকুটরায়। এই গীতিকার সমস্তগুলির আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কিন্তু কয়েকটী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু মতামত দিয়া যাইব।

মহুয়া—এই গীতিকাটী সাহেবেরা বেশী পছন্দ করিয়াছেন। ডাঃ ক্র্যামরিস্ লিখিয়াছেন, "এই গীতিকা পড়িয়া কয়েক দিন রাত্রি আমি অন্য কোন চিন্তা করিতে পারি নাই, তখন আমার জ্বর, এই জ্বরের মধ্যে সর্ব্বদা গীতোক্ত নায়ক-নায়িকা যেন আমি জীবন্ত দেখিয়াছি। সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এমন সুন্দর গল্প আমি পড়ি নাই।"

মহুয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা, দৈবদোষে বেদের ঘরে লালিত পালিত ও বেদেদের খেলায়—নানারূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়াশীলতায় দীক্ষিত। পূর্ণ যৌবনে ব্রাহ্মণডাঙ্গার নবীন রাজকুমার নদের চাঁদের সঙ্গে দেখা হয়, তদবধি উভয়েই প্রেম-পাশে আবদ্ধ হয়। মহুয়ার ধর্ম্মপিতা হোমরা এই প্রেমের লক্ষণ টের পাইয়া মহুয়াকে লইয়া পলায়ন করে। যুবরাজ বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া মহুয়ার জন্য পাগলের মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। শেষে একদিন উঁহাদের দেখা হয়—মহুয়া ও নদের চাঁদ তখন পলায়ন করেন। পথে মহুয়ার রূপমুগ্ধ এক বণিক্ ও সন্ন্যাসীর হাতে ইঁহারা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন। কিন্তু তারপর কয়েকটী দিন প্রকৃতির নিভৃত কোণে কংস নদীর পুলিনে রক্তপুষ্পবঞ্জিত কুঞ্জে ইঁহারা অতি সুখে সময় কর্ত্তন করেন। কিন্তু পরিণামে হোমরার হাতে ধরা পড়িয়া যান, তাহার লোকেরা নদের চাঁদকে হত্যা করে এবং মহুয়া নিজে বক্ষে ছুরি বিঁধাইয়া আত্মহত্যা করে।

মূল ঘটনাটী এইরূপ,—ইহার মধ্যে দম্পতির যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে— তাহা অপূর্ব্ব। প্রথম চিত্রে দীর্ঘ বাঁশের ঊর্দ্ধে দড়ির উপর অদ্ভুত নৃত্য দেখাইতেছেন—দর্শকেরা বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু পাছে পড়িয়া মারা যায়, নদের চাঁদ এই আশঙ্কায় ভীত। এই প্রেমের প্রথম অধ্যায়। পরের চিত্রে মহুয়া ঘরে সাঁজের প্রদীপ জ্বালাইয়া নদীতে জল আনিতে গিয়াছেন, সেখানে নদের চাঁদ স্বীয় প্রেম নিবেদন করিতেছেন। ক্রীড়াশীলা মহুয়া কথার চাতুর্য্যে আধ-ঢাকা আন্তরিকতা ও আধ-ঢাকা রহস্যে উত্তর দিতেছেন—যেন একটী সদ্য গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর-ধারা অনাবিল প্রবাহে ও অনবদ্য সৌন্দর্য্যে পাথরে গা ঢাকিয়া ছুটিয়াছে। তারপর, নদীর জোৎস্নাপ্লাবিত সিকতা-ভূমিতে উভয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হইয়া কত মধুর কথায় রাত্রি কাটাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখানি যেন সোনা-মোড়ান; পৃথিবীতে স্বর্গের একটা আধভাঙ্গা স্বপ্নকথা।

চতুর্থ চিত্র—হোমরা মহুয়াকে লইয়া পলাইতেছে। নদের চাঁদ ভাত খাইতেছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মুখের গ্রাস পড়িয়া গেল, তিনি একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন।

পঞ্চম চিত্র—গাছের নীচে নদের চাঁদ শুইয়া ঘুমাইতেছেন, তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, মহুয়া হোমরা কর্তৃক যুবরাজকে হত্যা করিতে আদিষ্ট। সে কি বিপদের দৃশ্য! তারপর উভয়ে অশ্বারোহণে, যেন চন্দ্র ও সূর্য্য—নদীর সিক্ত ভূমি অশ্বখুরোত্থিত শব্দে মুখরিত করিয়া ছুটিয়াছেন। বণিকের নৌকায় বিপদ্, নদের চাঁদ জলের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত। মহুয়া কালীয়-অনুগামিনী মূর্ত্তিমতী মাতৃকাদের মত ভীষণ, তিনি কুঠার হস্তে নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। বিষ ভক্ষণে জ্ঞানহীন বণিক্ ও তাঁহার লোকজন জলে ডুবিয়া মরিতেছে। এই দৃশ্যের তুলনা নাই। কে বলে মহুয়া এখানে ব্রাহ্মণ-কন্যা? এখানে তাহার বেদেনীর রূপ, বেদেনীর ক্ষিপ্রকারিতা ও উদ্ভাবনী-শক্তি।

তাহার পরে সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে কি দুরন্ত সাহস—অর্দ্ধমৃত স্বামীকে কাঁধে ফেলিয়া তিনি পাহাড় ভেদ করিয়া ছুটিয়াছেন, পদভরে যেন ধরিত্রী কাঁপিতেছে। ভগবতীর শব স্কন্ধে একদা শিব এই ভাবে নৃত্যশীল পদক্ষেপে ছুটিয়াছিলেন; এখানে নারীই প্রেমের অভিনেত্রী। তারপর—রক্তপুষ্পরঞ্জিত কুঞ্জে মহুয়া নদের চাঁদের সেবা করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে আমরা মহুয়ার যে চিত্র দেখিয়াছি—এই গার্হস্থ্য চিত্রখানি সেরূপ নহে, অতি মৃদু স্বরে মহুয়া বাজারগমনোদ্যত স্বামীকে কানে কানে বলিতেছেন, "আমার জন্য একটা নথ আনিও"; কখনও বা শিরঃপীড়া-কাতর স্বামীর মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া কোমলভাবে তিনি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। একদিন নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছে,—মহুয়া দেবীর নিকট কালা-ধলা পাঁঠা মানৎ করিতেছেন, আর একদিন পীড়িত নদের চাঁদ ভাত খাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভাত দিতে না পারিয়া মহুয়া অজস্র কাঁদিতেছেন—এই সকল দৃশ্যে তিনি বাঙ্গালী ঘরের গৃহ-লক্ষ্মী।

শেষের দৃশ্যে—চির-সংযত অল্পভাষী মহুয়ার মুখ ফুটিয়াছে। পিতার নির্ব্বাচিত সুজন সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিতেছেন, "একবার আমার চোখ দিয়া দেখ—এই স্বর্ণকল্পতরুর পার্শ্বে কি সুজন বেদে লাগে?" তখনই নিজের ছুরি দিয়া নিজের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মহুয়ার প্রেম, মহুয়ার সংযম, মহুয়ার তেজ, ক্রীড়াশীলতা, ভীষণতা ও উপায়-উদ্ভাবনী শক্তি, মহুয়ার গার্হস্থ্য—এ সমস্তই অতি অপূর্ব্ব। এই চিত্র বঙ্গসাহিত্যে একবারে নূতন। মহুয়া ভগবতীর মত দশ প্রহরণে সজ্জিতা, লক্ষ্মীর মত তাঁহার গার্হস্থ্য, ভগবতীর মত তাঁহার কলা-কৌশল, সীতার ন্যায় নিষ্ঠা এবং দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় সংযম—ভারতীয় সমস্ত দেবীর

গুণ-নির্য্যাসে মহুয়া কুসুম পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইল যে, অপরাপর পালা সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা বলিতে পারিব না। ইহার মধ্যে অনেকগুলি এত উৎকৃষ্ট যে, কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাহা বলা শক্ত। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, ধৈর্য্য, সংযম ও তপস্যায় চন্দ্রাবতী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তিনি জয়চন্দ্রকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু বিবাহের দিনে বিধিবিড়ম্বনায় বিঘ্ন ঘটিল, চেলীপরা সিন্দূররঞ্জিত কপাল—বৃথা হইয়া গেল। আত্মীয়েরা কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রাবতী কাঁদিল না,—পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নীরব রহিল, যেরূপ প্রাণান্ত চেষ্টায় চন্দ্রাবতী তাঁহার শৈশবের প্রেমের শিখা নির্ব্বাণ করিয়া ভগবানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাব্য-জগতের সার কথা। এই কাব্য-প্রসঙ্গ সমস্তই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপর একখানি চিত্র মলুয়ার; মান্দার গাছে ঘেরা, পুষ্পিত কদম্ববৃক্ষের সন্নিহিত একটা এঁধো পুকুরের পারে তরুণ যুবক চাঁদবিনোদ ঘুমাইয়াছিল,—জল আনিতে যাইয়া মলুয়া এই যুবককে দেখিয়া ভুলিল। অনেক বাধা-বিঘ্নের পরে উভয়ের বিবাহ হইল, তাহার পর এক পুকুরঘাটে মলুয়াকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কাজি এক কুটনী পাঠাইল। সেই সমস্ত প্রলোভন এড়াইয়া মলুয়া চূড়ান্ত কষ্ট সহ্য করিয়া যে ভাবে সেই নির্ম্মম কাজির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা যেমনই কবিত্বে উজ্জ্বল, তেমনই তাহা কুলবধূর নিষ্ঠা ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ। জাহঙ্গীর দেওয়ানের হাতে পড়িয়া সে স্বীয় চরিত্র-গৌরব অতি দর্পের সহিত রক্ষা করিয়া কৌশলে দেওয়ান-বাড়ী হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এই পালার কতকগুলি দৃশ্য এরূপ সুন্দর যে, মনে হয়, সেগুলি যেন সোনায় লেখা। শেষের অঙ্ক পাঠক কখনই ভুলিতে পারিবেন না। দশদিক্ আলোড়ন করিয়া ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিয়াছে, বিক্ষোভিত নদীবক্ষে মলুয়াকে লইয়া ভগ্ন তরীখানি ধীরে ধীরে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে দুলিতে দুলিতে ডুবিতেছে; বোধ হয়, এইরূপে কোন যুগে শাপগ্রস্তা লক্ষ্মী জলে ডুবিয়াছিলেন—এই ভাবে বুঝি বৎসর বৎসর বাঙ্গালা দেশে সালঙ্কারা দশভুজা প্রতিমা জলে ডুবাইয়া যান। মলুয়ার মাথার সিন্দূরবিন্দু অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল, এবং তাহার সুবর্ণবর্ণ তরঙ্গের উপর কিরণ বর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে একটা আলো কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছিল, তীরে দাঁড়াইয়া বহু আত্মীয় বন্ধু এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিল—মলুয়া এত দিন যাহা বলে নাই, সে কথা যাত্রাকালে নির্ভীক ভাবে সকলকে বলিয়া গেল। এই দৃশ্য যিনি দেখিবেন—তিনি হিমাদ্রির উপর কাঞ্চনজঙ্ঘা, যোজন-বিস্তার চন্দ্রালোক-রঞ্জিত নীল সিন্ধু, কিম্বা এইরূপ কোন বড় বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইবে।

মদিনার প্রেম—কৃষক-পত্নীর একটী দাম্পত্য চিত্র। এরূপ চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে কেন, জগতের কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। চাষা ও চাষিনী ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে ।করূপে পরস্পরের প্রতি চঞ্চল কটাক্ষে চাহিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ উপভোগ করে, কিরূপে তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে এবং দাম্পত্য-জীবনের অপরিহার্য্য সাহচর্য্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়, কৃষক-পত্নীর প্রেম কত সরল, কত বিশ্বাসপরায়ণ,— এবং এই বিশ্বাস যখন ছিন্ন হয়, তখন তাহার প্রাণে কিরূপ দাগ পড়ে—এই দেওয়ানা মদিনার পাঠক তাহার জীবন্ত চিত্র দেখিবেন। রাণী কমলার আত্মবিসর্জ্জনের স্থির সঙ্কল্প এবং শেষ দিনের পূর্ণিমা রাত্রে যখন পুকুরের পাড়ের শ্রেণীবদ্ধ তরুগুলির বিকশিত পুষ্পের একটী দল নাড়াইবার জন্যও বায়ু বহিতে ছিল না, তখন পুরবাসীরা সুপ্ত, আকাশে বাতাস নিস্তব্ধ,—এমনই সময় রাণী কমলা পুকুর হইতে উত্থান করিলেন। সেই পুকুরে তিনি ডুবিয়া মরিয়াছিলেন, তাঁহার অশরীরী স্পর্শে বদ্ধ অর্গল খুলিয়া গেল,—তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পুত্রকে স্তন্য পান করাইয়া পুনরায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জলে নামিবেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী পাগল রাজা সেই জ্যোৎস্না রাত্রে কমলা দেবীর শাড়ীর অাঁচল ধরিয়া বলিলেন “আমি এবার তোমায় পাইয়াছি, আর ছাড়িব না,।” দৈবশক্তিবলে কমলা দেবী রাজার আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া জলে ডুবিয়া অন্তর্হিত হইলেন; তখন রাজার হস্তে শাড়ীর একটা অংশ ছিঁড়িয়া রহিয়াছিল, তাহা হাতে লইয়া তিনি সারা রাত্রি জলে খুঁজিতে লাগিলেন, সে চেষ্টা বৃথা হইল। শেষ রাত্রে কমলা দেবীর নদীতে যাত্রা একটী দৃশ্য, তাঁহার অন্তর্দ্ধান আর একটী দৃশ্য—টেনিসনের মর্ট্-ডি-আর্থারের কথা মনে পড়িবে। কঙ্ক ও লীলার সুনির্ম্মল প্রেম, পাহাড়নিঃসৃত নির্ঝরের ন্যায় সুখ-সেব্য; অতি বিমল এবং বেগশীল, চতুর্দ্দিকে কবিত্বের কণা বিচ্ছুরিত করিয়া মনোহর একটী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় কবি উপস্থিত করিয়াছেন। বণিক্-কন্যা কমলার অপূর্ব্ব স্থৈর্য্য ও সংযম, কেনারাম ও মন্সুরের দস্যু-জীবনের পরিবর্ত্তন, ধোপার পাট ও কাঞ্চনমালার করুণ দৃশ্যাবলী—এ সকল প্রত্যেক পালার মধ্যে যে মহত্ত্ব, যে অদ্ভুতকর্ম্মা নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের ত্রিশ কোটী দেবতার প্রত্যেকটীর পরিকল্পনা এই নরনারীচরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের সংস্কৃত-চিহ্নিত যুগের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের যে ছাপ পড়িয়াছে, এই পল্লীসাহিত্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। ইহাতে কোন কৃত্রিমতা বা অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব নাই। ডিরেক্টার ওটেন সাহেব এই পল্লীগাথাগুলির যে দীর্ঘ সমালোচনা

লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, সহরের ধূলি-মলিন বায়ু, অবিরত মিল-নিঃসৃত ধূম্র-কুণ্ডলী ও যান বাহনের ঘর্ঘর শব্দ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হঠাৎ যদি কেহ পল্লানদীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন যেরূপ তাহার মনে একটা অনাবিল অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি খেলিয়া যায়, কতকগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলের বেড়ী-পরা কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ করার পর, এই পল্লীসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে মনের উপর তেমনই একটা উচ্ছ্বসিত আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়।

এত বড় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা কতটী নায়ক ও নায়িকায় মহিমান্বিত চিত্র দেখিতে পাই ? যে সকল চরিত্র নভঃস্পর্শী গিরির মত সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া বিস্ময়কর মহিমা-মণ্ডিত হইয়া আছে, সেরূপ নায়ক-নায়িকার সংখ্যা বোধ হয় আমরা নখাগ্রে গণনা করিতে পারি। কিন্তু পল্লী-গাথার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা তদনুপাতে বহু-সংখ্যক চরিত্র-চিত্রণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটা স্বতন্ত্র গৌরবের আসনে স্থিত। এই চাষাদের নিভৃত নিকেতন যে এতগুলি হীরকখণ্ড লুকাইত ছিল, তাহা কে প্রত্যাশা করিয়াছিল !

চাষাদের কবিত্ব-শক্তি অদ্ভুত। বর্ষার বর্ণনা আছে—মাথার উপর বজ্রনির্ঘোষ, এবং অবিশ্রান্ত ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য, রাত্রি ঘোর অন্ধকার— এ সমস্ত বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় কান্তার মান ভাঙ্গাইবার জন্য একটা পাখী "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" চীৎকার করিয়া রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। আর একটি পালা গানে আছে শুভ্রা জ্যোৎস্না-ধবলিত রাত্রি, মনে হয়, যেন কোন দেব-ললনা স্বর্গ হইতে মুষ্টি মুষ্টি বেল ফুলের কুঁড়ি ভূতলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া খেলা করিতেছেন। কঙ্ক ও লীলা কাব্যে বর্ষা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিতেছেন, বারিপূর্ণ সোনার ঝারি হাতে লইয়া আকাশ হইতে বর্ষা নামিতেছেন।

আমরা এই পল্লীগীতিকাগুলি সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখিব না।

যাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য আমার এই সামান্য প্রবন্ধটী লিখিত হইল, তিনি বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান কালের গুরুকল্প ; ইনি আমাদের সাহিত্যের কত দিক্ দিয়া যে নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, অপর দিকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য, জাতক ও অনুশাসন ইঁহার নখাগ্রে। ইঁহার সঙ্গে যিনি এক ঘণ্টা আলাপ করিবেন, তিনি অনেক নূতন কথা শুনিবেন ও শিখিবেন। বোধ হয়, এ যুগে

ভারতবর্ষের তত্ত্ব-বহুল ইতিহাসের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে ইঁহার মত অভিজ্ঞ পণ্ডিত আর নাই। আজকাল যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে এই পাণ্ডিত্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দুর্ল্ভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যতদিন থাকিবেন, ততদিন আমাদের বাঙ্গালা দেশের পাণ্ডিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ইনি সংস্কৃত জানেন বলিয়া বাঙ্গালাকে উপেক্ষা করেন নাই। বস্তুতঃ, ইনি যে বাঙ্গালা লিখেন, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যদের বাঙ্গালা নহে, তাহা যেমন ভাবগম্ভীর, তেমনই কবিত্বময় ও সরল। বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস ইঁহার মৌলিক অনুসন্ধানের নিকট কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ ঋণী। ইনিই প্রথম ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে, বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়া গিয়াছে। ইনি যেরূপ বহু উপকরণ লইয়া সর্ব্বদা নিবিড়ভাবে ব্যস্ত, তেমনই সেই নিবিড় উপকরণরাশির ব্যূহ ভেদ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিবলে ইনি নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী প্রতিভা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার অনুগত, গুণমুগ্ধ শিষ্যকল্প; তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য এই সামান্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কুন্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি; এই সামান্য দান কি তাঁহার গ্রহণীয় হইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

অদ্ভুত তাম্রশাসন

প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ইন্দ্রপাল বর্ম্মদেবের অচিরাবিষ্কৃত (দ্বিতীয়) তাম্রশাসনখানি একটি অদ্ভুত জিনিষ। এ যাবৎ অস্মৎপরিদৃষ্ট কোনও তাম্রশাসনে যাহা দেখা যায় নাই—ইহাতে তাহা রহিয়াছে—এবং তাহারই বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

যাঁহারা কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসের খবর রাখেন, তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রপালের নাম অপরিচিত নহে। ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনখানি আসামের (ইংরেজী) ইতিহাস প্রণেতা মহামতি স্যর্ এডোয়ার্ড্ গেইট্ বাহাদুর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ডক্‌টর্ হর্ণ্‌লি সাহেব দ্বারা এশিয়াটিক্ সোসাইটির জর্ণেলে (১৮৯৭ সনের পত্রিকার ১ম ভাগে) প্রকাশিত হয়, পশ্চাৎ এই লেখক কর্ত্তৃক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৯ সালে ২য় ও ৪র্থ সংখ্যায়) বঙ্গানুবাদসহ পুনরালোচিত হইয়াছে।

ইন্দ্রপালের এই দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি তাহা ১৩৩২ সালে স্বর্গীয় বন্ধুবর হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাই। তাঁহার অনুরোধে শাসনের শেষার্দ্ধের পাঠোদ্ধার যথামতি সম্পাদন করি। প্রথমার্দ্ধ—বংশপ্রশস্তি—অবিকল প্রথম শাসনখানির অনুলিপি হওয়াতে তাহার পাঠোদ্ধার গোস্বামী মহাশয় অনায়াসেই করিতে পারিয়াছিলেন। শেষার্দ্ধে শাসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের প্রশস্তি ও প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা অভিনব অর্থাৎ প্রথম শাসনের লিপি হইতে ভিন্নরূপ হওয়াতে তাহার পাঠোদ্ধারে গোস্বামী মহোদয়কে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।[১]

এই দ্বিতীয় শাসন ইন্দ্রপালের রাজত্বের ২১শ বৎসরে (প্রথম শাসনের ১৩ বৎসর পরে) যজুর্ব্বেদ কাণ্বশাখার কাশ্যপগোত্রীয় দেবদেব নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতী পণ্ডরী[২] নামক ভূভাগে ২০০০ দ্রোণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে এই পরিমাণ ভূমি দান করা হইয়াছিল।

---

১ স্বর্গীয় বন্ধুবর অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বিতীয় শাসনখানি সানুবাদ প্রকাশিত করিতে অনুমতি দিয় এবং শেষ (তৃতীয়) ফলকখানির ফটো পাঠাইয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়া গিয়াছেন। মৎসংকলিত "কামরূপ শাসনাবলী"তে ঐ ফলকের চিত্রসহ সমগ্র শাসনখানি প্রকাশিত হইবে।

২ আজ প্রায় ৯০০ বৎসর পরেও 'পণ্ডরী' নামে একটি মৌজা (=পরগণা) সংজ্ঞিত হইতেছে।

অন্যান্য তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনার পরেই লিপি শেষ হইয়াছে ; ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনেও তাহাই হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শাসনেও সীমাবর্ণনার পরিশেষে 'ইতি' আছে এবং তার পর ডবল দাঁড়ি (॥ x ॥) রহিয়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখানেই লিপি শেষ হয় নাই।

ইহার পর যাহা আছে, তাহা এই,—

"শ্রীমৎ পরমেশ্বরপাদানাং দ্বাত্রিংশন্নামান্যমূনি। ১।[১] কীর্ত্তিকমলিনীমার্ত্তণ্ড। ২। লক্ষ্মী-ভারোদ্বহনাচ্যুত। ৩। সকললোকশঙ্কর। ৪। করুণাজীমূতবাহন। ৫। সংগ্রামস্তম্ভ। ৬। অরসিকভীম। ৭। অপ্রতিহতশক্তিকার্ত্তিকেয। ৮। বিপক্ষবলভিৎ। ৯। নরসিংহবিক্রম। ১০। কলিকালজলধিনিমজ্জদ্বসুন্ধরাদিববাহ। ১১। সাহসৈকসহায়। ১২। ধনুর্দ্ধরৈকপার্থ। ১৩। অনতক্ষত্রবংশভার্গ্যব। ১৪। উদ্ধতভূভৃদশনিপাত। ১৫। অন্তঃপুরভুজঙ্গ। ১৬। সরস্বতী-নিজনিবাস। ১৭। সুহৃন্মানসরাজহংস। ১৮। কামিনীমনোমোহনৈকমন্ত্র। ১৯। অনবদ্য-বিদ্যাধব। ২০। সমবসাগরমৃগাঙ্ক। ২১। প্রজ্ঞাবধূবল্লভ। ২২। কলাবিলাসিনীসুভগ। ২৩। অর্থিজনমনোবথকল্পদ্রুম। ২৪। মিত্রোদয়প্রভাতসময়। ২৫। ধর্ম্মবিরোধিবর্ত্মভীরু। ২৬। সদ্‌গুণকর্ণাবতংস। ২৭। সচ্চরিতচন্দনমলয়গিবি। ২৮। মেদিনীতিলক। ২৯। প্রচণ্ড-নরগণ্ড। ৩০। তরুণীতবণ্ড। ৩১। তুবঙ্গবেবন্ত। ৩২। হবগিরিজাচবণপঙ্কজবজো-রঞ্জিতোত্তমাঙ্গ।"

ইহাতেও শেষ হয় নাই ; অতঃপর এক পঙ্‌ক্তিতে চাবিটী ছবি বহিয়াছে,—১ম, সর্পের (?) উপর উপবিষ্ট পক্ষী (বোধ হয গরুড়) ; ২য়, পদ্ম ; ৩য, শঙ্খ ; ৪র্থ চক্র।

ছবিগুলির বাম পার্শ্বে একেব নীচে আব—এই ভাবে তিনটী শব্দ রহিয়াছে—শনি, ঢনি অনি ; আমার বোধ হয়, তাম্রফলক প্রস্তুত করাব এবং তাহাতে লেখা খোদাইবার ব্যাপারে যাহারা নিযুক্ত ছিল—এই তিনটী শব্দ তাহাদেব নাম অথবা নামের আদ্যভাগ ; আবার ছবিগুলির নীচে একটা লেখা আছে, তাহা 'পুষ্যসিবিঅষ্টহেত্ত' এইরূপ পড়া যায় ; হয়তো এটাও (দেশজ প্রাকৃতভাষায়) এতৎসম্পৃক্ত কাহারও নাম হইতে পারে। [সিরি= শ্রী মনে হয়, তাই এরূপ অনুমান কবা হইল।]

১ ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা মূল শাসনে নাই। ঠিক ঠিক ৩২টী নাম অর্থাৎ বিশেষণই যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শনার্থ সংখ্যা দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। উদ্ধৃত লিপিতে মধ্যে মধ্যে বানান ভুল আছে, সেইগুলি সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইল— অশুদ্ধি প্রদর্শন বাহুল্য বিবেচিত হইল।

এতটা অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। কামরূপের অপর শাসনগুলির মধ্যে কেবল ভাস্করবর্ম্মার শাসনে "সেক্যকারঃ কালিয়া॥" এবং ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় শাসনে "তক্ষকার-শ্রীবিনলেন খনিতমিতি॥" আছে। অন্যান্য শাসনে—এমন কি, ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনেও,—ঈদৃশ কোনও নাম নাই।

এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল, তদ্বিষয়ে অনুমানতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই শাসনখানির ফলক তিনটী; প্রথম ফলকের ১পৃষ্ঠা, ২য় ফলকের উভয় পৃষ্ঠা এবং তৃতীয় ফলকের ১ পৃষ্ঠা—এই চারি পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে; প্রথম তিন পৃষ্ঠায় ১৮।১৯ পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিত—কিন্তু চতুর্থ পৃষ্ঠায় (অর্থাৎ তৃতীয় ফলকের লিখিত পৃষ্ঠায়) মাত্র পাঁচ পঙ্‌ক্তিতেই লেখিতব্য বিষয় শেষ হইয়া গেল। তারপর, এতটা জায়গা খালি পড়িয়া রহিবে—এইটা বোধ হয়, শাসনাধ্যক্ষ মহাশয়ের শোভন বলিয়া মনে হইল না। তাই রচয়িতা সভাপণ্ডিত দ্বারা রাজস্তুতি আরো কিছু যোজিত করিয়া দিলেন। সুরসিক পণ্ডিত মহাশয় বিষ্ণুর ষোড়শ নাম, শিবের সহস্র নাম—এই সকলের অনুকরণে নরদেব ভূপতির "শ্রীমৎপরমেশ্বর'' এই সংজ্ঞা দিয়া তাঁহার বত্রিশটি নাম অর্থাৎ বিশেষণ রচিয়া দিলেন। তথাপি দেখা গেল, ফলকের কিছুটা অংশ বাকী রহিল; তখন শ্রীমন্নারায়ণের বাহন ও পদ্মশঙ্খচক্রের ছবি অঙ্কিত হইল—এবং তৎপার্শ্বে তিন সারিতে এবং অধোভাগে (পূর্ব্বে উল্লেখিত) কতিপয় নামও লিখিত হইল।

পরবর্ত্তী আহোম ও কোচরাজগণের সময়ে আসামের হস্তলিখিত পুথিতে অনেকশঃ চিত্র দেখা যায়; তবে ঐ সব চিত্র গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সম্পর্কিত। কিন্তু এই তাম্রশাসনে অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে শাসনোক্ত কোনও কিছুরই সম্পর্ক পরিলক্ষিত হইতেছে না।[১] পরন্তু চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খোদকের নিপুণতাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই।

শাসনের যে পৃষ্ঠায় উপরি উক্ত অদ্ভুত বিষয় রহিয়াছে, তাহার চিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

১ এইরূপ যাদৃচ্ছিক চিত্রের একটি মাত্র নমুনা ডাঃ ফ্লিটের গুপ্ত লিপি সংগ্রহে দেখা গিয়াছে। গুপ্তাব্দ ২৩৯ সনে খোদিত মহানামের শিলালিপিতে ধেনুবৎসের চিত্র আছে। "Below the inscription towards the proper right side of the stone, there are engraved in outline a cow and a calf standing towards and nibbling at a small tree or bush" (Corp. Ins. Indicarum Vol. III, p. 274,). তবে মুদ্রিত লিপিতে উক্ত ছবির ঊর্দ্ধ ভাগের অতি অল্পাংশ মাত্র দৃষ্ট হয়।

অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয়

॥ ১ ॥

বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্যে অশ্বঘোষের স্থান কালিদাসের পরেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাকবির জীবনবৃত্তান্তের অতি সামান্য কিছুই এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। আমরা শুধু এইটুকুই জানি যে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,তাঁহার মাতার নাম ছিল **সুবর্ণাক্ষী** এবং তাঁহার বাসস্থান ছিল **সাকেত** (নামান্তর, অযোধ্যা)। অশ্বঘোষ নিজেকে **আর্য্য, ভদন্ত, মহাকবি, মহাবাদিন্**, এবং **আচার্য্য** বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চীনীয় ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই মহাকবি প্রথমে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং কুষাণ সম্রাট্ কনিষ্কের গুরু হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহাকবির কাব্য ভারতবর্ষে একরকম লোপ পাইয়াছিল। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা তাঁহার গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, তাঁহার নামও কখনও শুনেন নাই। যদিও **সুভাষিতাবলী** প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে অশ্বঘোষের নামে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ—কাব্য ও নাটক—বহুপূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

॥ ২ ॥

অশ্বঘোষ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেবল দুইটী মহাকাব্য, **বুদ্ধচরিত** এবং **সৌন্দরনন্দ**, আর একটী নাটকের (**শারীপুত্র-প্রকরণ**) কিছু কিছু অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেকগুলি গ্রন্থ চীন ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে।

চীন ভাষায় এই বইগুলি বর্ত্তমান আছে—(১) গুরুসেবা সম্বন্ধে পঞ্চাশটী শ্লোক, (২) **দশদুষ্টকর্ম্মমার্গসূত্র**, (৩) **বুদ্ধচরিতকাব্য**, (৪) **মহাযান-ভূমি-গুহ্যবাচামূলশাস্ত্র**, (৫) **মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র**, এবং (৬) **সূত্রালঙ্কার শাস্ত্র**।

তিব্বতী ভাষায় এইগুলির অনুবাদ আছে—(১) **অষ্টবিঘ্নকথা**, (২) **গণ্ডীস্তোত্র-গাথা**, (৩) **দশকুশলকর্ম্মপথনির্দ্দেশ**, (৪) **পরমার্থবোধিচিত্ত-**

ভাবনাক্রমবর্ণসংগ্রহ, (৫) **বুদ্ধচরিতমহাকাব্য,** (৬) **মণিদীপ-মহাকারুণিকপঞ্চদেবস্তোত্র,** (৭) **বজ্রযানমূলাপত্তিসংগ্রহ,** (৮) **শতপঞ্চাশৎকনামস্তোত্র,** (৯) **শোকবিনোদন,** (১০) **সংবৃতি-বোধিচিত্তভাবনোপদেশবর্ণসংগ্রহ,** (১১) **স্থূলাপত্তি।**

॥ ৩ ॥

বুদ্ধচরিত, যাহা কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া অক্‌স্‌ফোর্ড হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রকাশিত গ্রন্থে সতেরটী সর্গ আছে; কিন্তু শেষের তিন সর্গ ও চতুর্দ্দশ সর্গের কিয়দংশ আদর্শ পুথির লেখক **অমৃতানন্দের** রচিত। এই অমৃতানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। এই অমৃতানন্দের পুথিই কাউয়েল-সম্পাদিত বুদ্ধচরিতের একমাত্র অবলম্বন। পুথির শেষে অমৃতানন্দ লিখিয়াছেন—**সর্ব্বত্রান্বিষ্য নো লব্ধ্বা চতুঃসর্গং চ নির্ম্মিতম্।** বুদ্ধচরিতের চীনীয় অনুবাদে আটাশটী সর্গ আছে। এতদিন ধারণা ছিল যে, চীনীয় অনুবাদটী ঠিক যথাযথ নহে,—উহাতে মূলকে ফেনানো হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে বুদ্ধ-চরিতের কিন্তু এক প্রাচীন (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের) অসম্পূর্ণ হস্তলিপি পাইয়াছিলেন; তাহাতে নবম সর্গে অতিরিক্ত সাড়ে এগারটী শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। সে শ্লোক কয়টী কাউয়েলের সম্পাদিত পুস্তকে নাই, অথচ চীনীয় অনুবাদে আছে ["A New MS. of the Buddhacarita", Mm. Haraprasad Shastri, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909]। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, চীনীয় অনুবাদ যথাযথ, এবং কাউয়েল প্রকাশিত বুদ্ধচরিত খুবই অসম্পূর্ণ। সেই সাড়ে এগারটী শ্লোক এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল।

জাম্বূনদং হর্ম্ম্যমিব প্রদীপ্তং বিষেণ সংযুক্তমিবোত্তমান্নম্।
গ্রাহাকুলং চ স্থিরমারবিন্দং রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ঞ্চ ॥৪১॥
ইত্থঞ্চ রাজ্যং ন সুখং ন ধর্ম্ম্যং পূর্ব্বে তথাজাতঘৃণা নরেন্দ্রাঃ।
বয়ঃপ্রকর্ষেঽপরিহায়দুঃখে রাজ্যানি মুক্ত্বা বনমেব জগ্মুঃ ॥৪১ ক ॥
চিরং হি মুক্তানি তৃণান্যরণ্যে ত্রিবংকবো (?) রত্নমিবোপগুপ্তঃ।
সহোষিতং শ্রীসুলভৈ র্ন চৈব দোষৈরদৃশ্যৈরিব কৃষ্ণসর্পৈঃ ॥৪১ খ ॥
শ্লাঘ্যং হি রাজ্যানি বিহায় রাজ্ঞাং ধর্ম্মাভিলাষেণ বনং প্রবেষ্টুম্।
ভগ্নপ্রতিজ্ঞস্য ননূপপন্নং বনং পরিত্যজ্য গৃহং প্রবেষ্টুম্ ॥৪১ গ ॥

জাতঃ কুলে কোঽপি নরঃ সসত্ত্বো ধর্ম্মাভিলাষেণ বনং প্রবিষ্টঃ।
কাষায়মুৎসৃজ্য বিমুক্তলজ্জঃ পুরন্দরস্যাপি পুরং শ্রয়েত ॥৪১ ঘ॥
লোভাদ্ বিমোহাদথবা ভয়েন যো বান্তমন্নং পুনরাদদীত।
লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সন্ত্যজ্য কামান্ পুনরাদদীত ॥৪১ ঙ॥
যশ্চ প্রদীপ্তাচ্ছরণাৎ কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রম্য ভূয়ঃ প্রবিশেৎ তদেব।
গার্হস্থ্যমুৎসৃজ্য স দৃষ্টদোষো মোহেন ভূয়োঽভিলষেদ্ গ্রহীতুম্ ॥৪১ চ॥
বহ্নেশ্চ তোয়স্য চ নাস্তি সন্ধিঃ শঠস্য সত্যস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ।
আর্য্যস্য পাপস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য (?) দণ্ডস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ ॥৪১ ছ॥
যা চ শ্রুতিঃ মোক্ষমবাপ্তবন্তো নৃপা গৃহস্থা ইতি নৈতদস্তি।
সামপ্রধানঃ ক্ব চ মোক্ষধর্ম্মো দণ্ডপ্রধানঃ ক্ব চ রাজ্যধর্ম্মঃ ॥৪১ জ॥
শমে রতিশ্চেৎ শিথিলঞ্চ রাজ্যং রাজ্যে মতিশ্চেৎ শমবিপ্লবশ্চ।
শমশ্চ তৈক্ষ্ম্যঞ্চ হি নোপপন্নং শীতোষ্ণয়োরৈক্যমিবোদকাগ্ন্যোঃ ॥৪১ ঝ॥
তন্নিশ্চয়াদ্ বা বসুধাধিপাস্তে রাজ্যানি মুক্ত্বা শমমাপ্তবন্তঃ।
রাজ্যার্দ্দিতা বা নিভৃতেন্দ্রিয়ত্বাদনৈষ্ঠিকে মোক্ষকৃতাভিমানাঃ ॥৪১ ঞ॥
তেষাং রাজ্যেঽস্তু শমো যথাবৎ প্রাপ্তো বনং মোহমনিশ্চয়েন ।
ছিত্ত্বা হি পাশং গৃহবন্ধুসঙ্গং মুক্তঃ পুন র্ন প্রবিবিক্ষুরস্মি ॥৪১ ট॥

বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের প্রথম কয়েকটী শ্লোকও প্রক্ষিপ্ত। ইহা চীনীয় এবং তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও ইহাদের প্রক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে শ্রী শব্দ লইয়া—**শ্রিয়ঃ পরার্দ্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ**। সৌন্দরনন্দে অশ্বঘোষ এই প্রথা অবলম্বন করেন নাই। কালিদাসও নয়। ভারবিতেই প্রথম পাওয়া যায়—**শ্রিয়ঃ কুরূণাম্ অধিপস্য পালনীম্**।

॥ ৪ ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় **সৌন্দরনন্দ কাব্য** নেপালে আবিষ্কার করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় ইহা এসিয়াটীক সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্যের কোন চীনীয় বা তিব্বতী অনুবাদ নাই। কাব্যাংশে সৌন্দরনন্দ বুদ্ধচরিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খুব সম্ভব ইহা কবির পরবর্ত্তী রচনা। বাঙ্গালা দেশে

এই কাব্যের এককালে সমাদর ছিল বলিয়া বোধ হয় ; কারণ, সর্ব্বানন্দ (১২শ শতক) তাঁহার অমরকোষের টীকায় ইহা হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন (সম্পাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

মধ্য এসিয়ার তুর্‌ফান প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি তালপত্রের পুঁথির টুক্‌রা জোড়া দিয়া বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্‌টর ল্যুডার্স (Lueders) একটী অমূল্য গ্রন্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুষ্পিকা অংশ হইতে জানা গিয়াছে যে, ইহা **অশ্বঘোষ**-বিরচিত **শারীপুত্র-প্রকরণ** (অথবা **শারদ্বতীপুত্র প্রকরণ**) নামক একটী নাটক। নাটকটীর খণ্ডিতাংশ বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে [Lueders, Bruchstueche Buddhistischer Dramen, 1911]। নানা দিক্‌ দিয়া এই আবিষ্কারটী অপূর্ব্ব।

॥ ৬ ॥

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, **সুভাষিতাবলী** প্রভৃতি কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে অশ্বঘোষের বলিয়া কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত করা আছে। একটী ব্যতীত সেগুলি বর্ত্তমানে প্রচলিত অশ্বঘোষের কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। ভর্ত্তৃহরির শতকগুলিতে এই শ্লোক কতকগুলি ধরা আছে।

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্‌ বিষম্‌।

সৌন্দরনন্দের [৮, ৩৫] এই শ্লোকার্দ্ধটী ভর্ত্তৃহরির **বৈরাগ্যশতকে** আছে। বল্লভদেব **সুভাষিতাবলীতে** [৩৩৮০] যে শ্লোকে এই অংশটুকু আছে, তাহাকে কালিদাস ও মাঘের যুক্ত-রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আবাহূদ্‌গতমণ্ডলাগ্ররুচয়ঃ সন্নদ্ধবক্ষঃস্থলাঃ
সোষ্মাণো ব্রণিনো বিপক্ষহৃদয়প্রোন্মাথিনঃ কর্কশাঃ।
উৎসৃষ্টাম্বরদৃষ্টবিগ্রহভরা যস্য স্মরাগ্রেসরা
যোধা বারবধূস্তনাশ্চ ন দধুঃ ক্ষোভং স বোঽব্যাজ্জিনঃ॥

এই শ্লোকটী **কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে** [২] আছে। **সুভাষিতাবলীতে** [৭৪] এবং বামনের **কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তির টীকায়** [৪, ৩, ৭] ইহা অজ্ঞাত কবির বলিয়া উল্লিখিত আছে।

জয়ন্তি জিতমৎসরাঃ পরহিতার্থমভ্যুদ্যতাঃ
পরাভ্যুদয়সুস্থিতাঃ পরবিপত্তিখেদাকুলাঃ।

মহাপুরুষসৎকথাশ্রবণজাতকৌতূহলাঃ
সমস্তদুরিতার্ণবপ্রকটসেতবঃ সাধবঃ ॥

এই কবিতাটী **সুভাষিতাবলীতে** [১৯৮] আছে;

কদর্থিতস্যাপি হি ধৈর্য্যবৃত্তে র্বুদ্ধে র্বিনাশো ন হি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥

সুভাষিতাবলী [৫২৮] এবং ভর্তৃহরির **বৈরাগ্যশতকে** [৭৫] এই শ্লোকটী পাওয়া যায়। **শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতেও** [২২৭] ইহা ভর্তৃহরির বলিয়া উল্লিখিত আছে।

জাতাশ্চ নাম ন বিনঙ্ক্ষ্যন্তি চেত্যযুক্তম্
উৎপাদ এব নিয়মেন বিনাশহেতুঃ।
তুল্যে চ নাম মরণব্যসনোপতাপে
মৃত্যুর্বরং পরহিতাবহিতাশয়স্য ॥ **সুভাষিতাবলী** [৫২৯]।

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং
বিদ্যা সহস্রগুণিতা ন চ বাগ্‌বিশুদ্ধিঃ।
কর্ম্মাণি পূর্ব্বশুভসঞ্চয়সঞ্চিতানি
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥

সুভাষিতাবলী [৩১০০]। **বৈরাগ্যশতকেও** [৯৪] এইটী পাওয়া যায়।

ব্যায়স্যন্নপি কশ্চিদর্থিতফলপ্রাপ্তেরভাগী ভবেৎ
সর্ব্বারম্ভনিরুদ্যমোঽপি লভতে কশ্চিদ্ যথেষ্টং ফলম্।
হস্তাৎ কস্যচিদাশু নশ্যতি ধনং তেনাপরো যুজ্যতে
বালোন্মত্তজড়োপমস্য হি বিধে র্নানাবিধং চেষ্টিতম্ ॥

সুভাষিতাবলী [৩১৪২]।

॥ ৭ ॥

রায়মুকুটকৃত **পদচন্দ্রিকায়** এবং সর্ব্বানন্দ-বিরচিত **টীকাসর্ব্বস্বে** (এই দুইটাই অমরকোষের টীকা) **সৌন্দরনন্দ** হইতে একটী শ্লোক (১, ২৪), এবং

বুদ্ধচরিত হইতে একটী শ্লোক (৮, ১৩) তোলা আছে। বুদ্ধচরিতের এই শ্লোকটী উজ্জ্বলদত্তকৃত **উণাদিসূত্রের টীকায়**, এবং **লিঙ্গভট্টীয়** নামক অমরকোষের অপর একটী টীকায় উদ্ধৃত আছে।

॥ ৮ ॥

অশ্বঘোষ কালিদাসের প্রায় আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর আগেকার লোক। অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, আর কালিদাস চতুর্থ শতকে। অশ্বঘোষের কাব্য হইতে কালিদাস যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিতে সিদ্ধার্থের উপবনযাত্রার বর্ণনার [৩, ১৩-২৪] সহিত কালিদাসের রঘুবংশে অজের বিবাহ-সভায় যাত্রা [৭, ৫-১২] এবং কুমারসম্ভবে শিবের বিবাহসভায় যাত্রার বর্ণনার সঙ্গে ভাবে ও ভাষায় চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে [Cowell, Preface to the Buddhacarita, p. x ff] এ বিষয়ে কালিদাস যে অশ্বঘোষের নিকট ঋণী, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

এই দুই মহাকবির রচনার মধ্যে ভাষাগত ও উপমাগত মিলও অনেক দেখা যায়। সেগুলি এখানে দেখাইতেছি।

(ক) **দিশঃ প্রসেদুঃ প্রবভৌ নিশাকরঃ** [বুদ্ধচরিত ১৩, ৭১]—
দিশঃ প্রসেদুর্ মরুতো ববুঃ সুখাঃ [রঘুবংশ ৩, ১৪]।

(খ) **নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ** [বুদ্ধচরিত ১০, ২৩]—
নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ [রঘুবংশ ২, ৪৭]।

(গ) **প্রমদানাম্ অগতির্ ন বিদ্যতে** [সৌন্দরনন্দ ৮, ৪৪]—
মনোরথানাম্ অগতির্ ন বিদ্যতে [কুমারসম্ভব ৫, ৬৪]।

(ঘ) **ধাতোরধিরিবাখ্যাতে পঠিতোঽক্ষরচিন্তকৈঃ**
[সৌন্দরনন্দ ১২, ৯]।

ধাতোঃ স্থান ইবাদেশং সুগ্রীবং সন্ন্যবেশয়ৎ
[রঘুবংশ ১২, ৫৮]।

(ঙ) **কিম্ অত্র চিত্রং যদি** বীতমোহঃ বনং গতঃ [সৌন্দরনন্দ ১৬, ৮৪]—
কিম্ অত্র চিত্রং যদি কামসূর্ভূঃ [রঘুবংশ ৫, ৩৩]।

(চ) **নাপি যযৌ ন তস্থৌ** [সৌন্দরনন্দ—সম্পাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]—
শৈলাধিরাজতনয়া **ন যযৌ ন তস্থৌ** [কুমারসম্ভব]।

(ছ) মহাত্মনি **ত্বয্যুপপন্নম্ এতৎ** [[বুদ্ধচরিত ১, ৬০]—

সর্ব্বং সখে **ত্বয্যুপপন্নম্ এতৎ** [কুমারসম্ভব ৩, ১২]।

(জ) **প্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ** [সৌন্দরনন্দ ৫, ১৭]—
মূঢ়ঃ পর**প্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ** [মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রস্তাবনা]।

(ঝ) **বাতেরিতঃ পল্লবতাম্ররাগঃ** কর্ণিকারঃ [সৌন্দরনন্দ ১৮, ৫]—
পল্লবরাগতাম্রা প্রভা পতঙ্গস্য [রঘুবংশ ২, ১৫], এবং—
বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীভিরিতস্ততস্ত্বরয়তি [শকুন্তলা, প্রথম অঙ্ক]।

(ঞ) **স্তনভিন্ন**হারাঃ [সৌন্দরনন্দ ১০, ৩৬]—
স্তনভিন্নবল্কলা [কুমারসম্ভব ৫, ৮৪]।

(ট) কর্ণানুকূলান্ অবতংসকাংশ্চ **প্রত্যর্থীভূতান্** ইব কুণ্ডলানাম্
[সৌন্দরনন্দ ১০, ২০]—
প্রত্যর্থীভূতাম্ অপি তাং সমাধেঃ [কুমারসম্ভব ১, ৬৯]।

(ঠ) বিশীর্ণ**পুষ্পস্তবকা লতেব** [সৌন্দরনন্দ ৬, ২৮]—
পর্য্যাপ্ত**পুষ্পস্তবকা**বনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী **লতেব** [কুমারসম্ভব ৫, ৫৪]

(ড) **শ্রুতমহতা** শ্রমণেন [সৌন্দরনন্দ ৯, ৫০]—
সরস্বতী **শ্রুতমহতাং** মহীয়তাম্ [শকুন্তলা, ভরতবাক্য]।

(ঢ) **মুখেন সাচীকৃত**কুণ্ডলেন [সৌন্দরনন্দ ৪, ১৯]—
সাচীকৃতচারু**বক্ত্রঃ** [রঘুবংশ ৬, ১৪]

॥ ৯ ॥

বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দের কয়েকটী শ্লোকে **ভগবদ্গীতার** কোন কোনও শ্লোকের বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা,—

(ক) ব্রবীম্যহমহং বেদ্মি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ।
ইতীহৈবমহঙ্কারস্ত্বনহঙ্কার বর্ত্ততে॥
[বুদ্ধচরিত ১২, ২৬]—

তুলনীয় **ভগবদ্গীতা ১৬, ১৩-১৫।**

(খ) প্রাপ্নোতি পদমক্ষরম্ [বুদ্ধচরিত ১২, ৪১]—

তুলনীয় **ভগবদ্গীতা ২, ৫১ ; ১৫, ৫ ; ১৮, ৫৬।**

(গ) মনোধারণয়া চৈব পরিণাম্যাত্মবান্ অহঃ।
বিধূয় নিদ্রাং যোগেন নিশামপ্যতি নাময়েৎ ॥

[সৌন্দরনন্দ ১৪, ২০]—

তুলনীয় যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী [ভগবদগীতা ২, ৬৯]।

(ঘ) বিষয়ৈরিন্দ্রিয়গ্রামো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
অজস্রং পূর্য্যমাণোঽপি সমুদ্রঃ সলিলৈরিব ॥

[সৌন্দরনন্দ ১৩, ৪১]—

তুলনীয় আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ

[ভগবদ্গীতা ২, ৭০ ; দ্রষ্টব্য, ঐ ২, ৬৪]।

(ঙ) ততঃ স্মৃতিমধিষ্ঠায় চপলানি স্বভাবতঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবারয়িতুমর্হসি ॥

[সৌন্দরনন্দ ১৩, ৩০]—

তুলনীয় তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

[ভগবদ্গীতা, ২, ৬৮ ; ঐ ২, ৫৮]।

॥ ১০ ॥

অশ্বঘোষের কাব্য দুইটীতে বাক্যাংশের এবং পাদ বা পাদাংশের পুনরুক্তির বাহুল্য দেখা যায়। ইহা অবশ্য কবির শক্তিহীনতা প্রমাণ করে না ; কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি কাব্যকে প্রযত্নবিশিষ্ট অথবা মার্জ্জিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কবি কি উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এই স্থলে পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

কৃতাঞ্জলি র্বাক্যম্ উবাচ নন্দঃ [সৌন্দরনন্দ ১০, ৪৯ ; ১৮, ৩৯]।
ন চাত্র চিত্রং যদি [ঐ ৯, ৩] ; **কিম্ অত্র চিত্রং যদি**

[ঐ ১৬, ৮৪]।

রাজেব লক্ষ্মীম্ অজিতাং জিগীষন্ [ঐ ১৬, ৮৫] ; **রাজেব দেশান্ অজিতান্ জিগীষুঃ** [ঐ ১৭, ৫৬]।

মুখেন সাচীকৃতকুণ্ডলেন [ঐ ৪, ১৯]; **মুখেন তির্য্যঙ্‌নত-কুণ্ডলেন** [ঐ ৬, ২]।

গিরম্ ইত্যুবাচ [ঐ ৬, ২০ ; ১০, ৪৭ ; বুদ্ধচরিত ৭, ৩৭, ইত্যাদি]।

বচাংস্যুবাচ [সৌন্দরনন্দ ৬, ৩৮ ; বুদ্ধচরিত ১, ৫৯]।

বিললাপ তত্তৎ [সৌন্দরনন্দ ৬, ১২ ; ৭, ১২]।

বিয়দ্ উৎপত্য [ঐ ১, ২৮]; **বিয়দ্ উৎপপাত** [ঐ ১০, ৩]।

ইবাবভাসে—[ঐ ৫, ৫২, ৫৩ ; ১০, ৮ ; ১৭, ৬১]।

আর্য্যেণ মার্গেণ—[ঐ ১৬, ৩৯ ; ১৭, ৩৪ ; বুদ্ধচরিত ১, ৮৪]।

গৃহপ্রয়াণায় **মতিং চকার**—[সৌন্দরনন্দ ৫, ১১]; তদ্বিপ্রয়োগায় **মতিং চকার** [ঐ ১৭, ৪৪]; অর্হত্ত্বলাভায় **মতিং চকার** [ঐ ১৭, ৫৬]; অভিনির্য্যাণ-বিধৌ **মতিং চকার** [বুদ্ধচরিত ৫, ২১]; পরিনির্ব্বাণবিধৌ **মতিং চকার** [ঐ ৫, ২৫]; তুরগস্থানয়নে **মতিং চকার** [ঐ ৫, ৭১]; তদ্ধৈর্য্যভেদায় **মতিং চকার** [ঐ ১৩, ৩৪]।

যক্ষাধিপাঃ **সংপরিবার্য্য তস্থুঃ** [ঐ ১, ৩৬]; **তস্থুশ্চ পরিবার্য্যৈনম্** [ঐ ৪, ৩৮]; মনুষ্যবর্য্যং **পরিবার্য্য তস্থুঃ** [ঐ ৭, ৩৭]।

লোকস্য কামৈর্নহি তৃপ্তিরস্তি [সৌন্দরনন্দ ৫, ২৩]; **লোকস্য কামৈর্ন বিতৃপ্তিরস্তি** [বুদ্ধচরিত ১১, ১২]।

কনকাবদাত-[সৌন্দরনন্দ ১০, ৪ ; ১৮, ৫ ; বুদ্ধচরিত ১, ২৬]।

মৃদুশাদ্বল-[সৌন্দরনন্দ ১, ৬ ; বুদ্ধচরিত ৩, ১]।

ভ্রমন্তি দৃষ্টী **র্বপুষাক্ষিপন্ত্যঃ** [সৌন্দরনন্দ ১০, ৩১]; তস্য তা **বপুষা-ক্ষিপ্তাঃ** [বুদ্ধচরিত ৪, ৬]।

মদনৈককার্য্য-[সৌন্দরনন্দ ৪, ১ ; ১০, ৩৫]।

সোর্ণভ্রুবং বারণবস্তিকোশম্ [বুদ্ধচরিত ১, ৬৫]; দৃষ্ট্বা **শুভোর্ণভ্রুবম্** আয়তাক্ষম্ [ঐ ১০, ৯]; **সোর্ণভ্রূ** সুমৃদুজালপাণিপাদ-[শারীপুত্রপ্রকরণ ১৬]।

অবিকৃখিত্তেন হিদয়েন **আদংসো ধারয়িতব্বো** [ঐ ৮৬];—

লেখার্থম্ **আদর্শম্** অনঙ্গচিত্তো বিভূষয়ন্ত্যা মম **ধারয়িষ্যা** [সৌন্দরনন্দ ৬, ১৮]।

কাসাম্বিণ্ডদাসাম্ [ঐ ১০, ৩৮ ; বুদ্ধচরিত ৩, ১৬]।

কবি **চল** এই বিশেষণটী বোধ হয় খুব পছন্দ করিতেন। এটী বিশেষণ হিসাবে

বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাসের মধ্যেও যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—**চলকুণ্ডল, চলচিত্রচন্দ্রক, চলনূপুর, চলঘোক্ত্রক, চলসৌহৃদ, চলাঞ্চন, চলেক্ষণ, চলেন্দ্রিয়, চলাক্ষ**। কালিদাসের কাব্যেও এই শ্রুতিমধুর-বিশেষণটীর অনতিবিরল প্রয়োগ আছে। যথা,—

সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যা **শ্চলোর্ম্মি** [মেঘদূত ২৪]।

॥ ১১ ॥

অশ্বঘোষের লেখায় অনেক অপাণিনীয় বা আর্ষ প্রয়োগ আছে। ইহার অধিকাংশই (বিশেষতঃ বুদ্ধচরিতে) অবশ্য লিপিকার-প্রমাদ-জনিত। বুদ্ধচরিতের ভাষার আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে [S. Sen, On the Buddhacarita of Asvaghosa, Indian Historical Quarterly, 1926]। **বৌদ্ধ সংস্কৃতের** অনেক পদ ও বাক্য অশ্বঘোষ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। **আর্ষ সংস্কৃতের** (Epic Sanskrit) বিশিষ্ট বাক্যও অনেক আছে, যথা,—**ধিষ্ণ্য** [=আবাস], **রুশন** [=স্বর্ণ,] **গন্ত্রী** [=শকট], **লেখর্ষভ** [=ইন্দ্র], **যাচিতক** [=ঋণ ; দ্রষ্টব্য পাণিনি ৪, ৪, ২১], **তন্দ্রি** [=অগভীর নিদ্রা], **বিভী** [=ভীত], **বিনাকৃত** [=বিযুক্ত], ইত্যাদি।

অশ্বঘোষ **সনন্ত** ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাকাব্য দুইটীতে এই সকল সনন্ত পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।—

যিযাসন্তি, পরীপ্সন্তি, জিগীষন্তি, জিঘৃক্ষতি, অচিকীর্ষীৎ, অজিহীর্ষীৎ, অবিবক্ষীৎ, অদিধক্ষীৎ, প্রবিবিক্ষতি, তিতীর্ষতি, তিতীর্ষেৎ, অভিলিপ্সসে, চিক্রীষন্তি, চিকিৎসয়েৎ। চিকীর্ষন্ত্, রিরক্ষিষন্ত্, আরুরুক্ষন্ত্, জিহীর্ষন্ত্, উজ্জিহীর্ষন্ত্, ঈপ্সন্ত্, মুমূর্ষন্ত্, দিৎসন্ত্, জিগীষন্ত্। নিশ্চিক্রমিষু-, মুমুক্ষু-, অমুমুক্ষু-, নির্মুমুক্ষু-, বিমুমুক্ষু-, যিযাসু-, বিজিজ্ঞাসু-, বুভুক্ষু-, পিপাসু-, তিতীর্ষু-, নিস্তিতীর্ষু-, দিদৃক্ষু-, জিহীর্ষু-, উজ্জিহীর্ষু অভ্যুজ্জিহীর্ষু-, শুশ্রূষু-, প্রেপ্সু-, অনীপ্সমান-, জিগীষু-, জিঘৃক্ষু-, জিঘাংসু-, বিজিঘাংসু-, দিধক্ষু-, বিবৎসু-, শিশয়িষু-, বিবক্ষু-, প্রবিবক্ষু-, মুমূর্ষু-, জিজীবিষু-, বিবিক্ষু-প্রবিবিক্ষু-, উৎসিসৃক্ষু-, পিপঠিষু-, জিজাগরিষু-, চিকীর্ষু-, যুযুৎসু-। দিদৃক্ষা, চিকীর্ষা, জিঘাংসা, বিবক্ষা, প্রবিবক্ষা, জিজীবিষা, বিবৎসা, নিশ্চিক্রমিষা, দিৎসা, বুভুৎসা, জিগীষা,

অন্নুজিঘৃক্ষা, বিনিনীষা, আরুরুক্ষা, প্রযিযাসা, তিতাড়য়িষা, ঈপ্সা, লিপ্সা, রিরংসা, তিতীর্ষা, নিস্তিতীর্ষা, নির্মুমুক্ষা, অন্নুজিঘৃক্ষুতা।

ভট্টিকাব্যেও এত সনন্তের প্রয়োগ আছে কিনা সন্দেহ!

অশ্বঘোষের কাব্যে ক্রিয়াপদের এতাদৃশ বাহুল্য দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে ভট্টিকাব্যকেও পরাজিত করে। যেমন,—

ন চাজিহীর্ষীদ্ বলিমপ্রবৃত্তং ন চাচিকীর্ষীৎ পরবস্তুভিধ্যাম্।
ন চাবিবক্ষীদ্ দ্বিষতামধর্ম্মং ন চাদিধক্ষীদ্ হৃদয়েন মন্যুম্॥

[বুদ্ধচরিত ২, ৪৪]।

নাধ্যৈষ্ট দুঃখায় পরস্য বিদ্যাম্।
জ্ঞানং শিবং যত্তু তমধ্যগীষ্ট॥ [ঐ ২, ৩৫]।

রুরোদ মম্লৌ বিরুরাব জগ্লৌ বভ্রাম তস্থৌ বিললাপ দধ্যৌ।
চকার রোষং বিচকার মাল্যং চকর্ত্ত বক্ত্রং বিচকর্ষ বস্ত্রম্॥

[সৌন্দরনন্দ ৬, ৩৪]।

॥ ১২ ॥

সম্ভবতঃ অশ্বঘোষ **সৌন্দরনন্দ** এবং **বুদ্ধচরিত** ঠিক কাব্য হিসাবে রচনা করেন নাই। এই দুইটী বৌদ্ধধর্ম্মের মূলকথা কাব্যের আবরণে প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হয়ত **সৌন্দরনন্দ** রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, যেমন ভট্টিকাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও কাব্য দুইটীতে—বিশেষতঃ সৌন্দরনন্দে—অশ্বঘোষের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে শুধু কালিদাস ভিন্ন এই রকম অসামান্য কবিত্ব শক্তির অধিকারী কেহই ছিলেন না—এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। এমন কি, কবি-কুলগুরু কালিদাসও স্থানে স্থানে অশ্বঘোষের উপমা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে অশ্বঘোষের কবিত্বশক্তির পরিচয় কিছু পাওয়া যাইবে।

(ক) ততঃ স বালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতো বহ্নিরিবানিলেন।
ক্রমেণ সম্যগ্ ববৃধে কুমারস্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমস্কে॥

[বুদ্ধচরিত ২, ২০]।

ইহার সহিত তুলনা করুন কালিদাসের

পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদ্ ইব বালচন্দ্রমাঃ॥

[রঘুবংশ ৩, ২২]।

এবং—পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥

[কুমারসম্ভব, ১, ২৫]।

(খ) সুজাতা বুদ্ধের নিকট আহার লইয়া আসিয়াছেন। কবি তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন,—

সিঁতশঙ্খোজ্জ্বলভুজা নীলকম্বলবাসিনী।
সফেনমালা নীলাম্বুর্যমুনেব সরিদ্বরা॥ [বুদ্ধচরিত ১২, ১০৭]।

তুলনা করুন—

অস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ বারিবিহারকালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি॥

[রঘুবংশ ৬, ৪৮]।

(গ) হিমালয়ের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

বহ্বায়তে তত্র সিতেঽপি শৃঙ্গে সংক্ষিপ্তবর্হঃ শয়িতো ময়ূরঃ।
ভুজে বলস্যায়তপীনবাহো বৈর্দূর্য্যকেয়ূর ইবাবভাসে॥

[সৌন্দরনন্দ ১০, ৮]।

ইহার সহিত তুলনীয়—

শোভামদ্রেস্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীম্
অংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥ [মেঘদূত ৫৯]।

(ঘ) কাসাঞ্চিদাসাং বদনানি রেজু র্বনান্তরেভ্যশ্চলকুণ্ডলানি।
ব্যাবিদ্ধপর্ণেভ্য ইবাকরেভ্যঃ পদ্মানি কাদম্ববিঘট্টিতানি॥

[সৌন্দরনন্দ ১০, ৩৮]।

অর্থালঙ্কারের মধ্যে অশ্বঘোষ **উপমা** এবং **উৎপ্রেক্ষার** প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন। অন্যান্য জটিলতর অলঙ্কারেরও অবশ্য অসদ্ভাব নাই। শব্দালঙ্কারের মধ্যে কবি অনুপ্রাস ও যমকের খুব ভক্ত ছিলেন। তবে সে যমক অর্ব্বাচীন সংস্কৃতকাব্যে প্রযুক্ত উৎকট যমক নহে। কালিদাসের মধ্যেও এইরূপ মৃদু যমকের প্রয়োগ দেখা যায়।

(ক) স **রাজ**সূনু র্মৃগ**রাজ**গামী **মৃ**গাজিরং তন্ **মৃ**গবৎ প্রবিষ্টঃ।
লক্ষ্মীবিযুক্তোঽপি শরীর**লক্ষ্ম্যা** চক্ষূংষি সর্ব্বাশ্রমিনাং জহার॥

[বুদ্ধচরিত ৭, ২]।

তুলনীয়—

ততো **মৃগেন্দ্রস্য মৃগেন্দ্র**গামী **বধায় বধ্যস্য শরং শর**ণ্যঃ।
জাতাভি**ষঙ্গো** নৃপতি র্নিষঙ্গাদ্ **উদ্ধ**র্তুম্ ঐচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ॥

[রঘুবংশ ২, ৩০]।

(খ) সা **পদ্ম**রাগং বসনং বসানা **পদ্মা**ননা **পদ্ম**দলায়তাক্ষী।
পদ্মা বিপদ্মা পতিতাচলাক্ষী শুশোষ **পদ্মা**স্রগিবাতপেন॥

[সৌন্দরনন্দ ৬, ২৬]।

(গ) স্থিতে বিশিষ্টে ত্বয়ি সংশ্রয়ে **শ্রয়ে** যথা ন যায়ী বহুসং**দিশং দিশম্**।
যথা চ লব্ধা ব্যসন**ক্ষয়ং ক্ষয়ং** ব্রজামি তন্ মে কুরু শং**সতঃ সতঃ**॥

[ঐ ১০, ৫৭]।

তুলনীয়—

ব্যস্থিতসিন্ধুম্ অনীর**শনৈঃ শনৈর্** অমরলোকবধূজ**ঘনৈর্ ঘনৈঃ**।
ফণভৃতাম্ অভিতো **বিততং ততং** দয়িতরম্যলতাব**কুলৈঃ কুলৈঃ**॥

[কিরাতার্জ্জুনীয় ৫, ১১]।

॥ ১৩ ॥

কাব্য দুইটীতে এবং খণ্ডিত নাটকটীতে এই ছন্দঃগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনুষ্টুভ্, উপজাতি, বংশস্থ, মালিনী, শিখরিণী, বসন্ততিলক, পুষ্পিতাগ্রা, প্রহর্ষিণী, সুন্দরী, রুচিরা, সুবদনা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, শালিনী, হরিণী, স্রগ্ধরা, আর্য্যা।

সৌন্দরনন্দে আরও তিন চার রকমের ছন্দঃ আছে। তন্মধ্যে একটী এই রকম—

— ⏑ — ⏑ — — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — (প্রথম ও তৃতীয় পাদ)

⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — ⏑ — (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ)।

অশ্বঘোষের প্রচলিত কাব্যে **মন্দাক্রান্তার** প্রয়োগ নাই ; তবে তত্তুল্য **কুসুমিত-লতাবেল্লিতকের** প্রয়োগ আছে [সৌন্দরনন্দ ৭,৫২]। ইহার পাদবিভাগ এই রকম,—

— — — — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — — ⏑ —

তস্-মাদ্ ভিক্-ষার্-থং ম-ম গু-রু- রি-তো যা-বদে-ব

⏑ —

প্র-যা-তঃ

[তস্মাদ্ ভিক্ষার্থং মম গুরুরিতো যাবদেব প্রযাতঃ]

আদ্য গুরু অক্ষরটী ছাড়িয়া দিলেই ইহা মন্দাক্রান্তা হইয়া পড়ে।

সৌন্দরনন্দের অপর একটী ছন্দঃ [১২, ৪৩ ; ১৩,৫৬] এই রকম—

— — — — ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — — ⏑ — —

তস্-মাদ্ এ- ষাম্ অ কু-শ-ল- ক রা-ণাম্ অরী-ণাম্

[তস্মাদেষামকুশলকরাণামরীণাম্]।

এই ছন্দের শেষে একটী লঘু ও দুইটী গুরু অক্ষর যোগ করিলেই ইহা মন্দাক্রান্তা হইয়া পড়িবে।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রথম প্রয়োগ হরিষেণ কৃত **সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে**। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশেও পাওয়া যায়। কালিদাস সম্ভবতঃ হরিষেণের সমসাময়িক ছিলেন। খুব সম্ভব হয়ত কালিদাসই মন্দাক্রান্তা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কালিদাস যদি সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি হইতে এই ছন্দ পাইতেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই তিনি কুমারসম্ভবে প্রয়োগ করিতেন, কারণ এই ছন্দটী খুবই সুললিত, এবং ইহা কালিদাসের খুবই প্রিয় ছন্দ ছিল বলিয়া মনে হয়। **কুমারসম্ভব** কালিদাসের যত্ন-রচিত কাব্য ; অতএব এই ছন্দের অস্তিত্ব তাঁহার জানা থাকিলে তিনি ইহার প্রয়োগ অবশ্যই করিতেন। কালিদাসের লেখার মধ্যেই এই ছন্দের পরিণতির একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। **মালবিকাগ্নি-**

মিত্রে এই ছন্দঃ বেশ সুললিত নহে ; একটু বিষম, চেষ্টাকৃত বলিয়া বোধ হয়। **মোর্ব্বশীয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল** এবং **রঘুবংশে,** মন্দাক্রান্তার পর পর উন্নতি হইয়া **মেঘদূতে** ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে। হয়ত **মেঘদূত** কবির শেষ বয়সের রচনা।

॥ ১৪ ॥

সৌন্দরনন্দে কবি মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ বহুস্থলে করিয়া গিয়াছেন। এই প্রয়োগ **রামায়ণে** (বিশেষতঃ অর্ব্বাচীন অংশে) খুবই পাওয়া যায়।

দরীচরীণাম্ অতিসুন্দরীণাম্ মনোহরশ্রোণিকুচোদরীণাম্।
বৃন্দানি রেজুর্দিশি কিন্নরীণাং পুষ্পোৎকিরাণামিব বল্লরীণাম্॥
[সৌন্দরনন্দ ১০, ১৩]।

ততো মুনিস্তং প্রিয়মাল্যহারং বসন্তমাসেন কৃতাভিহারম্।
নিনায় ভগ্নপ্রমদাবিহারং বিদ্যাবিহারাভিমতং বিহারম্॥ [ঐ ৫,২০]।

এই শ্লোকটীতে প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে মিল আছে—

গুণবৎসু চরন্তি ভর্ত্তৃবদ্ গুণহীনেষু চরন্তি শত্রুবৎ।
ধনবৎসু চরন্তি তৃষ্ণয়া ধনহীনেষু চরন্ত্যবজ্ঞয়া॥ [ঐ ৮, ৪০]।

বুদ্ধচরিতে কেবল এই দুটী শ্লোকে মিল দেখিতে পাওয়া যায়—

বহ্নেশ্চ তোয়স্য চ নাস্তি সন্ধিঃ শঠস্য সত্যস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ।
আর্য্যস্য পাপস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য দণ্ডস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ॥
[৯, ৪১]।

লোভাদ্ বিমোহাদথবা ভয়েন যো বান্তমন্নং পুনরাদদীত।
লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সন্ত্যজ্য কামান্ পুনরাদদীত॥
[৯, ৪১ গ]।

পাদমধ্যে মিলও মাঝে মাঝে আছে।—

চলৎকদম্বে হিমবন্নিতম্বে
তরৌ প্রলম্বে চমরো ললম্বে। [সৌন্দরনন্দ ১০, ১১]।

সদ্বৃত্তবর্ম্মা কিল সোমবর্ম্মা [ঐ ৭, ৪২]

সংরক্তকণ্ঠৈরপি নীলকণ্ঠৈঃ

তুষ্টৈঃ প্রহৃষ্টৈরপি চান্যপুষ্টৈঃ [ঐ ৭, ১১]।

এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা বঙ্গীয় এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিক হইয়াছে।

শ্রীসুকুমার সেন

কাষ্ঠমণ্ডপ

বা

কাঠমণ্ডুর প্রাচীনত্ব

নেপাল-রাজবংশাবলীর মতে কাঠমণ্ডুর প্রাচীন নাম ছিল কান্তিপুর। কলিযুগের ৩৮২৪ বৎসরে (=৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা গুণকামদেব নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই কান্তিপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। একদিন মহালক্ষ্মী পূজার জন্য রাজা উপবাস করেন। সেই দিন দেবী স্বপ্নে রাজাকে বিষ্ণুমতী ও বাগ্মতীর সঙ্গমে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করবার আদেশ করেন। দেবীর খড়্গের অনুরূপে এই নগর নির্ম্মাণের আদেশ হয়। নগরের নামকরণ হয় কান্তিপুর। এই কান্তিপুরই বহুকাল ধরে নেপালের রাজধানী থাকে। পরে লক্ষ্মীনরসিংহমল্লদেবের সময় (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই নগরের নাম কাষ্ঠমণ্ডপে পরিণত হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথের যাত্রার সময় এক নাগরিক 'কল্পবৃক্ষে'র সন্ধান পান। কল্পবৃক্ষ সাধারণ মানুষের দেহ ধারণ করে যাত্রা দেখছিলেন। নাগরিক তাঁকে চিন্‌তে পেরে পাকড়াও করলেন ও বর চাইলেন। বহুদিন থেকে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, গোটা একটা গাছের কাঠ দিয়ে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের থাক্‌বার জন্য একটী মণ্ডপ তৈরী করেন। সে কাজ সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই তিনি কল্পবৃক্ষের কাছে সেই বর চেয়ে বস্‌লেন। কল্পবৃক্ষ 'তথাস্তু' বলে নিষ্কৃতিলাভ করলেন ও অন্তর্ধান হ'লেন। তারপর নাগরিক একটা গাছের কাঠ দিয়েই মণ্ডপ তৈরী করতে সমর্থ হ'লেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের পর থেকেই কান্তিপুরের নাম বদলে গিয়ে কাষ্ঠমণ্ডপ হ'ল। কাঠমণ্ডুর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে লোকে আজও সেই কাষ্ঠমণ্ডপ দেখিয়ে থাকে।[১] সে মণ্ডপ এখনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কল্পবৃক্ষের আবির্ভাবের কথা বাদ দিলেও এটা রাজবংশাবলী-রচয়িতার যে কপোল-

১ S. Levi, *Le Nepal* I, p 52-54

কল্পিত গল্প, তা'তে সন্দেহ নাই। তা' সত্বেও সকল পণ্ডিতই কাষ্ঠমণ্ডপ নাম যে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রাচীন নয়, তাই মনে করে আস্‌ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পুথি আমার চোখে পড়েছে। নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে লক্ষ হোমবিধির একখানি প্রাচীন পুথি আছে। গ্রন্থকর্ত্তা শৈবাচার্য্য তেজব্রহ্ম। পুথি নেপাল সম্বৎ ৫৩১ = ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এই পুথির অন্ত্যবাক্যে কাষ্ঠমণ্ডপ নগরের নাম দেখা যায়।

শ্রেয়োঽস্তু, সম্বৎ ৫৩১ বৈশাখ শিতনবম্যাস্তিথৌ
লিখিতং ইদং শ্রীকাস্তমণ্ডপ নগরে শ্রীভীমদত্ত
সোমশর্ম্মণা লিখিতমিদং।[২]

নেপালী লেখক 'ট' বর্ণকে 'ত' উচ্চারণ করত বলে কাস্তমণ্ডপ লিখেছে। বস্তুতঃ শ্রীকাস্তমণ্ডপ নগর শ্রীকাষ্ঠমণ্ডপ নগর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাষ্ঠমণ্ডপ নাম রাজা লক্ষ্মীনরসিংহমল্লদেবের আবির্ভাবের (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ সময়ের শিলালেখে ও পুথির অন্ত্যবাক্যে কান্তিপুর নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, যুগবিশেষে দুই নামই প্রচলিত ছিল।[৩] পরবর্ত্তী কালে কাষ্ঠমণ্ডপ নামই সার্ব্বজনীন হ'য়ে ওঠে ও কান্তিপুর নাম রাজকীয় পুথিপত্রে পরিত্যক্ত হয়। প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডপ নগরের এক অংশ এখনও কান্তিপুর নামে পরিচিত। অন্য অংশ কাষ্ঠমণ্ডপ নামে অভিহিত। এই অংশের রাজপথকে 'আসন টোল' বলা হয়। 'আসন টোল' নামও যে প্রাচীন, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। সম্বৎ ১০৩ = ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক ক্রয়-বিক্রয় পত্রে "শ্রীআসমণ্ডপ টোল"-এর উল্লেখ আছ।[৪]

২ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই পুথির বর্ণনা করেছেন। *A Catalogue of Palmleaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal* II, পৃ ৮৪; কিন্তু তাঁর বর্ণনায় কয়েকটী ভ্রম রয়েছে। তাঁর বর্ণনার অন্ত্যবাক্য এই ভাবে লিখিত হয়েছে—"শ্রেয়াঽস্তু সম্বৎ ৫৩১ বৈশাখস্ত শিতনবম্যাং তিথৌ লিখিতমিদং শ্রীকাস্তমণ্ডপ নগরে শ্রীভীমদত্ত সোমশর্ম্মাণোঽলিখিৎ"।

৩ ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পরেও 'কান্তিপুরী' নগরের উল্লেখ দেখা যায়। শাস্ত্রী, *Durbar Library Catalogue* II, p 197, পার্থিবার্চ্চন চূড়ামণি—(১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) "নেপালে বহু পীঠমণ্ডিতশিবে কান্তপুরী রাজতে।" পৃ. ১৯৬ পূজাকল্পলতা, (লিখিত ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) "কান্তপুরীর রাজা প্রতাপমল্লের গুরু নারায়ণ ভাহকের পুথি।" পৃ ২৭৩ পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী—(লিখিত ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে)—"কান্তিপুর নগরে লিখিতৈষা।"

৪ এই সব ক্রয়-বিক্রয়-পত্রের কয়েকখানি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। সব চেয়ে যে প্রাচীনখানার প্রারম্ভ এইরূপ—"শ্রেয়োঽস্তু ১০৩ পৌষ শুক্লত্রয়োদশ্যা শ্রীবংবু-ক্রমায়া শ্রীগাংগূল্যোশঃ শ্রীআসমণ্ডপটোলকে……" (সম্বৎ ১০৩ = ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, বংশাবলীর মতে কান্তিপুর বা প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডপের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গুণকামদেব। প্রতিষ্ঠাকাল— ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ। পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বংশাবলীর এই নির্দ্দেশকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরেছেন। সুতরাং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে কান্তিপুর বা কাষ্ঠমণ্ডপের অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়। নেপাল উপত্যকার প্রাচীনতম উপনিবেশ ললিতপট্টন (বর্ত্তমান পাটন) এবং দেবপট্টন (দেওপাটন)। পশুপতিনাথের মন্দির দেওপাটনের অংশবিশেষেই প্রতিষ্ঠিত। অষ্টম শতাব্দীতে অংশুবর্ম্মণের শিলালেখসমূহে যে কৈলাসকূটের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিচ্ছবিরাজ মানদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজধানী মানগৃহও সম্ভবতঃ দেওপাটনের অংশবিশেষে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৫]

দেওপাটন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিবেশ ছিল ; এবং মনে হয়, গুণকামদেবের সময় এই সন্নিবেশের বিস্তার আবশ্যক হয়। তখন বাগ্মতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থলের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। কারণ, দেওপাটনের উত্তর-পূর্ব্বে বাগ্মতী পরিখারূপে প্রবাহিত। জমিও অপেক্ষাকৃত নীচু। নূতন প্রতিষ্ঠিত কান্তিপুর নগর কালক্রমে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহসমূহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং সেই জন্যই বোধ হয়, কাষ্ঠমণ্ডপ নাম সার্ব্বজনীন হয়।

নেপালের প্রাচীন ঔপনিবেশিক নেওয়ার জাতি এই স্থানকে অন্য নামে অভিহিত করিত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর ক্রয়-বিক্রয়-পত্রে "শ্রীযংবুক্রমায়াং গাংগুলঙ্গের"[৬] উল্লেখ দেখা যায়। গাংগুলঙ্গ কাষ্ঠমণ্ডপের অংশবিশেষের নাম। শ্রীযংবুক্রমা কাষ্ঠমণ্ডপের নেওয়ারী নাম। ললিতপট্টনও ললিতক্রামা[৭] হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ারী ভাষায় কাষ্ঠমণ্ডপের বর্ত্তমান নাম 'য়ে'। তিব্বতীরা কাষ্ঠমণ্ডপ নগরকে যংবু নামেই অভিহিত করেছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই যংবু নগরের বৌদ্ধবিহার-সমূহে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ হয়। সে সমস্ত অনুবাদ তান-জুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যংবু নগরে বিহারসমূহে যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হয়, তার তালিকা—Cordier, *Index du Bstan-hgyur* থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া গেল,—

৫। S. Levi, Le Nepal II, পৃ ১০৬, ১৩৮।

৬। শাস্ত্রী মহাশয় (Durbar Library Cat. পৃ ৮) লিখেছেন,—The word গাঙ্গুলঙ্গ is a Newari word, meaning 'real' কিন্তু তা ঠিক নয়।

৭। S. Levi, Le Nepal, I, পৃ ৫৪, পা. টী. ২।

(পৃ ৪) বুদ্ধস্য স্তোত্রনাম। অনুবাদক—জেতকর্ণভদ্র ও সূর্য্যরাজ শ্রীভদ্র। স্থান য়ম্-বু—নেপাল।

(পৃ ১৬) পরমার্থসংগ্রহ নাম সেকোদ্দেশ টীকা। অনু.—কাশ্মীর দেশীয় ধর্ম্মধর। স্থান—য়ম্-বু।

(পৃ ২৭) শ্রীচক্রসম্বরনামপঞ্জিকা। অনু.—দেবীকোট নগরের অতুল্যবজ্র। স্থান—রূ-পন্-ব-রো (*Ru-pan-hbat-ro*) বিহার—যম্-বু।

(পৃ ৩১) শ্রীডাকার্ণবমহাযোগিনীতন্ত্ররাজটীকা। অনু.—জয়সেন। স্থান—লুন্-গি-গ্রু-পা (Lhun-gyis-grub-pa), য়ু-তুং-যম্-বু নগর।

(পৃ ৫০) শ্রীসম্বরোদয়সাধন। গ্রন্থকার—নেপালী ক্ষান্তিশ্রী। অনু.—শোংদেশীয় স্থিরমতি। স্থান—নেপাল রাজধানীর গোহম্ বিহার।

(পৃ ৭৭-৭৮) ভিক্ষাবৃত্তি। গ্রন্থকার—ডোম্বীপাদ। অনু.—জেতকর্ণ ও সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র। স্থান—যম্-বু।

(পৃ ১৪৯) চতুরঙ্গসাধনটীকা। গ্রন্থকার—সমন্তভদ্র। অনু.—নয়নশ্রী। স্থান—নেপালের রাজধানী।

(পৃ ২২৫) চর্য্যাগীতিনামকোষবৃত্তি। গ্রন্থকার—মুনিদত্ত। অনু.—কীর্তিচন্দ্র। স্থান—যম্-বু।

(পৃ ২৫২) চিত্তরত্নবিশোধনমার্গফল। গ্রন্থকার—কাশ্মীরদেশীয় শাক্যশ্রীজ্ঞান। অনু.—মৈত্রীশ্রী। স্থান—নেপাল—যম্-গল, 'Yam- hgal' বিহার।

(পৃ ২৫২) বন্ধবিমুক্তিউপদেশ। অনু.—মৈত্রীশ্রী। স্থান—নেপাল। গু-লং সের-খং (Gu-lan gser-khan) বিহার।

(পৃ ২৬৫) ক্রিয়াসংগ্রহ। গ্রন্থকার—কুলদত্ত। অনু.—কীর্ত্তিচন্দ্র। স্থান—নেপাল রাজধানীর স্থুই কুন-গ-র-ব, Gshuhi-kun dgah-ra-ba = ধ্বম্বারাম নামক মহাবিহার।

(পৃ ৩৫৫) ক্রোধরাজোজ্জ্বলবজ্রাশনিনামমণ্ডলবিধি। অনু.—নেপালী দেবপূর্ণমতি। স্থান—নেপাল। নেপাল রাজধানীর যে সব বিহারের নাম করা হ'ল, তন্মধ্যে গোহম্ বিহার ও রাজা অংশুবর্ম্মণের শিলালেখে উল্লিখিত গুম্ বিহার এক হ'লেও হ'তে পারে। গুম্-বিহারের সংস্কৃত নাম—মণিচৈত্য। মণিচৈত্য শাঁকু নগরে অবস্থিত। লুন-গি-গ্রু পা বিহার স্বয়ম্ভু। রূ-পন্-ব-রো-যম্-গল ও গু-লং সের-খং বিহার কোথায় অবস্থিত ছিল, তা নির্দ্ধারণ করতে পারিনি।

তিব্বতীতে নাম নানাভাবে লিখিত—হয়েছে য়ম্-পু (Yam-pu); য়ম্-বু (Yam-bu)। পার্কার সাহেব মনে করেছিলেন যে, ইহা স্বয়ম্ভু নামেরই রূপান্তর। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের মূলে কোনই সত্য নাই; কারণ, তিব্বতী পণ্ডিতেরা 'য়ম্-বু' ও 'স্বয়ম্ভু'কে পৃথগ্‌ভাবেই দেখেছেন। তান্-জুরের অন্তর্গত শ্রীডাকার্ণব-মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজটীকার তিব্বতী অনুবাদের অন্ত্যবাক্যে "য়ম্-বু নগরস্থিত য়ু-তুংগ্রামের লুন-গি. গ্রু-পা বিহারের" উল্লেখ রয়েছে। (Le vihara de *Lhun-gyis. grub-pa* a Yu-tun dans la ville *Yam-bu* au Nepal.—Cordier, Index du Bstan-hgyur, I p.31). কর্দ্দিয়ে সাহেব বিহারের নাম 'নিরাভোগ' এবং য়ম্-বুর নাম 'স্বয়ম্ভূতে' পরিবর্ত্তিত করেছেন, কিন্তু এর কোনই নজীর নাই। কারণ, 'লুন্-গি-গ্রু-পা'-এর অর্থ 'নিরাভোগ' নহে—'স্বয়ম্ভু' ("Self-created"—S. C. Das, *Tibetan Dictionary*, 1339)। সুতরাং গ্রন্থের অন্ত্যবাক্যের ঠিক অর্থ হচ্ছে—"য়ম্-বু নগরের অন্তঃপাতী য়ু-তুং গ্রামস্থিত স্বয়ম্ভু বিহার।" উপরন্তু 'স্বয়ম্ভু' যুগেই ভ্রমক্রমেও নগর আখ্যা পেতে পারে না। কারণ, ইহা একটী ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত চৈত্য। এই চৈত্যের চারিদিকে প্রাচীন বিহার এখনও রয়েছে। এবং গুম্ফাও বর্ত্তমান। গুম্ফা তিব্বতী কথা। এর অর্থ হচ্ছে বিহার। স্বয়ম্ভু চৈত্যের এক কোণে অবস্থিত এইগুম্ফায় এখনও তান্-জুর ও কান্-জুর সংরক্ষিত রয়েছে। তিব্বতী লামারা এখনও মাঝে মাঝে এসে সেখানে অবস্থান করেন।

সুতরাং তিব্বতীদের য়ম্-বু নগর প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডপেরই নামান্তর। দশম শতাব্দীর নেওয়ারী-ক্রয়-বিক্রয়পত্রের যংবু-ক্রমাও বর্ত্তমান নেওয়ারদের য়েঁ. থেকে পৃথক্ নয়। তিব্বতীরা নেওয়ারদের থেকেই যে এ নাম গ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নেওয়ার জাতি নেপাল উপত্যকার প্রথম অধিবাসী এবং তাদের দেওয়া নামই সম্ভবতঃ কাঠমণ্ডুর সব চেয়ে প্রাচীন নাম। অষ্টম শতাব্দীতে গুণকামদেবের কান্তিপুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও বাগ্মতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কোন সন্নিবেশ এই নেওয়ারী নামে পরিচিত ছিল। সেই সন্নিবেশ যখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, তখন কৈলাসকূটের রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং নূতন নামে (কান্তিপুরে) অভিহিত হয়েছিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মহায়ানবিংশক

নিবেদন

এই পুস্তিকাখানির মূল সংস্কৃত এখনো পাওয়া যায় নাই। জাপানের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুসুমু যমগুচি খ্রীষ্টীয় ১৯২৭ সালে *The Eastern Buddhist* (Vol. IV, Nos. 1-2, pp. 56-57, 167-176)-নামক পত্রিকায় স্বকৃত ইংরাজী অনুবাদের সহিত ইহার তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা পড়িয়া আমার মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। তাই আমি যত দূর পারিয়াছি, ঐ তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ মিলাইয়া, তাহা হইতে মূল সংস্কৃতকে পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করি। পাঠকগণের নিকটে আজ তাহাই উপস্থাপিত হইল।

মূল গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ দুইখানি আছে (তি১ ও তি২)। শ্রীযুক্ত যমগুচি ইহার 'লোহিত' বা পেকিং সংস্করণ (প) ব্যবহার করিয়াছেন; আমি ইহা আমাদের বিশ্বভারতী গ্রন্থশালার 'কৃষ্ণ' বা নারথাঙ সংস্করণের (ন) সহিত মিলাইয়া লইয়াছি। চীনা অনুবাদের (চী) সংস্করণের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, আমি ইহা সাঙ্ঘাই সংস্করণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি।

শ্রীযুক্ত যমগুচি কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তুলনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমি সেইরূপই অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র মতে ঐ সংখ্যা যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপেও তাহা কারিকাগুলির উপরে দেওয়া হইয়াছে।

আমার মনে হয়, চারিটি কারিকা মূলে পরে সংযোজিত হইয়াছে। এই কারিকা কয়টিকে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত করা হইয়াছে।

আমি আমার স্বরচিত ক্ষুদ্র বিবৃতিতে পূর্বোক্ত অনুবাদ তিনখানি (দুইখানি তিব্বতী ও একখানি চীনা) হইতে প্রত্যেক কারিকার প্রত্যেকটি চরণ পৃথক্ পৃথক রূপে সংস্কৃতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে-স্থানে অতি সামান্য হইলেও ইহাদের পরস্পর ঐক্য ও অনৈক্য দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছি। কোন্ অনুবাদের কোন্ অংশ বা শব্দ লইয়া কতটুকু কি পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও দেখাইতে যত্ন করিয়াছি। পুনরুদ্ধৃত কারিকাগুলির দুরূহ বাক্য বা শব্দ-সমূহের ব্যাখ্যা করিতেও কিছু চেষ্টা করিয়াছি।

একটি বঙ্গানুবাদও যোজিত হইয়াছে।

স্থানে-স্থানে উদ্ধৃত তিব্বতী ও চীনা শব্দগুলিকে উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে বাঙ্‌লায় যথাযথভাবে অনুলিখিত করিতে পারা যায় নাই। পাঠকগণ, ইহা ক্ষমা করিবেন।

এই প্রবন্ধের চীনা-অংশে আমার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি. তুচ্চি দয়া করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এ জন্য আমি তাঁহার নিকটে অত্যন্ত ঋণী।

পরিচয়

§ ১। মহাযানবিংশক

এই পুস্তিকাখানির নাম ম হা যা ন বিং শ ক। তিব্বতী ও চীনা, উভয় অনুবাদ হইতেই ইহা জানা যায়। তিব্বতী অনুবাদে তো এই সংস্কৃত নামটিই অনুলিখিত হইয়াছে, এবং ইহার আক্ষরিক অনুবাদও করা হইয়াছে থেগ. প. ছেন. পো. নি. ক্রি. শু। চীনা অনুবাদে ইহাকে বলা হইয়াছে তা শাঙ এর শি সুঙ লুঙ। ইহার আক্ষরিক অর্থ ম হা যা ন গা থা-(অথবা কা রি কা-) বিং শ ক শাস্ত্র।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই অথবা ঠিক এইরূপ নামের আরো দুইখানি পুস্তিকা আছে, ম হা যা ন বিং শ তি (তিব্বতী নাম থেগ. প. ছেন. পো. ক্রি. শু), ও ত ত্ত্ব ম হা যা ন বিং শ ক (তিব্বতী নাম দে. খো. ন. ক্রিদ. থেগ. প. ছেন. পো. ক্রি. শু)।[১] এই পুস্তিকা দুইখানি যে, আমাদের ম হা যা ন বিং শ ক হইতে একবারে ভিন্ন তাহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই বই দুইখানির মূল সংস্কৃত পাওয়া গিয়াছে, এবং ম. ম. শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অ দ্ব য় ব জ্র সং গ্র হে[২] এই দুইখানিকেই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এখানে নাম দুইটি একটু ভিন্ন দেখা যায়, যথাক্রমে ম হা যা ন বিং শ তি কা, ও ত ত্ত্ব বিং শ তি কা।

১। Cordier, Vol. II, p. 217.

২। Gaekwad Oriental Series, 1927, pp. 54, 52.

§ ২। গ্রন্থকার

ম হা যা ন বিং শ কে র রচয়িতা যে নাগার্জ্জুন তাহা তিব্বতী ও চীনা উভয় অনুবাদের ভণিতা হইতে জানা যায়। তি২ (দ্রষ্টব্য § ৩) অনুবাদে তাঁহার নামের পূর্ব্বে আ চা র্য্য (স্লোব. দপোন) এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু তি১ (দ্রষ্টব্য § ৩) অনুবাদে সেখানে দেখা যায় আ চা র্য্য আ র্য্য (স্লোব. দপোন. ফগস), এবং চী অনুবাদে নামের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ম হা- (তা)। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাগার্জ্জুন দেখা যায়। মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক নাগার্জ্জুন সুপ্রসিদ্ধ। ৮৪ জন সিদ্ধের মধ্যে অন্যতম নাগার্জ্জুন, ইহাও প্রসিদ্ধি আছে। তিব্বতী তঞ্জুরের গ্রন্থতালিকার তন্ত্রবৃত্তি (র্গ্যু দ. 'গ্রেল) প্রকরণে[৩] নাগার্জ্জুনের রচিত বলিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতা যে বস্তুতই নাগার্জ্জুন, ইহা বোধ হয় ঠিক করিয়াই বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত আ চা র্য্য ও আ চা র্য্য আ র্য্য ছাড়া নিম্নলিখিত বিশেষণগুলিও তাঁহার নামের সহিত প্রযুক্ত দেখা যায়, ম হা চা র্য্য, ম হা চা র্য্য আ র্য্য, ভি ক্ষু ও ভ ট্টা র ক। এই দুই নাগার্জ্জুনের কে এই পুস্তিকাখানির রচয়িতা এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয়, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত উপকরণ না পাওয়া যায়, তত দিন এ প্রশ্নের সুমীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। প্রথম নাগার্জ্জুনকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ পাওয়া যায় না। প্রথম নাগার্জ্জুন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ও দ্বিতীয় নাগার্জ্জুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ছিলেন বলিয়া ধরা হয়।

§ ৩। তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ

এই পুস্তিকাখানির দুইখানি তিব্বতী অনুবাদ আছে, এবং উভয়ই তঞ্জুরের তালিকার সূত্রবৃত্তি (মদো. 'গ্রেল) প্রকরণে রক্ষিত হইয়াছে।[৪] আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এই দুইখানিকে যথাক্রমে তি১ ও তি২ বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। এই উভয় অনুবাদের কর্ত্তা পরস্পরকে জানিতেন বা এক জন অপর জনের অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ইহা বুঝা যায় না।

৩। Cordier, Vol. III.

৪। Tanjur Gi, fols. 211 *b.* 8—213 *a.* 2; Tsa, fols. 156 *a.* 4—157 *a.* 5 (Cordier, Vol III, pp. 257, 293).

তি[১] অনুবাদ করিয়াছিলেন কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ (=জয়ানন্দ) ও তিব্বতের ভিক্ষু কীর্ত্তিভূতিপ্রজ্ঞ (দগে. লোঙ. গ্রগস. 'ব্যোর. শেস. রব), আর তি[২] অনুবাদ করিয়াছিলেন, ভারতের পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রভ (দগে. লোঙ. শা ক্য. 'ওদ)। শাক্যপ্রভ পূর্ব্বোল্লিখিত ত ত্ত্ব ম হা যা ন বিং শ তি-রও তিব্বতী অনুবাদ করেন। এই উভয় অনুবাদকের মধ্যে কেবল শাক্যপ্রভের সময় জানিতে পারা যায়। তিনি পালবংশের প্রতিষ্ঠাপক গোপালের সময়ে (৮ম শতক) ছিলেন।[৫] আমরা ইহার একখানি মাত্র চীনা অনুবাদ পাই। দানপাল (শি হু) ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে (৯৮০—১০০০) করিয়াছিলেন।[৬]

§ ৪। মূল পুস্তিকার কাল

যে পর্য্যন্ত ইহার ঠিক রচয়িতা স্থির না হইতেছে অথবা আরো উপকরণ পাওয়া না যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইহার সময়ও নির্ণয় করা সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না। তবে দশম শতকে যে ইহা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত চীনা অনুবাদেরই দ্বারা জানা যায়। তিব্বতীতে দ্বিতীয় অনুবাদক শাক্যপ্রভ যখন গোপালের সময়ে ছিলেন, তখন সহজেই বলিতে হয়, অষ্টম শতকে যে পুস্তিকাখানি প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রচয়িতা বলিয়া নাগার্জ্জুনের নাম সংস্পৃষ্ট থাকায় বলিতে পারা যায় যে, ইহা সপ্তম শতকের পরবর্ত্তী নহে। এই সময়টি অন্য একটি ঘটনার দ্বারাও সমর্থিত হয়। বলা গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রভূতি সপ্তম শতকের অথবা তাহার কয়েক বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্ঞা ন সি দ্ধি তে[৭] (৯৮) লিখিয়াছেন—

> কল্পনাজলপূর্ণস্য সংসারস্য মহোদধেঃ।
> বজ্রযানমনারুহ্য[৮] কো বা পারং গমিষ্যতি॥

ইহা বস্তুত আমাদের ম হা যা ন বিং শ কে র ২২শ শ্লোক, কেবল একটু মাত্র ভেদ এই যে, তৃতীয় চরণে ব জ্র যা ন শব্দের স্থানে শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে ম হা যা ন আছে। জ্ঞা ন-সি দ্ধি তে বজ্রযান, এবং ম হা যা ন বিং শ কে মহাযান আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এই ভেদটি খুবই যুক্তিযুক্ত। উভয় গ্রন্থের মধ্যে এই ঐক্যটি যে আকস্মিক নহে, এবং ইন্দ্রভূতিই যে

৫। Poussin, *Pancakrama*, 1896, p. ix.

৬। B. Nanjio, No. 1308.

৭। *Two Mahayana Texts*, ed. Dr Benoytosh Bhattacharyya, GOS, Baroda, 1929, p. 68.

৮। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ "সমারুহ্য", কিন্তু ইহা যে ভুল তাহা স্পষ্টতই বুঝা যায়।

ইচ্ছা করিয়া ইহা মহাযানবিংশক হইতে উদ্ধৃত করিয়া ও সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ গ্রন্থে যোগ করিয়াছেন, তাহা এই ঘটনা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে তিনি অন্যান্য পুস্তক হইতে বহু উপকরণ ও শ্লোক লইয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; এ কথা তিনি নিজেও প্রকাশ করিয়াছেন।[৯]

§ ৫। ইহার প্রামাণিকতা

আলোচ্য পুস্তিকাখানি যে প্রামাণিক, তাহা জ্ঞানসিদ্ধিতে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি হইতে বুঝা যায়। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহায় (পৃ. ৬) আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ের[১০] সংস্কৃত টীকায় মহাযানবিংশকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আগম[১১] বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতিভয়ঙ্করম্।
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেঽপ্যবুধস্তথা ॥ ১০ ॥

উল্লিখিত টীকাখানিতে আগম শব্দটি যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই যে তাহা বিশেষ বা একইরূপ প্রামাণিকতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা মনে না করিতেও পারা যায় ; কারণ, উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারা যায় যে, যদিও ঐ শব্দটি কোনো কোনো স্থানে (পৃ. ৫৬) সমাধিরাজ[১২] অথবা (পৃ. ৫৮) গণ্ডব্যূহের[১৩] মত অতি প্রাচীন শাস্ত্রকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহা বহু পরবর্ত্তী গ্রন্থকেও বুঝাইতে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন, এক স্থানে (পৃ. ৭০) একটি অপভ্রংশ-বাক্যকে[১৪], অথবা (পৃ. ৭৩) অদ্বয়-বজ্রের মহাযানবিংশতির (কিংবা মহাযানবিংশিকার)[১৫] একটি শ্লোককে[১৬] আগম বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে অদ্বয়বজ্রের সময় খ্রীষ্টীয় ৯৭৪-১০৩০ মধ্যে।

৯। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৫, "সর্ব্বতন্ত্রে স্থিতং তত্ত্বং তেভ্যঃ (?) কিঞ্চিন্নিগদ্যতে" ; পৃ ৫৯, "তত্ত্বসংগ্রহতন্ত্রাদৌ স্থিতম্" ; পৃ ৬৯, 'যুক্তিরপ্যুচ্যতেঽধুনা। যোগতন্ত্রোক্তদৃষ্টান্তৈঃ।" পৃ ৬৫, 'উক্তং চ কল্পান্তাদ°" দ্রষ্টব্য ১৫শ পরিচ্ছেদ।

১০। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নহে। দ্রষ্টব্য প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৬ পৃ. ১১।

১১। চন্দ্রকীর্ত্তি স্বকীয় মধ্যমকবৃত্তিতে (পৃ. ৭৫) বলিয়াছেন—"সাক্ষাদতীন্দ্রিয়ার্থবিদামাপ্তানাং যদ্বচনং স আগমঃ।"

১২। "যথা কুমারী" ইত্যাদি (Buddhist Text Society, p. 29)। এখানে বহু অশুদ্ধ পাঠ দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টব্য—চন্দ্রকীর্ত্তির মধ্যমকবৃত্তি, পৃ. ২৭৮।

১৩। "ধূমেন জায়তে বহ্নিঃ"। দ্রষ্টব্য সুভাষিতসংগ্রহ, পৃ. ১৩।

১৪। "জিম জল"।

১৫। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ (GOS), পৃ ৫৪।

১৬। "ন ক্লেশা বোধিতো ভিন্নাঃ"।

§ ৬। কারিকার সংখ্যা

মূল গ্রন্থের কারিকার সংখ্যার সম্বন্ধে অনুবাদ কয়খানির মধ্যে ভেদ আছে; তি¹ অনুবাদে কুড়িটি, তি² অনুবাদে তেইশটি, এবং চী অনুবাদে চব্বিশটি কারিকা দেখা যায়। পুস্তকখানির নামের (ম হা যা ন বিং শ ক) বিং শ ক শব্দটিই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, ইহাতে মোট কুড়িটি কারিকা আছে। কিন্তু কেবল ইহাতেই একেবারে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। অনেক স্থানে দেখা যায় যে, পুস্তকের নামে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, বস্তুত তাহার মধ্যে ততগুলি কারিকা পাওয়া যায় না। উদাহারণস্বরূপে বসুবন্ধুর বিং শ তি কা রি কা উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও ইহার নামে কুড়িটি কারিকার কথা পাওয়া যাইতেছে তথাপি উহাতে বস্তুত বাইশটি কারিকা আছে। আলোচ্য স্থলে যেখানে একই মূল গ্রন্থের বিভিন্ন বিভিন্ন অনুবাদে কারিকার বিভিন্ন বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের এই ভেদকে একেবারে উপেক্ষা না করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

এই জাতীয় প্রশ্ন আলোচনায়, যে অনুবাদে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক কারিকা থাকে, তাহাকেই সাধারণত আদর করা হয়; কিন্তু ইহা সব সময় নিরাপদ নহে। কেননা, কোন-না-কোন কারণে ইহা হইতে কয়েকটি কারিকা স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কারিকা আছে, তাহাকেও কেবল এই জন্যই উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না। অতএব এই বিষয়টি অতি সাবধানতার সহিত আলোচনা করিয়া দেখা উচিত, এবং ইহা করিতে হইলে বাহ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রমাণেরই উপর বেশী নির্ভর করা ভাল, যদি তাহা থাকে।

পাঠভেদ থাকিলেও, যদি কোন কারিকা তিনখানি অনুবাদেই পাওয়া যায় তবে আমরা অনায়াসে ও নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, তাহা মূল কারিকার অন্তর্গত। কিন্তু যদি তাহা সেরূপ না হয় তবে বস্তুত তাহা মূল গ্রন্থখানির অন্তর্গত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং আমাদিগকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে।

এইরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ৮ম, ৯ম, ১৮শ, ও ২৩শ কারিকাটি ম হা যা ন বিং শ কে পরে যোজিত হইয়াছে।

এই চারিটি কারিকা বাদ দিলে তি¹ অনুবাদে মোট ২০টি কারিকা থাকে। তি¹ অনুসারে ১৮ক সংখ্যক (অর্থাৎ বস্তুত ১৭শ) কারিকাটি ১৯শ কারিকার পূর্ব্বে ১৮শ কারিকার স্থানে বসিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে চী অনুবাদে কুড়িটি কারিকা হয়। কিন্তু তি² অনুবাদে হয় উনিশটি। ইহার ইহাই কারণ যে, ১৮ক সংখ্যক অথবা তি¹র ১৭ সংখ্যক কারিকাটি (যাহার চী অনুবাদে

অংশত ১৮শ ও অংশত ১৯শ কারিকার সহিত মিল আছে) চী অনুবাদে একবারে ত্যক্ত হইয়াছে।

§ ৭। কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা

তি ও চী অনুবাদে কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দেখা যাইবে—

তি১	তি২	চী
১—৫	১—৫	১—৫
৬	৬	৭
৭	৭	৬
০	৮	৮
০	৯	৯
৮	১০	১০
৯	১১	১১
১০	১২	১২
১১	১৩	১৩
১২	১৪	১৪
১৩	১৫	১৫
১৪	১৬	১৬
১৫	১৭	১৭
০	১৮	২৩
১৮	১৯	২০
১৯	২০	২১
*	*	*
২০	২২	২৪
০	২৩	২২

তি১ ১৬শ, ১৭শ; তি২ ২১শ; ও চী ১৮শ ও ১৯শ কারিকার জন্য ২১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

আমরা দেখিতে পাই, তি২ অনুবাদে তেইশটি কারিকার মধ্যে মোট উনিশটি তিনখানি অনুবাদেই আছে। ইহাদের সংখ্যা ১—৭, ১০—১৭, ১৯—২২। অতএব আমরা এই উনিশটি কারিকাকে মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এখন সন্দেহ আসিতেছে অবশিষ্ট

চারিটি (৮ম, ৯ম, ১৮শ, ও ২৩শ) কারিকায়। এই চারিটি তি১-এ মোটেই নাই, কেবল তি২ ও চী-এ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কারিকা আছে চী-এ, এবং বলা হইয়াছে, ইহার কারিকা সংখ্যা চব্বিশ। এই অতিরিক্ত সংখ্যার ইহাই কারণ যে, এক স্থলে যেখানে তি২ অনুবাদে একটি কারিকা আছে, চী ও তি১ অনুবাদে সেখানে দুইটি কারিকা আছে ; তি২-এ ইহাদের একটি কারিকা বাদ গিয়াছে (২১শ কারিকা দ্রষ্টব্য)।

১১শ ও ১২শ কারিকা সমস্ত অনুবাদেই আছে। এই দুই কারিকায় 'কল্পনার' কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য মনে হয়, কেবল চী ও তি২ অনুবাদে প্রাপ্ত ৮ম কারিকার আর প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকারেই, যখন সমস্ত অনুবাদেরই মধ্যে প্রাপ্ত ২য় কারিকায় 'সত্ত্ব' বা জীবের কথা, এবং ৩য় ও ১৫শ কারিকায় 'প্রতীত্যসমুৎপাদের' কথা বলা গিয়াছে, তখন কেবল তি২ ও চী অনুবাদের মধ্যে প্রাপ্ত ৯ম কারিকার আর বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় না। অতএব কেহ বলিতে পারেন যে, এই দুইটি কারিকা (৮ম ও ৯ম) পরে যোজিত হইয়া থাকিবে। এখানে ইহা বলা উচিত যে, এই যুক্তিটি তেমন প্রবল নহে।

১৮শ কারিকাটির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, যখন পূর্ব্বেই ৩য় কারিকায় 'সংস্কৃতকে' 'শূন্য' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন ১৬শ ও ১৭শ কারিকার পর, আবার তাহা ১৮শ কারিকায় (কিছু অতিরিক্ত কথা থাকিলেও,) বলিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। চী-অনুসারে শেষ বা ২২শ কারিকার (=তি১২০শ, তি২ ২২শ, চী ২৪শ) পূর্ব্বেও ইহা থাকিতে পারে না।

২২শ কারিকা (=তি১ ২০শ, তি২ ২২শ, চী ২৪শ) সমস্ত অনুবাদেই পাওয়া যায়। ইহার আলোচ্য বিষয়, তি১ ও চী অনুবাদে প্রাপ্ত ক্রমিক সংখ্যা (যথাক্রমে ২০শ ও ২৪শ), এবং অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী (২১শ) কারিকায় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তাহাই হইতেছে গ্রন্থখানির অন্তিম কারিকা। অতএব ২৩শ কারিকাটি শেষ কারিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, যদিও তি২ অনুবাদে এইরূপ করা গিয়াছে। চী অনুবাদের ক্রমিক সংখ্যা (২২শ) দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। ২০শ কারিকাটি চী অনুবাদের ২১শ। ইহার পর ২৩শ কারিকাটি পড়িয়া দেখিলেও স্পষ্ট জানা যাইবে যে, এখানেও ইহা ঠিক থাকিতে পারে না।

§ ৮। কারিকাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ

তুলনামূলক টীকাগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, তি২ অপেক্ষা চী-এর সহিত তি১-র

ঐক্য বেশী। কেবল চারিটি কারিকায় (৪র্থ, ১৪শ, ১৫শ, ও ২২শ) চী অপেক্ষা তি°-র সহিত ইহার ঐক্য বেশী।

§ ৯। আলোচ্য বিষয় ও তাহার আলোচনা

গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মাধ্যমিক মতের কয়েকটি সাধারণ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল শূন্যতাবাদের উল্লেখটি ছাড়িয়া দিলে এ কথা কয়টি যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীদের মতেও খাটে। তিনি তাহার পর বুদ্ধত্ব লাভের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, জীবেরা মিথ্যা কল্পনায় কষ্ট পায়, বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাহার দ্বারা তাহাদের উপকার করা যাইতে পারে। প্র তী ত্য স মু ৎ পা দ জানিলে পরমার্থ জানিতে পারা যায়, এবং তাহা জানিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জগৎ শূন্য। জ্ঞানীদের নিকটে সংসার বলিয়া কিছু নাই; যেমন স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায় জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই থাকে না। গ্রন্থকার পরে বলিয়াছেন যে, এক চিত্ত বা মন ছাড়া কিছুই নাই। শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহার ফল, ইত্যাদি বুদ্ধি চিত্তের কল্পনামাত্র। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে এ সব কিছুই থাকে না। যে-কোনো বস্তু দেখা যাইতেছে তৎসমস্তই নিঃস্বভাব, স্ব-ভাব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই, স্বাধীনভাবে বস্তুত ইহাদের কোনো সত্তা নাই, তথাপি লোকে এই সমুদয়কে বিবিধরূপে কল্পনা করে, আর এই প্রকারেই সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাযান-পোতকে আশ্রয় না করে ততক্ষণ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

উল্লিখিত বিষয়টির কেবল বর্ণনাই করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনো যুক্তি বা আলোচনা নাই।

এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক নাগার্জ্জুন যদি এই পুস্তকের রচয়িতা হন, তবে তিনি কিরূপে ইহাতে বিজ্ঞানবাদের অবতারণা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যমগুচি তাঁহার প্রস্তাবনায় (*The Eastern Buddhist*, 1926, Vol. IV, No. I, pp.57-58) ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, নাগার্জ্জুন নিজের যু ক্তি ষ ষ্টি কা য় (শ্লোক ৩৪, ৩৬) বিজ্ঞানবাদও আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রীয় প্রাচীন বহু গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধ্যমিকগণ তাহা এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি তেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি নহে, তাহাদিগকে ক্রমশ পরম সত্যে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সমস্ত গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের অবতারণা করা হইয়াছে।[১৭] স্বয়ং নাগার্জ্জুনও বলিয়াছেন (সু ভা ষি ত সং গ্র হ, পৃ. ২০)—

১৭। দ্রষ্টব্য—ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি, পৃ. ২৭৬।

চিত্তমাত্রং জগৎ সর্বমিতি যা দেশনা মুনেঃ।
উৎত্রাসপরিহারার্থং বালানাং সা ন তত্ত্বতঃ ॥[১৮]

অতএব বলিতে পারা যায় যে, মহাযানবিংশকে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। ইহাতে সাধারণ মহাযানের কথা রহিয়াছে। গ্রন্থখানির নামটিও ইহা প্রকাশ করিতেছে।

§ ১০। পুস্তকের সার

গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, তিনি যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। পরমার্থত কোনো বস্তুর উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই। আকাশের ন্যায় বুদ্ধ ও জীব উভয়েরই উৎপত্তি ও নিরোধ নাই। সংসারের এপারে বা ওপারে কিছু উৎপন্ন হয় না। উপাদান ও নিমিত্ত কারণে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় (‘সংস্কৃত’) বস্তুত তাহা ‘শূন্য’। সমস্ত বস্তুই স্বভাবত প্রতিবিম্বের ন্যায়। যাহা বস্তুত আত্মা নহে সাধারণ লোকেরা তাহাকেই আত্মা মনে করে। এইরূপে তাহারা সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকে। দাবাগ্নিতে যেমন বন দগ্ধ হয়, মিথ্যা কল্পনা-হেতু জীবেরাও সেইরূপ রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশে দগ্ধ হইয়া থাকে। কোনো চিত্রকর যেমন নিজেরই অঙ্কিত যক্ষের চিত্র দেখিয়া ভীত হয়, নির্বোধ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসার দেখিয়া ভয় পায়। যেমন কোনো মূঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পঙ্কে নিমগ্ন হয়, জীবও সেইরূপ কল্পনা-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে উঠিতে পারে না। সাধারণ লোক-সমূহকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদের উপকারের জন্য বুদ্ধত্ব লাভ করা উচিত। যে ব্যক্তি ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ জানিয়া পরমার্থ দর্শন করিতে পারে, সে এই জগৎকে ‘শূন্য’ বলিয়া জানে। সংসার ও নির্ব্বাণ কেবল প্রতিভাতই হয়,

১৮। দ্রষ্টব্য—

অস্তি ধর্ম্মিতি নীলাদি জগদিতি জড়ীয়সে।
ভাবগ্রাহগ্রহাবেশ (পঠনীয়—°বেশাদ্) গম্ভীরনয়ভীরবে।
বিজ্ঞানমাত্রমেবেদং চিত্রং জগদুদীরিতম্।
গ্রাহ্যগ্রাহকভেদেন রহিতং মন্দমেধসে ॥
গন্ধর্বনগরাকারং সত্যাধিতমলাঞ্ছিতম্।
অমেয়ানন্তকল্পৌঘভাবনাশুদ্ধবুদ্ধয়ে ॥

সুভাষিতসংগ্রহ, পৃ ১৪, ১৫।

তত্বত এ দুইটি নাই। এই যাহা কিছু আছে সবই চিত্ত, চিত্ত ছাড়া কিছুই নাই, ঠিক মায়ার মত। চিত্তচক্র নিরুদ্ধ হইলে সবই নিরুদ্ধ হয়। মহাযানে আরোহণ না করিয়া কোন্ ব্যক্তি এই কল্পনা-জলপূর্ণ সংসার মহাসমুদ্রের পর পারে যাইতে পারে?

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অ.প্র.পা = অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এসিয়াটিক সোসাইটী, বেঙ্গল, ১৮৮৮)।

অ.ব স = অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গাইকোয়াড় ওরিএণ্টাল সীরিজ, ১৯২৭)।

কে.উ = কেনোপনিষৎ

বো চ.প = বোধিচর্য্যাবতারপঞ্জিকা (Louis de la Vallée Poussin, এসিয়াটিক সোসাইটী, বেঙ্গল)।

ম কা = মধ্যমককারিকা (Louis de la Vallée Poussin, Bibliotheca, Buddhica, 1903)।

ম.বৃ = মধ্যমকবৃত্তি চন্দ্রকীর্ত্তি-কৃত। " "

ম.সূ.অ = মহাযানসূত্রালঙ্কার (Lévi, Paris, 1907)।

ল.অ = লঙ্কাবতার (B. Nanjio, Kyoto, 1923)।

শি.স = শিক্ষাসমুচ্চয় (Bendall, Bibliotheca Buddhica, 1902)।

ক, খ, গ, ঘ এই কয়টি বর্ণ শ্লোকের যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোনো শ্লোকের পূর্ব্বে নক্ষত্র চিহ্ন (*) থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহা মূল, পুনরুদ্ধৃত নহে।

পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত

॥ মহাযানবিংশকম্ ॥

নমো বাচাঽবাচ্যমপি দয়য়া যেন দেশিতম্ ।
ধীমতে বীতরাগায় বুদ্ধায়াচিন্ত্যশক্তয়ে ॥ ১ ॥

২

পরমার্থেন নোৎপাদো নিরোধোঽপি ন তত্ত্বতঃ ।
বুদ্ধ আকাশবৎ তদ্বৎ সত্ত্বা অপ্যেকলক্ষণাঃ ॥ ২

৩

নাস্মিংস্তস্মিংস্তটে জাতিঃ সংস্কৃতং প্রত্যয়োদ্ভবম্ ।
শূন্যমেব স্বরূপেণ সর্বজ্ঞজ্ঞানগোচরঃ ॥

৪

সর্বে ভাবাঃ স্বভাবেন প্রতিবিম্বসমা মতাঃ ।
শুদ্ধাঃ শান্তস্বভাবাশ্চ অদ্বয়াস্তথতা সমাঃ ॥ ৪ ॥

৫

তত্ত্বেনানাত্মনি পৃথগ্ জনেনাত্মা বিকল্পিতঃ ।
সুখং দুঃখমুপেক্ষা চ ক্লেশো মোক্ষস্তথৈব চ ॥ ৫ ॥

৬

গতয়ঃ ষড়্ হি সংসারে সুগতৌ সুখমুত্তমম্ ।
নরকে চ মহদ্দুঃখং সর্বং ন তত্ত্বগোচরঃ ॥ ৬

৭

অশুভাদ্ দুঃখমত্যন্তং জরা ব্যাধিস্তথা মৃতিঃ ।
কর্মভিস্তু শুভৈরেব শুভমেব হি কেবলম্ ॥ ৭ ॥

মিথ্যাকল্পনয়া সত্ত্বা দাবাগ্নিনেব কাননম্ ।
ক্লেশানলেন দহ্যন্তে নরকাদৌ পতন্তি চ ॥ ৮ ॥
যথা যথা ভবেন্ মায়া সত্ত্বাঃ স্যুর্গোচরাস্তথা ।
জগন্ মায়াস্বরূপং হি প্রতীত্যসম্ভবং তথা ॥ ৯ ॥

*

৮

* যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতি ভয়ঙ্করম্।
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেঽপ্যবুধস্তথা ॥ ১০ ॥

৯

স্বয়ং চলন্ যথা পঙ্কে বালঃ কশ্চিন্ নিমজ্জতি।
নিমগ্নাঃ কল্পনাপঙ্কে সত্ত্বাস্তথোদ্গমাক্ষমাঃ ॥ ১১ ॥

১০

ভাবদর্শনতোঽভাবে বেদ্যতে দুঃখবেদনা।
তয়োর্জ্ঞানবিষয়য়োর্বাধ্যন্তে কল্পনাবিষৈঃ ॥ ১২ ॥

১১

আলোক্য তানশরণান্ করুণাবশমানসঃ।
সত্ত্বানামুপকারায় বোধিচর্য্যাঃ সমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥

১২

তাভিঃ সঞ্চিত্য সম্ভারং প্রাপ্তো বোধিমনুত্তরাম্।
কল্পনাবন্ধনান্ মুক্তঃ স্যাদ্ বুদ্ধো লোকবান্ধবঃ ॥ ১৪ ॥

১৩

যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদাদ্ ভূতার্থমবলোকতে।
স জানাতি জগচ্ছূন্যমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্ ॥ ১৫ ॥

১৪

দর্শনেনৈব সংসারো নির্বাণং চ ন তত্ত্বতঃ।
নিরঞ্জনং নির্বিকারমাদিশান্তং প্রভাস্বরম্ ॥ ১৬ ॥

১৫

বিষয়ঃ স্বপ্নবোধস্য প্রবুদ্ধেন ন দৃশ্যতে।
মোহান্ধকারোদ্বুদ্ধেন সংসারো নৈব দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

মায়ৈব দৃশ্যতে মায়া-নির্ম্মিতং সংস্কৃতং যদা।
নৈব কিঞ্চিত্তদা ভাবো ধর্ম্মাণাং সৈব ধর্মতা ॥ ১৮ ॥

১৬

জাতিমান্ ন স্বয়ং জাতো জাতির্লোকৈর্বিকল্পিতা।
বিকল্পাশ্চৈব স স্বাশ্চোভয়মেতন্ ন যুজ্যতে ॥ ১৮ ক ॥

১৭

চিত্তমাত্রমিদং সর্বং মায়াবদবতিষ্ঠতে।
ততঃ শুভাশুভং কর্ম ততো জাতিঃ শুভাশুভা ॥ ১৯ ॥

১৮

সর্বে ধর্মা নিরুধ্যন্তে চিত্তচক্রনিরোধতঃ।
অনাত্মানস্ততো ধর্মা বিশুদ্ধাস্তত এব তে ॥ ২০ ॥

১৯

ভাবেষু নিঃস্বভাবেষু নিত্যাত্মসুখসংজ্ঞয়া।
রাগমোহতমশ্ছন্নস্তোভূতোঽয়ং ভবার্ণবঃ ॥ ২১ ॥

২০

* কল্পনাজলপূর্ণস্য সংসারস্য মহোদধেঃ।
মহাযানমনারূঢ়ঃ কো বা পারং গমিষ্যতি ॥ ২২ ॥
অবিদ্যাপ্রত্যয়োৎপন্নাস্য লোকস্য সংবিদঃ।
কুতঃ খলু ভবেদেষাং বিতর্কাণাং সমুদ্ভবঃ ॥ ২৩ ॥

আচার্য্যার্য্যনাগার্জুনকৃতং মহাযানবিংশকং সমাপ্তম্ ॥

অনুবাদ

১

যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে, এমন বিষয়কেও যিনি দয়া করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই ধীসম্পন্ন, অচিন্ত্যশক্তি, বীতরাগ, বুদ্ধকে নমস্কার ॥ ১ ॥

২

পরমার্থত উৎপত্তি নাই, তত্ত্বত নিরোধও নাই। বুদ্ধ আকাশের ন্যায় (অনুৎপন্ন ও অনিরুদ্ধ), জীবসমূহও সেইরূপ। (অতএব) ইহাদের লক্ষণ একইরূপ ॥ ২ ॥

৩

(সংসারের) এপারে ও ওপারে জন্ম নাই। সংস্কৃত[১৯] বস্তু অবস্থাবিশেষে ('প্রত্যয়')[২০] উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তাহা স্বরূপত শূন্যই। ইহাই সর্ব্বজ্ঞের[২১] জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

৪

সমস্ত পদার্থকেই প্রতিবিম্বের ন্যায় মনে করা হয়। ইহারা শুদ্ধ, শান্তস্বভাব, অদ্বয়, সম[২২] এবং ইহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্ব অবস্থায় সেই ভাবেই থাকে ("তথতা") ॥ ৪ ॥

৫

যাহা বস্তুত অনাত্মা সাধারণ লোকে তাহাতেই আত্মার কল্পনা করে। (তাহারা এই সমস্তও কল্পনা করে, যথা) সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা[২৩], ক্লেশ[২৪], মোক্ষ ॥ ৫ ॥

৬-৭

সংসারের ছয় যোনিতে জন্ম, স্বর্গে উত্তম সুখ, ও নরকে মহৎ দুঃখ, এ সমস্ত তত্ত্বের বিষয় হয় না। অশুভ কর্ম্মে অত্যন্ত দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, এবং শুভ কর্ম্মে কেবল শুভ হয়, (—ইহাও তত্ত্বের বিষয় হয় না) ॥ ৬—৭ ॥

বন যেমন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়, জীবসমূহও সেইরূপ মিথ্যা কল্পনার ক্লেশ-অগ্নিতে দগ্ধ হয় ও নরক প্রভৃতিতে পতিত হয় ॥ ৮ ॥

যেমন-যেমন মায়ার উদ্ভব হয়, জীবসমূহও তেমন-তেমন (জ্ঞানের) গোচর হয়। এই জগৎ মায়াস্বরূপ, ইহা ইহার হেতু ও প্রত্যয়কে[২৫] অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন ॥ ৯ ॥

৮

যেমন কোন চিত্রকর যক্ষের অতিভয়ঙ্কর রূপ নিজেই অঙ্কিত করিয়া ভীত হয়, নির্ব্বোধ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসারে ভয় পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

১৯। অর্থাৎ মূল ও সহকারী কারণে উৎপন্ন।

২০। সহকারী কারণ, যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তির বীজ মূল কারণ বা হেতু, ঋতু প্রভৃতি সহকরী কারণ বা প্রত্যয়

২১। বুদ্ধের।

২২। বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

২৩। যে বেদনা সুখও নহে, দুঃখও নহে, তাহাকে 'উপেক্ষা' বলা হইয়া থাকে।

২৪। রাগ, দ্বেষ, মোহ; মল।

২৫। পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৯

যেমন কোন মূঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পঙ্কে নিমগ্ন হয়, জীবগণও সেইরূপ কল্পনাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া উঠিতে পারে না ॥ ১১ ॥

১০

যাহা (বস্তুত) অভাব, তাহাতে ভাব দর্শন করায় দুঃখ-বেদনার অনুভব হয়। সেই যে বিষয় ও তাহার জ্ঞান, ইহাদের কল্পনারূপ বিষে জীবগণ পীড়িত হয় ॥ ১২ ॥

১১

তাহাদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া দয়াপরবশচিত্ত হইয়া, জীবগণের উপকারের জন্য বোধি লাভের অনুষ্ঠানসমূহ আচরণ করিবে ॥ ১৩ ॥

১২

তাহা দ্বারা (পুণ্য) সঞ্চয় করিয়া অনুত্তর বোধি লাভ করিয়া, কল্পনাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া লোকবন্ধু বুদ্ধ হইবে ॥ ১৪ ॥

১৩

যে ব্যক্তি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'[২৬] জানিয়া পরমার্থ দর্শন করে, সে আদি, মধ্য, ও অন্ত-বর্জ্জিত জগৎকে 'শূন্য'[২৭] বলিয়া জানিতে পারে ॥ ১৫ ॥

১৪

সংসার ও নির্ব্বাণ কেবল প্রতিভাতই হইয়া থাকে, বস্তুত ইহারা নাই। (পরম তত্ত্ব) নিরঞ্জন, নির্বিকার, আদিশান্ত, ও প্রভাস্বর[২৮] ॥ ১৬ ॥

১৫

স্বপ্নজ্ঞানের বিষয়কে প্রবুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না; মোহান্ধকার হইতে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিও সংসারকে দেখিতে পায় না ॥ ১৭ ॥

২৬। হেতু ও প্রত্যয়কে অপেক্ষা করিয়া বস্তুর যে উৎপত্তি, তাহার নাম 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। 'অঙ্কুর' বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ কোন বস্তু নাই। অঙ্কুরের স্ব-ভাব বলিয়া কিছুই নাই, যদি থাকিত তবে অঙ্কুর চিরকালই থাকিত, বীজের কোন অপেক্ষা রাখিত না। কিন্তু বস্তুত সেরূপ থাকে না। অঙ্কুর নিজের হেতু বীজ, এবং প্রত্যয় ঋতু, ক্ষেত্র, ইত্যাদিকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হয়। এই জন্য অঙ্কুরকে 'প্রতীত্যসমুৎপন্ন' বলা হয়, আর অঙ্কুরের ঐ উৎপত্তিকে বলা হয় 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'।

২৭। শূন্য = প্রতীত্যসমুৎপন্ন।

২৮। এই কারিকার বিবৃতি দেখ।

১৬

মায়া-নির্ম্মিত বস্তু মায়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (বস্তু) যখন সংস্কৃত তখন কিছুই ভাব বলিয়া নাই। পদার্থের ইহাই পদার্থতা ॥ ১৮ ॥

১৬

যাহার জাতি [২৯] আছে সে স্বয়ং জাত হয় নাই, লোকে জাতিকে কল্পনা করিয়াছে। কল্পনা ও জীব এই উভয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না ॥ ১৯ ॥

১৭

এই সমস্তই চিত্তমাত্র, ও মায়ার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। তাহা হইতে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম, তাহা হইতে শুভ ও অশুভ জন্ম ॥ ১৯ ॥

১৮

চিত্তচক্রের নিরোধে সমস্ত পদার্থের নিরোধ হয়। অতএব সমস্ত পদার্থই অনাত্ম এবং সেই জন্যই তাহারা বিশুদ্ধ ॥ ২০ ॥

১৯

নিঃস্বভাব পদার্থসমূহকে নিত্য, আত্মা ও সুখ বলিয়া মনে করায় রাগ ও মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তির এই ভবসমুদ্র উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

২০

মহাযানে আরোহণ না করিলে কোন্ ব্যক্তি কল্পনাজলপূর্ণ সংসার মহাসমুদ্রের পারে গমন করিবে? ॥ ২২ ॥

যিনি বিশেষরূপে জানেন যে, এই লোক অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, তাঁহার এই সমস্ত কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে ॥২৩॥

॥ আচার্য্য আর্য্য নাগার্জ্জুনের রচিত ম হা যা ন বিং শ ক সমাপ্ত ॥

২৯। অর্থাৎ জন্ম।

তুলনা

১

ক চী নমোঽচিন্ত্যভাবরূপেভ্যঃ
তি১ যেন বাগ্‌ধর্মেণ
তি২ বীতরাগৈরববুদ্ধৈর্বুদ্ধৈঃ
খ চী বুদ্ধেভ্যো বীতরাগেভ্যঃ সত্যপ্রজ্ঞেভ্যঃ
তি১ অবচনম্ (=অবাচ্যম্) অপি দয়য়া দেশিতম
তি২ বচনেন অবাচ্যম্
গ চী ধর্মা অবচনা নাবচনাঃ
তি১ বীতরাগায় মতিমতেঽনুত্তর-
তি২ দয়য়া সুপ্রকাশিতম্
ঘ চী বুদ্ধেন দয়য়া সুদেশিতম্
তি১ শক্তয়ে বুদ্ধায় নমঃ
তি২ অচিন্ত্যশক্তয়ে নমঃ

তুলনা

চীক, তি১ গ (শেষ অংশ), তি২ ঘ ; চী খ, তি১ গ ও ঘ ; তি২ক ; চী গ, তি১, তি২খ ; চী ঘ, তি১গ, তি২গ।

পুনরুদ্ধার

ক চী ক, গ, ঘ ; তি১ ক, খ ; তি২ খ। খ চী ঘ, তি১ খ, তি২ গ।
গ চী খ, তি১ গ ; তি২ ক। ঘ চী ক, ঘ ; তি১ গ, ঘ ; তি২ ঘ।

২

ক চী পরমার্থেন নোৎপাদঃ
তি১ উৎপাদো বস্তুতো নাস্তি
তি২ পরমার্থেনানুৎপাদাৎ
খ চী অনুবৃত্তিশ্চ ন স্বভাবতঃ
তি১ নিরোধোঽপি ন তত্ত্বতঃ

তি১ মোক্ষোঽপি নাস্তি তত্ত্বতঃ

গ চী বুদ্ধঃ সত্ত্ব একলক্ষণঃ

তি১ আকাশবদ্ যথা বুদ্ধঃ

তি২ আকাশবৎ তথা বুদ্ধঃ

ঘ চী আকাশবৎ সামান্যতো দৃষ্টম্

তি১ সত্ত্বা অপ্যেকলক্ষণাঃ

তি২ সত্ত্বাশ্চ একলক্ষণাঃ

তুলনা

চীক, তি১ ক, তি২ ক ; চী খ, তি১ খ, তি২ খ ; চী ঘ, তি১ গ, তি২ গ ; চী গ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চী ক, তি১ ক, তি২ ক। খ চী খ, তি১ খ, তি২ খ। গ চী ঘ, তি১ গ, তি২ গ।
ঘ চী গ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

৩

ক চী নাস্মিংস্তস্মিংস্তটে জাতিঃ

তি১ পরেঽপরে তীরে জাতির্নাস্তীতি

তি২ "

খ চী স্বভাবেন প্রত্যয়-(প্রতীত্য-) সমুৎপন্নাঃ

তি১ সংস্কৃতানি প্রত্যয়োৎপন্নানি

তি২ ন নির্বাণং স্বভাবতঃ

গ চী তানি সংস্কৃতানি সর্বাণি শূন্যানি

তি১ স্বরূপেণ শূন্যান্যেব

তি২ ব্যক্তং তথা সংস্কৃতং শূন্যম্

ঘ চী সর্বজ্ঞজ্ঞানগোচরঃ

তি১ "

তি২ "

তুলনা

চী ক, তি১ ক, তি২ ক ; চী খ, তি১ খ ; চী গ, তি১ গ, তি২ গ ; চী ঘ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চী ক, তি১ ক, তি২ ক। খ চী খ, তি১ খ। গ চীগ, তি১ গ, তি২ গ। ঘ চী ঘ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

তি২ খ এর সহিত কাহারো মিল নাই।

তি১ ক চরণে নারথাঙ সংস্করণের পাঠ ও তি২ ক চরণের পাঠ একই, কিন্তু পেকিং সংস্করণের পাঠ অন্যরূপ। এই পাঠ সমর্থন করা যায় না।

৪

ক	চী	অক্লিষ্টাস্ (= শুদ্ধাস্) তথতারূপাঃ
	তি১	সর্বে ভাবাঃ স্বভাবেন
	তি২	সর্বে ভাবাঃ স্বভাবেন
খ	চী	অদ্বয়াঃ শান্তাঃ
	তি১	প্রতিবিম্বসমা মতাঃ
	তি২	প্রতিবিম্বসমা মতাঃ
গ	চী	সর্বে ধর্মা লক্ষণস্বভাবেন
	তি১	শুদ্ধাঃ শান্তস্বভাবাশ্চ
	তি১	বিশুদ্ধাঃ শান্তস্বরূপাশ্চ
ঘ	চী	প্রতিবিম্বোপমা অভিন্নাঃ (= সমাঃ)
	তি১	অদ্বয়াস্তথতা সমাঃ
	তি২	অদ্বয়াস্তথতা সমাঃ

তুলনা

চী ক, তি১ গ-ঘ, তি২ গ-ঘ ; চী খ, তি১ গ-ঘ, তি২ গ-ঘ ; চীগ, তি১ ক, তি২ ক ; চীঘ, তি১ খ-ঘ ; তি২ খ-ঘ ।

পুনরুদ্ধার

ক চীগ, তি১ ক, তি২ক ; খ চীঘ, তি১ খ, তি২ খ ; গ চীক-খ, তি১ গ, তি২ গ ; ঘ চীক-খ-ঘ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

৫

ক চী পৃথগ্‌জনো বিকল্পচিত্তেন
তি১ পৃথগ্‌জনেন তত্ত্বেন
তি২ আত্মানাত্মা ন সত্যঃ
চী তত্ত্বত অনাত্মানমাত্মেতি মন্যতে
তি১ অনাত্মন্যাত্মা
তি২ পৃথগ্‌জনেন কল্পিতঃ
গ চী তস্মাদুত্তিষ্ঠন্তি ক্লেশাঃ
তি১ সুখং দুঃখমুপেক্ষা
তি২ সুখং দুঃখমুপেক্ষা
ঘ চী পুনর্দুঃখং সুখমুপেক্ষা
তি১ ক্লেশাঃ সর্বত্র বিকল্পিতাঃ
তি২ ক্লেশো মোক্ষস্তথা

তুলনা

চীক, তি১ক-ঘ, তি২খ; চীখ, তি১খ, তি২ক; চীগ, তি১ঘ, তি২ ঘ; চীঘ, তি১ গ, তি২গ।

পুনরুদ্ধার

ক চীখ, তি১খ, তি২ক; খ চীক, তি১ক, তি২খ; গ চী গ ঘ, তি১গ, তি২গ; ঘ চীগ, তি১ঘ, তি২ ঘ।

গ চরণে 'উপেক্ষা' (তি১গ 'বতোঙ. স্‌ঞোমস', চী ঘ 'শে')-স্থানে তি২গ-র পাঠ 'অপেক্ষা' ('বল্‌তোস. প'); কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা ঠিক পাঠ নহে।

৬

ক চী দেবগতৌ (=স্বর্গে) বিশিষ্টং সুখম্
তি১ সংসারে গতয়ঃ ষট্
তি২ সংসারে গতয়ঃ ষট্
খ চী নরকেঽতিমাত্রং দুঃখম্
তি১ সুগতাবুত্তমং সুখম্
তি২ পরমঃ স্বর্গঃ সুখং চ
গ চী সর্বং ন সত্যগোচরঃ

তি১ নরকে চ মহাদুঃখম্

তি২ নরকে চ মহাদুঃখম্

ঘ চী ষড়্ গতয়ো নিত্যং প্রবর্তন্তে

তি১ বিষয়স্তত্ত্বেনাচিন্ত্যঃ

তি২ বেত্ত্যস্তে বিষয়া অমী

তুলনা

চীক, তি১খ, তি২ খ ; চীখ, তি১গ, তি২গ ; চীগ, তি১ঘ ; চীঘ, তি১ক, তি২ক।

পুনরুদ্ধার

ক চী ঘ, তি১ক, তি২ক ; খ চী ক, তি১খ, তি২খ ; গ চীখ, তি১গ, তি২গ ; ঘ চীগ, তি১ঘ, তি২ঘ।

তি২ ঘ চরণের কাহারো সহিত মিল নাই।

গ চরণে তি১ অনুবাদের প-সংস্করণে আছে "যুল. দে. ত্রিদ. গি. বসম. পর" ; স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। ন-সংস্করণে 'যুল' ও 'দে' ইহাদের মধ্যে 'ল' পাঠ করিয়া পঙ্‌ক্তিটিকে পূর্ণ করা গিয়াছে। তথাপি ইহা সন্তোষজনক নহে। আমরা যদি প-সংস্করণে 'বসম' স্থানে 'বসমস' পাঠ করিয়া শেষে 'যোদ' যোগ করি তাহা হইলে চরণটি পূর্ণ হয় এবং তাহা অর্থেও অনেকটা চী গ-চরণের সহিত মিলে।

৭

ক চী লোকে জরা ব্যাধির্মরণম্

তি১ অপি চ দুঃখং চ

তি২ অশুভাং পরমং দুঃখম্

খ চী ভবতি দুঃখমনিষ্টম্

তি১ জরাব্যাধিরনিত্যতা

তি২ ব্যসনং প্রীত্যনিত্যতা

গ চী কর্মানুসারেণ পতনম্

তি১ কর্মণাং বিপাকঃ

তি২ শুভৈরেব কর্মভিস্তু

ঘ চী তৎসত্যমসুখম্

তি১ সুখং ব্যসনমেব চ

তি২ শুভমেব নিশ্চিতম্

তুলনা

চী ক, তি১ খ, তি২ খ ; চী খ, তি১ ক, তি২ ক ; চী গ, তি১ গ, তি২ গ ; চী ঘ তি১ ঘ, তি২ ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চী খ, তি১ ক, তি২ ক ; খ চী ক, তি১ খ, তি২ খ ; গ চী গ, তি১ গ, তি২ গ ; ঘ ঘ চী ঘ, তি১ ঘ, তি২ ঘ।

তি১-র খ-চরণে 'ন' স্থানে শ্রীযুক্ত যমগুচি 'নদ' পাঠ করিতে চাহেন, কিন্তু ইহা অনাবশ্যক, কারণ 'ন' (='ন.ব') ও 'নদ' উভয়ই 'ব্যাধি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তি২-র খ-চরণের পাঠ 'দগ', কিন্তু এখানে কি 'দক' পাঠ করা যায় না? তাহা হইলে সেখানে অর্থ হইবে 'কৃচ্ছ্রং ব্যাধিঃ' অথবা 'কৃচ্ছ্র-ব্যাধিঃ'। 'মি র্তগ. (গ্রিদ)'='অনিত্যতা' 'র্গুদ.প'='ব্যসন'।

৮

ক চী সত্ত্বা মিথ্যাকল্পনয়া

তি১ ০

তি২ অনুৎপাদাববোধেন উৎপাদাৎ

খ চী ক্লেশাগ্নিনা দহ্যতে

তি১ ০

তি২ ০

গ চী নরকাদিগতিষু পতন্তি

তি১ ০

তি২ দৃশ্যন্তে নরকাদিষু

ঘ চী যথা দাবাগ্নিনা বনং দহ্যতে

তি১ ০

তি২ দোষেণ দাবাগ্নিনেব দহ্যন্তে

তুলনা

চী খ-ঘ, তি২ঘ ; চী গ, তি২ ।

পুনরুদ্ধার

ক চী ক; খ চী ঘ; গ চী খ, তি² ঘ; ঘ চী গ, তি² গ।

এই কারিকার তি¹ মোটেই নাই। তি²-র মোটে তিন চরণ আছে, ক, গ, ও ঘ; খ পাওয়া যায় না। স্পষ্টতই তি²-র ক-চরণের পাঠ ('স্ক্যে.মেদ.র্তোগস.পস') বিশুদ্ধ নহে। ইহার কোনো সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। চী-পাঠ 'চেঙ শেঙ বাঙ ফেন পিএ'। উল্লিখিত তিব্বতী পাঠে 'র্তোগস' স্থানে 'র্তোগ' পাঠ করা উচিত। শ্রীযুক্ত যমগুচিও ইহাই মনে করেন। ইহা ছাড়া 'মেদ' স্থানে যদি 'বো' পড়া যায়, তাহা হইলে ঐ বাক্যটার অর্থ হয় 'জনঃ কল্পনয়া।' অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মূল পাঠে ('স্ক্যে.মেদ র্তোগ পস') 'স্ক্যে' – 'স্ক্যে.বো', 'জনঃ'; অথবা = 'স্ক্যে-বু' = 'পুরুষঃ'। 'মেদ' – 'অভাবঃ'; কিন্তু এখানে ইহাকে 'অভূত' অর্থে ধরা যাইতে পারে। 'র্তোগ.পস' = 'কল্পনয়া'। এইরূপে অর্থ হয় 'পুরুষঃ (অথবা 'জনঃ', 'সত্ত্বঃ') অভূতকল্পনয়া'। ইহা চী-র সহিত বেশ মিলে ('সত্ত্বা মিথ্যাকল্পনয়া')।

চী-খ-অনুসারে তি²খ এইরূপ হইতে পারে—'ঞোন.মোঙস.প'ই.মেস.স্রেগ.প.নি = 'দহ্যতে ক্লেশবহ্নিনা'।

৯

ক	চী	সত্ত্বা মূলতো যথা মায়া
	তি¹	০
	তি²	যথা যথা ভবেন্ মায়া
খ	চী	পুনর্মায়াবিষয়ং গৃহ্ণাতি
	তি¹	০
	তি²	তথা সত্ত্বা গোচরাঃ
গ	চী	গচ্ছন্ মায়াকৃতায়াং গতৌ
	তি¹	০
	তি²	জগন্ মায়াস্বরূপম্
ঘ	চী	ন বধ্যতে প্রতীত্যসমুৎপন্নম্
	তি¹	০
	তি²	তথা প্রতীত্যসমুৎপন্নম্

তুলনা

চী ক-খ, তি২ ক-খ ; চী ঘ, তি২ ঘ।

ক তি২ ক ; খ তি২ খ ; গ তি২ গ ; ঘ তি২ ঘ।

পুনরুদ্ধার

এই কারিকাটি সম্পূর্ণভাবে তি২ হইতে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। চীর সহিত তি২-র সাধারণতঃ বেশ মিল আছে, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থানে ভেদ দেখা যায়। তি২-র গ চরণে '"গ্রো' শব্দের অর্থ 'গতি' ও 'জগৎ' দুইই হয়। আমি এখানে দ্বিতীয় অর্থটিকেই ভাল মনে করি। চী-র পাঠে এখানে আছে 'তাও'। এখানে ইহার অর্থ 'গতি' ('মার্গ' নহে, যদিও সাধারণত তাহার এই অর্থই ধরা হয়)। যেমন 'লু তাও'= 'ষড্ গতয়ঃ' (তিব্বতী '"গ্রো.ব. রিগস.দ্রুগ')। ৬ষ্ঠ কারিকার 'গতি'র উল্লেখ করা হইয়াছে।

১০

ক চী যথা লোকে চিত্রকরঃ
তি১ সমীচীনশ্চিত্রকরঃ
তি২ যথা চিত্রকরো রূপম্
খ চী যক্ষস্যাকৃতিমঙ্কয়তি
তি১ অতিভয়ঙ্করং যক্ষস্য রূপম্
তি২ যক্ষস্য ভয়ঙ্করং অঙ্কয়িত্বা (আক্ষরিক 'অঙ্কনেন')
গ চী স্বয়মঙ্কয়িত্বা স্বয়ং বিভেতি
তি১ অঙ্কয়িত্বা স্বয়ং বিভেতি
তি২ তেন স্বয়ং বিভেতি
ঘ চী স উচ্যতেঽজ্ঞঃ
তি১ সংসারে মূঢ়োঽপি তথা
তি২ সংসারেঽব ধস্তথা

তুলনা

চীক, তি১ ক, তি২ খ ; চী খ, তি১ খ, তি২ খ ; চী গ, তি১ গ, তি২ গ ; চী ঘ, তি১ ঘ, তি২ ঘ

মূল কারিকাটি আ শ্চ র্য্য চ র্য্যা চ য়ে র[৩০] সংস্কৃত টীকায়[৩১] উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তকে চতুর্থ চরণের পাঠ "সংসারে হ্যব্ধস্তথা।" এখানে তি২-র চতুর্থ চরণের পাঠ- ("খোর.বর. মেঁাঙস প'ঙ. দে. বশিন. নো') অনুসারে সংস্কৃতে 'হি' স্থানে 'অপি' (দ্রষ্টব্য তিব্বতী 'ঙ') পাঠ করা উচিত।

যমগুচির সংস্করণে তি২-র গ-চরণে 'স্‌গ্রগ' স্থানে 'স্রুগ' এবং তি২র ঘ-চরণে 'মেঁাঙ' স্থানে 'মেঁাঙস' পাঠ করা উচিত।

চী, তি১, ও তি২ অনুবাদের এখানে প্রধান ভেদ এই যে, তি১-অনুবাদের 'যম' স্থানে চী ও তি২-অনুবাদে 'যক্ষ' পাঠ পাওয়া যায়, এবং এই পাঠই প্রাপ্ত মূল সংস্কৃত কারিকাটিতে সমর্থিত হয়।

১১

ক	চী	সত্ত্বাঃ স্বয়মুৎপাদয়ন্তি রাগম্
	তি১	যথা স্বয়ং পঙ্কং কৃত্বা
	তি২	যথা স্বয়ং পঙ্কে চলনেন
খ	চী	করোতি তেন সংসারহেতুম্
	তি১	বালঃ কশ্চিদাকৃষ্টঃ
	তি২	বালঃ কশ্চিন্ নিমগ্নঃ
গ	চী	কৃত্বা বিভেতি
	তি১	তথাত্যানন্দ
	তি২	তথা কল্পনাপঙ্কে নিমজ্জ্য
ঘ	চী	অজ্ঞানাবিমুক্তঃ
	তি১	বিকল্পপঙ্কে সত্ত্বা নিমগ্নাঃ
	তি২	সত্ত্বা উদ্গমনাক্ষমাঃ

তুলনা

চীক, তি, ক, তি২ক ; চী খ, গ, ঘ তি১ ও তি২ হইতে ভিন্ন ; তি১ খ, তি২ খ ; তি১ গ হইতে চী ও তি২ ভিন্ন ; তি২ গ, তি২ ঘ ; তি২ ঘ এক 'সত্ত্বাঃ' শব্দ ছাড়া চী ও তি১ হইতে

৩০। ম. ম. শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্করণে ইহা চ র্য্যা চ র্য্য বি নি শ্চ য় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিকের "প্রবাসীতে" বর্ত্তমান লেখকের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩১। বৌ দ্ধ গা ন ও দো হা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩ সাল, পৃ ৬।

বিভিন্ন। ঘ-চরণে চী র 'অবিমুক্ত' শব্দটির সহিত তি২-র 'উদ্গমনাক্ষমাঃ' শব্দটি তুলনা করিতে পারা যায়।

পুনরুদ্ধার

ক তি১ক, তি২ক ; খ তি১খ, তি২খ ; গ তি১ঘ, তি২গ ; ঘ তিঘ।

এই কারিকাটি প্রধানতঃ তি২ হইতে করা হইয়াছে। চী'-র প্রথম চরণের শেষে 'জন' শব্দের অর্থ 'রঞ্জন', 'রং', 'রাগ'।

তি১র দ্বিতীয় চরণে প ও ন উভয়ই সংস্করণে 'দগ', পাঠ আছে, কিন্তু বস্তুত হইবে "গ"।

১২

ক	চী	সত্ত্বা মিথ্যাচিত্তেন
	তি১	অভাবে ভাবদর্শনেন
	তি২	অভাবে ভাবদর্শনেন
খ	চী	উৎপাদয়ন্তি মোহমলরাগম্
	তি১	বেদ্যতে দুঃখবেদনা
	তি২	বেদ্যতে দুঃখবেদনা
গ	চী	নিঃস্বভাবং কল্পয়ন্তি সস্বভাবম্
	তি১	আতঙ্কবিপরীতবুদ্ধ্যা
	তি২	জ্ঞানবিষয়য়োস্তয়োঃ
ঘ	চী	বেদয়ন্তে দুঃখেহতিদুঃখম্
	তি১	কল্পনাবিষেণ বাধ্যন্তে
	তি২	বিতর্কবিষেণ বাধ্যন্তে

তুলনা

চী কখ, তি১গ ; চীগ, তি১ক, তি২ক ; চীঘ, তি১খ, তি২খ ; তি২গ সমস্ত হইতে ভিন্ন ; তি২ঘ, তি১ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক তি১ক, তি২ক ; খ চীগ, তি১খ, তিখ ; গ তি২গ ; ঘ তি১ঘ, তি২ঘ।

তি১র প্রথম চরণের শেষে প ও ন উভয় সংস্করণেই 'মিন' পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু

ইহা সঙ্গত হয় না। তি¹-র ন-সংস্করণে এখানে আছে 'য়িন'। তদনুসারে সেখানেও 'য়িন' পাঠ করিতে পারা যায়। তি¹র প-সংস্করণে আছে 'য়িস,' ইহা অনুসরণ করিয়া যমগুচি সেখানেও 'য়িস' পড়িতে চান। এই পাঠই যে উৎকৃষ্টতর তাহাতে সন্দেহ নাই। তি¹র প্রথম চরণের প্রারম্ভে প-সংস্করণের পাঠ 'দোগস', ন-সংস্করণে এখানে আছে 'তোগস'। কিন্তু এই উভয় পাঠই অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হইবে 'তোগ'। তি¹-র চতুর্থ চরণেও ন-সংস্করণে 'তোগস স্থানে 'তোগ' পড়িতে হইবে।

১৩

ক	চী	বুদ্ধঃ পশ্যতি তানত্রাণান্
	তি¹	তানশরণান্ দৃষ্ট্বা
	তি²	তেষামশরণতাদর্শনেন
খ	চী	তত উৎপাদয়তি করুণাচিত্তম্
	তি¹	করুণাবশমানসঃ
	তি²	প্রজ্ঞাকরুণেন মনসা
গ	চী	তত উৎপাদয়তি বোধিচিত্তম্
	তি¹	হিতকরো বুদ্ধঃ সত্ত্বেভ্যঃ
	তি²	সত্ত্বানামুপকারায়
ঘ	চী	বিপুলমভ্যস্যতি[৩২] বোধিচর্য্যাঃ
	তি¹	সম্বোধিচর্য্যাং করোতি[৩৩] (ন)
		(অথবা)
		সম্বোধৌ যোগং করোতি[৩৩] (প)
	তি²	সম্বুদ্ধস্য যোগং কুর্য্যাৎ

তুলনা

চীক, তি¹ কগ, তি²ক ; চীখ, তি¹খ, তি²খ ; চীগ তি¹ ও তি² হইতে ভিন্ন ; তি¹গ, তি²গ ; চীঘ, তি¹ঘ, তি²ঘ।

তি¹-র খ চরণে ন-সংস্করণে 'স্প্যাদ', কিন্তু প-সংস্করণে 'স্ব্যোর'। তি²-র ঘ-চরণে ন-সংস্করণে 'স্যার', কিন্তু প-সংস্করণে 'স্ব্যোর'।

৩২। অথবা 'অভ্যস্তেৎ'। ৩৩। অথবা 'কুর্য্যাৎ।'

পুনরুদ্ধার

ক চীক, তি১ক, তি২ক ; খ চীখ, তি১খ, তি২খ ; গ তি১গ, তি২গ, ঘ চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

১৪

ক	চী	প্রাপ্তোঽনুত্তরজ্ঞানফলম্
	তি১	তাভিঃ পুণ্যসম্ভারং সঞ্চিত্য
	তি২	তেন চ সম্ভারঃ সঞ্চিতঃ সংবৃতৌ
খ	চী	তদা পরীক্ষতে লোকম্
	তি১	কল্পনাজালান্মুক্তঃ
	তি২	অনুত্তরাং বোধিং প্রাপ্তঃ
গ	চী	বিকল্পৈর্বন্ধঃ
	তি১	অনুত্তরং জ্ঞানং প্রাপ্তঃ
	তি২	কল্পনাবন্ধনান্মুক্তঃ
ঘ	চী	তস্মাদ্ ভবতি হিতকরঃ
	তি১	বুদ্ধো লোকবান্ধবো ভবতি
	তি২	বুদ্ধঃ স লোকবান্ধবঃ

তুলনা

চীক, তি১গ, তি২গ ; তি১ক, তি২ক ; চীখ, তি১ঘ, তি২ঘ ; চীঘ, তি১খ, তি২গ ; চীগ, তি১ঘ, তি২ঘ।

তি২-র দ্বিতীয় চরণে 'সংবৃতৌ, ইহার সহিত অন্য দুই অনুবাদের কোনো মিল নাই। চী-র সহিত তি১ক ও তি২খ-রও মিল নাই।

পুনরুদ্ধার

ক তি১ক, তি২খ ; খ চীক, তি২গ, তি১খ ; গ চীগ, তি১খ, তি২গ ; ঘ চীখ-ঘ, তি১ঘ। তি২ঘ।

১৫

ক চী প্রতীত্যসমুৎপাদাৎ

	তি১	ভূতার্থদর্শনায়
	তি২	যথা-[বৎ] প্রতীত্যসমুৎপাদাৎ
খ	চী	জানাতি ভূতার্থম্
	তি১	জাতযথাবজ্জ্ঞানঃ
	তি২	যো ভূতার্থমবলোকতে
গ	চী	অথ পশ্যতি লোকং শূন্যম্
	তি১	তত আদ্যন্তবর্জিতম্
	তি২	স জগচ্ছূন্যং জানাতি
ঘ	চী	আদিমধ্যান্তকোটিবর্জ্জিতম্
	তি১	জগচ্ছূন্যমেব পশ্যতি
	তি২	আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্

তুলনা

চী ক, তি১ খ, তি২ ক; চী খ, তি১ ক, তি২ খ; চী গ, তি১ ঘ, তি২ গ; চী ঘ, তি১ গ, তি২ ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চী ক, তি১ খ, তি২ ক; খ চী খ, তি১ ক, তি২ খ; গ চী গ, তি১ ঘ, তি২ গ ঘ চীঘ, তি১গ, তি২ঘ।

১৬

ক	চী	পশ্যতি সংসারো নির্বাণম্
	তি১	ত আত্মতঃ সংসারম্
	তি২	এবং দর্শনেন সংসারঃ
খ	চী	এতদুভয়মনাত্মতঃ
	তি১	নির্বাণং চ ন পশ্যন্তি
	তি২	নির্বাণং চ ন তত্ত্বতঃ
গ	চী	নিরঞ্জনমবিপরিণতম্
	তি১	নিরঞ্জনং নির্বিকারম্
	তি২	অক্লিষ্টাকারম্

ঘ	চী	আদিশুদ্ধং নিত্যশান্তম্
	তি[১]	আদিশান্তং প্রভাস্বরম্
	তি[২]	আদিমধ্যান্তপ্রকৃতিভাস্বরম্

তুলনা

চী ক-খ, তি[১] ক-খ, তি[২] ক-খ ; চীগ, তি[১] গ ; চীঘ, তি[১] ঘ, তি[২] ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক—খ চীক-খ, তি[১] কখ-, তি[২] ক-খ ; গ চীগ, তি[১] গ ; ঘ চীঘ, তি[১] ঘ, তি[২] গ-ঘ।

১৭

ক	চী	স্বপ্নবিষয়ান্
	তি[১]	স্বপ্নানুভববিষয়ান্
	তি[২]	স্বপ্নেঽনুভূয়মানম্
খ	চী	প্রবুদ্ধো ন পশ্যতি
	তি[১]	প্রবুদ্ধো ন পশ্যতি
	তি[২]	প্রত্যবেক্ষকো ন পশ্যতি
গ	চী	জ্ঞানী মোহনিদ্রাপ্রবুদ্ধঃ
	তি[১]	মোহান্ধকারপ্রবুদ্ধঃ
	তি[২]	মোহান্ধকারোদ্বুদ্ধস্য
ঘ	চী	ন পশ্যতি সংসারম্
	তি[১]	সংসারং নৈব পশ্যতি
	তি[২]	সংসারা নোপলভ্যন্তে

তুলনা

চীক, তি[১] ক, তি[২] ক ; চীখ, তি[১] খ, তি[২] খ ; চীগ, তি[১] গ, তি[২] গ ; চীঘ, তি[১] ঘ, তি[২] ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চীক, তি[১] ক, তি[২] ক ; খ চীখ, তি[১] খ, তি[২] খ ; গ চীগ, তি[১] গ, তি[২] গ ; ঘ চীঘ, তি[১] ঘ, তি[২] ঘ।

এখানে সকলেরই সম্পূর্ণ ঐক্য।

যমগুচি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তি২খ-চরণে যদিও প ও ন উভয় সংস্করণেই 'র্তোগ' পাঠ আছে, তথাপি তাহার স্থানে 'র্তোগস' পড়া উচিত।

১৮

ক চী তেষু ধর্মেষু ধর্মতায়াম্

তি২ মায়ানির্মিতং মায়া দৃশ্যতে

খ চী তত্ত্বান্বেষিণা কিঞ্চিদপি ধর্মো নোপলভ্যতে

তি২ যদা সংস্কৃতং তদা

গ চী যথা মায়াচার্য্যো মায়াবস্তু করোতি

তি২ কিঞ্চিদপি ভাবো নাস্তি

ঘ চী জ্ঞানিনা তথা জ্ঞাতব্যম্

তি২ ধর্মাণাং সৈব ধর্মতা

এ কারিকার তি১ নাই।

তুলনা

চী ক, তি২ঘ ; চীখ, তি২গ ; চীগ, তি২ক। চীঘ ও তি২খ পরস্পর ভিন্ন

পুনরুদ্ধার

ক চীগ তি২ক ; খ চীখ (শেষ অংশ), তি২খ ; গ চীখ, তি২গ ;
ঘ চীক, তি২ঘ।

১৮ক

এই কারিকার জন্য ২১শ কারিকা দ্রষ্টব্য।

১৯

ক চী ইদং সর্বং চিত্তমাত্রম্

তি১ ইদং সর্বং চিত্তমাত্রম্

তি২ ইদং সর্বং চিত্তমাত্রম্

খ চী স্থাপ্যতে মায়ানির্মাণলক্ষণম্

তি১ মায়াবজ্জায়তে

তি২ মায়াবদবতিষ্ঠতে

গ চী ক্রিয়তে কুশলমকুশলং কর্ম

তি১ ততঃ কুশলমকুশলং চ কর্ম

তি১ কুশলৈরকুশলৈশ্চ কর্মভিঃ

ঘ চী ভুজ্যতে কুশলাকুশলা জাতিঃ

তি১ ততো জাতিরুত্তমাধমা চ

তি২ তত উত্তমা অধমাশ্চ জাতয়ঃ

তুলনা

চীক, তি১ক, তি২ক; চীখ, তি১খ, তি২খ; চীগ, তি১গ, তি২গ; ঘ চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চীক, তি১ক, তি২ক; খ চীখ, তি১খ, তি২খ; গ চীগ, তি১গ, তি২গ; ঘ চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

২০

ক চী চিত্তচক্রে নিরুদ্ধে

তি১ চিত্তচক্রে নিরুদ্ধে

তি২ চিত্তচক্রনিরোধেন

খ চী তদা সর্বে ধর্মা নিরুদ্ধাঃ

তি১ সর্ব এব ধর্মা নিরুদ্ধাঃ

তি২ সর্বে ধর্মা নিরুধ্যন্তে

গ চী এতে ধর্মা অনাত্মানঃ

তি১ তত এব ধর্মা অনাত্মানঃ

তি২ ততো ধর্মা অনাত্মনঃ

ঘ চী সর্বে ধর্মা বিশুদ্ধাঃ

তি১ তত এব ধর্মা বিশুদ্ধাঃ

তি২ তেন ধর্মা বিশুদ্ধাঃ

তুলনা

চীক, তি১ক, তি২ক; চীখ, তি১খ, তি২খ; চীগ, তি১গ, তি২গ; চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক চীক, তি১ক, তি২ক; খ চীখ, তি১খ, তি২খ; গ চীগ, তি১গ, তি২গ; ঘ চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

২১

এখানে তি২ অনুবাদে একটি কারিকা (২১), কিন্তু তি১ ও চী অনুবাদে দুইটি করিয়া কারিকা আছে, তি১ ১৬—১৭, চী ১৮—১৯।

ক	চী ১৮	মোহান্ধকারাবৃতাঃ
	চী ১৯	যদি বিকল্প্যতে জাতিমান্
	তি১ ১৬	ভাবেষু নিঃস্বভাবেষু
	তি১ ১৭	জাতিঃ স্বয়ং ন জাতা
	তি২	ভাবে স্বভাবে বা
খ	চী ১৮	পতন্তি সংসারসাগরে
	চী ১৯	সত্ত্বো ন যথাযুক্তঃ
	তি১ ১৬	নিত্যাত্মসুখসংজ্ঞয়া
	তি১ ১৭	জাতিলোকৈর্বিকল্পিতা
	তি২	নিত্যং সুখ সংজ্ঞয়া
গ	চী ১৮	অজাতং মন্যন্তে জাতম্
	চী ১৯	সংসার ধর্মে
	তি১ ১৬	রাগমোহতমশ্ছন্নস্তু
	তি১ ১৭	বিকল্পাঃ সত্ত্বাশ্চ
	তি১	মোহন্ধকারাবরণেন
ঘ	চী ১৮	উৎপাদয়ন্তি লোকে বিকল্পম্
	চী ১৯	উৎপাদ্যতে নিত্যাত্মসুখসংজ্ঞা
	তি১ ১৬	ভবাব্ধিরয়মুদ্ভূতঃ
	তি১ ১৭	উভয়মেতন্ন যুজ্যতে
	তি২	বালঃ সংসারসাগরে ভ্রমতি

তুলনা

চী ১৮ক, তি১ ১৬গ, তি২গ ; চী ১৮খ, তি১ ১৬ঘ, তি২ঘ ; চী ১৮গ, তি১ ১৭ক (তুল : চী ১৯ক) ; চী ১৮ঘ, তি১ ১৭খ, চী ১৯খ, তি১ ১৭গ-ঘ ; চী ১৯গ, তি১ ১৬ক, তি২ ক ; চী ১৯ঘ, তি১ ১৬খ, তি২ খ।

চী ১৮ক-খ, তি১ ১৬গ-ঘ, তি২গ-ঘ ; চী ১৯ গ-ঘ, তি১ ১৬ক-খ, তি২ক-খ ; চী ১৮ গ-ঘ, তি১ ১৭ক-খ।

পুনরুদ্ধার

ক-খ চী ১৯গ-ঘ, তি১ ১৬ক-খ, তি২ক-খ ; গ-ঘ চী ১৮ ক-খ, তি১ ১৬গ-ঘ, তি২গ-ঘ।

প্রধানত তি১ ১৬ হইতেই এই কারিকাটি পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। তি১ ১৭ হইতে পুনরুদ্ধৃত কারিকাটি মূলে ১৮ক সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম চরণে 'জাতিমান্'[৩৪] শব্দ সম্বন্ধে কিছু বিচার্য্য আছে। চী ১৯ক-চরণে পাওয়া যায় 'যু শেঙ', ইহার অর্থ 'জাতিমান্', অর্থাৎ 'জীব' (দ্রষ্টব্য Rosenberg p. 244)। তদনুসারে তি১ ১৭ক-চরণে ন ও প উভয় সংস্করণেই প্রাপ্ত পাঠ 'স্ক্যে-ব' স্থানে 'স্ক্যে-বো 'জনঃ', অথবা স্ক্যে-বু' 'পুরুষঃ' পাঠ করা উচিত। ঐ চরণেই প-সংস্করণের 'র্নমস' পদের পূর্ব্বে 'স্ক্যে' স্থানে ন-সংস্করণ অনুসারে 'স্ক্যোস' পাঠ করা কর্ত্তব্য। খ-চরণে স্পষ্টতই 'সেসম' ভুল পাঠ, উহার স্থানে ন-সংস্করণ অনুসারে 'সেমস' পড়িতে হইবে।

২২

ক	চী	সংসার চক্রপরিবর্ত্তন-মহাসাগরে
	তি১	•
	তি২	কল্পনানদীপূর্ণস্য
খ	চী	সত্ত্বক্লেশ সলিলসম্পূর্ণে
	তি১	মহাযানমনাশ্রিতঃ
	তি২	সংসারমহাসাগরস্য
গ	চী	যদি নোহ্যতে মহাযানেন
	তি১	সংসারমহাসাগরস্য
	তি২	মহাযাননাবমনারূঢ়ঃ
		নিশ্চয়েন কথং প্রাপ্নুয়াৎ তৎপারম্
	তি১	পারমুত্তীর্ণো ন ভবিষ্যতি
	তি২	কঃ পারং গমিষ্যতি

তুলনা

চীক, তি২খ ; চীখ, তি২ক ; চীগ, তি১খ, তি২গ ; চীঘ, তি১খ, তি২ঘ।

৩৪। তৃতীয় চরণ দ্রষ্টব্য, তুলনীয় "সত্ত্বাঃ"। তিব্বতীয় যথাযথ পাঠ অনুসারে এই পঙক্তির অনুবাদ হইবে—'জাতির্নৈব পরঃ জাতা'।

পুনরুদ্ধার

ক চীখ, তি২ ক; খ চীক, তি১গ তি২খ; গ চী.গ, তি১খ, তি২গ; ঘ চীঘ, তি১ঘ, তি২ঘ।

প ও ন উভয় সংস্করণেই তি১ক পাওয়া যায় না। তি২ক-চরণে 'ছু.বোস' স্থানে 'ছু.য়িস' পাঠ করা উচিত; তাহা হইলে 'কল্পনা-নদী' না হইয়া 'কল্পনা-জল' অর্থ হইবে, এবং ইহাই এখানে সঙ্গত ও চীখ দ্বারা সমর্থিত।

প রি চ য়ে (§৫) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই কারিকাটি জ্ঞা ন সি দ্ধি তে পাওয়া যায়।

২৩

ক	চী	বুদ্ধেন বিস্তরশো লোকধর্মো দেশিতঃ
	তি১	অবিদ্যাপ্রত্যয়োৎপন্নমিদম্
খ	চী	জ্ঞেয়মিদমবিদ্যাপ্রত্যয়োৎপন্নম্
	তি২	সম্যগ্ লোকবিদঃ পশ্চাৎ
গ	চী	যদি বিকল্পচিত্তমনুৎপাদয়িতুং শক্যতে
	তি২	এষাং বিকল্পানাম্
ঘ	চী	সর্বে সত্ত্বাঃ কথং জাতাঃ
	তি২	কুত উদ্ভবো ভবেৎ

তুলনা

চীক, তি২খ; চীখ, তি১ক; চীগ, তি২গ; চীঘ, তি২ঘ।

পুনরুদ্ধার

ক তি২ক; খ তি১খ; গ তি২গ; ঘ তি২ঘ।

তি১ অনুবাদে ইহা নাই।

ভণিতা

চী ম হা যা ন কা রি কা বিং শ ক শা স্ত্রং ম হা না গা র্জু ন কৃতং সন. ভারতীয়েন ত্রৈপিটকেন দা ন পা লে ন পরিবর্ত্তিতম্।

তী১ ম হা যা ন বিং শ ক ম্ আচার্য্যার্য না গা র্জু ন কৃতং সম্পূর্ণম্। কাশ্মীরকেণ পণ্ডিতেন আ ন ন্দে ন পরিবর্তকেন ভিক্ষুণা কী র্ত্তি ভূ তি প্র জ্ঞে ন চ পরিবর্ত্তিতম্।

তি২ মহাযানবিংশকম্ আচার্য না গা র্জু ন পাদকৃতং সম্পূর্ণম্। ভারতীয়েন পণ্ডিতেন চ ন্দ্র কু মা রে ণ ভিক্ষুণা শা ক্য প্র ভে ণ চ পরিবর্ত্তিতম্।

বিবৃতি

১

তি১ এর গ চরণে 'ব্লো.চন' পদের পরে প-সংস্করণে 'ব্লোন মেদ' এবং ন-সংস্করণে 'ব্লো.মেদ, দেখা যায়। এই চরণের শেষ বর্ণ 'প'ই' স্পষ্টই সূচনা করিতেছে যে, 'ব্লোন মেদ' অথবা 'ব্লো-মেদ' পরবর্ত্তী ঘ-চরণের 'মথুন' শব্দের সহিত অম্বিত হইবে। এই জন্য আমার মনে হয় যে, উল্লিখিত পাঠ দুইটির কোনটিই গ্রহণ না করিয়া 'ব্লু.মেদ' (='ব্লু.ন মেদ.প') "অনুত্তর" এই পাঠ করা উচিত। ইহা তি১র ঘ-চরণের 'মথ্.বস ম. মি থ্যব' ইহার সহিত মিলে ও চী ক এর (পু খো সুম্ ই হ্ সিং) দ্বারা সমর্থিত হয়।

ক-চরণে 'বাগ্ ধর্মে'ণ (অথবা 'বাচা') অবাচ্যম্ (অথবা 'অনভিলাপ্যম'; [তি১ 'বর্জোদ. প'ই ছোস.ক্যিস.নি.বর্জোদ. দু মেদ', ; তি১ 'র্জোদ.ব্যেদ.বর্জোদ. পর.ব্যর.মিন'] অথবা ন বাচ্যং (অভিলাপ্যং) নাবাচ্যং (অনভিলাপ্যং)' ; কিংবা 'ন বচনং নাবচনং (চী 'ফাই য়েন ফাই য়্ য়েন')' বুদ্ধদেবের 'অনক্ষর' ধর্ম্মকে সূচনা করিতেছে। 'অনক্ষর' অর্থাৎ যাহাকে অক্ষর বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। দ্রষ্টব্য ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি, পৃ· ১৬৪, বো ধি চ র্যা-ব তা র প ঞ্জি কা (সামান্য পাঠভেদ), পৃ ৩৬৫ :—

অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।
শ্রূয়তে দেশ্যতে চাপি সমারোপাদনক্ষরঃ ॥

বো ধি চ র্য্যা ব তা র প ঞ্জি কা য় (পৃঃ ৪১৯) উদ্ধৃত ল ঙ্কা ব তা র :—

যস্যাং রাত্রৌ তথাগতোঽভিসম্বুদ্ধো যস্যাং পরিনির্বৃতোঽত্রান্তরে তথাগতেনৈকমপ্যক্ষরং নোদাহৃতম্।

বো.চ.প (পৃ ৪২০) ও ত ত্ত্ব র ত্না ব লী-ধৃত (অ. ব. স, পৃ ২২) চ তু স্ত বে—

নোদাহৃতং ত্বয়া কিঞ্চিদেকমপ্যক্ষরং বিভো।
কৃৎস্নশ্চ বিনেয়জনো ধর্ম্মবর্ষেণ তর্পিতঃ ॥

তুলনীয় (ম.বৃ, পৃ ৩৪৮, ৪২৯)—

যোঽপি চ চিন্তয়ি শূন্যক ধর্মান্
সোঽপি কুমার্গপপন্নকু বালঃ।
অক্ষরকীর্ত্তিত শূন্যক ধর্ম্মাঃ
তে চ অনক্ষর অক্ষর উক্তাঃ।

ম.সূ.অ, ১২.২—

ধর্মো নৈব চ দেশিতো ভগবতা প্রত্যাত্মবেদ্যো যতঃ।
আকৃষ্টা জনতা চ যুক্তিবিহিতৈর্ধর্মৈঃ স্বকীং ধর্মতাম্ ॥

কে.উ, ৩—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥

২

খ-চরণে 'নিরোধ' (তি॰ 'গগ.প') বা 'মোক্ষ' (তি॰ —'গ্রোল ব') ; এই স্থানে চী 'অনুবৃত্তি' ('সুই তেন'), স্পষ্টতই ইহা ভুল পাঠ ; 'নির্বৃতি' বা 'নির্বাণ' লিখিতে গিয়া চীনা-অনুবাদক 'অনুবৃত্তি' লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যমগুচির 'নিবৃৎ' (='নিবৃতি') না লিখিয় 'নিবৃত্তি' লেখা উচিত ছিল। 'মোক্ষ' (তি॰) অপেক্ষা 'নিরোধ' পাঠই এখানে উৎকৃষ্টতর।

নাগার্জুনের 'অনুৎপাদ ও অনিরোধ'-বাদ তাঁহার ম ধ্য ম ক কা রি কা য় প্রসিদ্ধ। তাঁহার যু ক্তি ষ ষ্টি কা (২০) হইতে নিম্নলিখিত কথাটি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়—

দে.ল্তর চি. যঙ স্ক্যে. ব. মেদ।
চি. যঙ 'গগ. পর. মি. 'গ্যুর. রো ॥

ইহাকে এইরূপে অনুবাদ করা যাইতে পারে—

ন কশ্চিদেবমুৎপাদো
নিরোধোঽপি ন কশ্চন ॥

আকাশের ন্যায় বুদ্ধ ও জীবগণের উৎপত্তিও নাই নিরোধও নাই। অতএব এই বিষয়ে তাহাদের লক্ষণ একই।

দ্রষ্টব্য অ প্র পা, পৃ ৩৯-৪০ : "মায়োপমাস্তে দেবপুত্রাঃ সত্ত্বাঃ স্বপ্নোমাস্তে দেবপুত্রাঃ সত্ত্বাঃ। ° সম্যক্‌সম্বুদ্ধোঽপ্যার্য্য সুভূতে মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ।°" বো চ.প, ৯.১৫১ (পৃঃ ৫৯০) :—"যতশ্চানুৎপন্নানিরুদ্ধাঃ সর্বধর্মা অত আহ নির্বৃতেত্যাদিঃ

নির্বৃতানির্বৃতানাং চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ।"

এই স্থানেই নাগার্জুনের চ তু স্ত ব হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"বুদ্ধানাং সত্ত্বধাতোশ্চ যেনাভিন্নত্বমর্থতঃ।
আত্মনশ্চ পরেষাং চ সমতা তেন তে মতা ॥"

৪

'শুদ্ধ' ও 'শান্তস্বভাব' এই দুই শব্দের অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য ১৬ শ কারিকার বিবৃতি ও ম.বৃ, পৃ ৩৭৮, পং ৮—এতচ্চ শান্তস্বভাবমতৈমিরিককেশদর্শনবৎ স্বভাবরহিতম্।

'অদ্বয়' অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়-রহিত।

'তথতা' (তথ+তা) তথ্য, সত্য। যাহা সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব অবস্থায় সেইরূপেই ("তথৈব") থাকে তাহা 'তথতা'। বসুবন্ধু ত্রিংশিকায় (লেবি, পৃঃ ৪১) বলিয়াছেন:— "তথতাপি সঃ। সর্বকালং তথাভাবাৎ।" স্থিরমতি ইহার টীকায় লিখিয়াছেন:— "তথতা। তথা হি পৃথগ্জনশৈক্ষাশৈক্ষাবস্থাসু সর্বকালং তথৈব ভবতি নান্যথেতি তথতেত্যুচ্যতে।" এই শব্দটি এখানে প্রয়োগ করিবার ইহাই তাৎপর্য্য যে, পদার্থসমূহ শূন্য বা প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ইহাদের উৎপত্তিও নাই নিরোধও নাই, সর্ব্বদা একই ভাবে রহিয়াছে। ম ব, পৃ ১৭৬:—"শূন্যতাং তথতালক্ষণাম্।" শি স, পৃ.২৬৩:— "ধর্মসঙ্গীত্যামপ্যুক্তম্। "তথতা তথতেতি কুলপুত্র শূন্যতায়া এতদধিবচনম্। সা চ শূন্যতা নোৎপদ্যতে ন নিরুধ্যতে। আহ। যদ্যেবং ধর্মাঃ শূন্যা উক্তা ভগবতা তস্মাৎ সর্বধর্মা নোৎপৎস্যন্তে ন নিরোৎসন্তে। নিরারম্ভো বোধিসত্ত্বঃ। আহ। এবমেব কুলপুত্র তথা যথাভিসংবুধ্যসে সর্বধর্মা নোৎপদ্যন্তে ন নিরুধ্যন্তে। আহ। যদেতদুক্তং ভগবতা সংস্কৃতধর্মা উৎপদ্যন্তে নিরুধ্যন্তে চেত্যস্য তথাগতভাষিতস্য কোঽভিপ্রায়ঃ। আহ। উৎপাদনিরোধাভিনিবিষ্টঃ কুলপুত্র লোকসন্নিবেশঃ। তত্র তথাগতো মহাকারুণিকো লোকস্যোৎত্রাসপদপরিহারার্থং ব্যবহারবশাদুক্তবানুৎপদ্যন্তে নিরুধ্যন্তে চেতি। ন চাত্র কস্যচিদ্ ধর্মস্যোৎপাদো ন নিরোধ ইতি।" বো চ.প, পৃ. ৩৫৪:—"পরম উত্তমোঽর্থঃ পরমার্থঃ। অকৃত্রিমং বস্তুরূপং যদধিগমাৎ সর্বাবৃতিবাসনানুসন্ধিক্লেশপ্রহাণং ভবতি সর্ব্বধর্ম্মাণাং নিঃস্বভাবতা শূন্যতা তথতা ভূতকোটিঃ। ধর্মধাতুরিত্যাদিপর্যায়ঃ। সর্বস্য হি প্রতীত্যসমুৎপন্নস্য পদার্থস্য নিঃস্বভাবতা পারমার্থিকং রূপম্। যথাপ্রতিভাসং সাংবৃতস্যানুৎপন্নত্বাৎ।" অ.প্র.পা, পৃ ২৭৩:—"শূন্যমিতি দেবপুত্রা° অভাব ইতি নির্বাণমিতি ধর্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা°।" দ্রষ্টব্য—ঐ, পৃ ৩৪৭; Stcherbatsky, *The Conception of Buddhist Nirvana*, p.35.

'সম' সমান। সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি নাই, এই হিসাবে তাহারা সম। আর্যসত্যদ্বয়াবতারসূত্রে (ম.বৃ, পৃ ৩৭৪-৫) উক্ত হইয়াছে:—"পরমার্থতঃ সর্বধর্মানুৎপাদসমতয়া পরমার্থতঃ সর্বধর্মাত্যন্তাজাতিসমতয়া পরমার্থতঃ সমা ধর্মাঃ।" দ্রষ্টব্য এই লেখকের প্রকাশ্য গৌড়পাদের আগমশাস্ত্র (*Gaudapada's Āgamaśāstra*) ৪ ৯৩।

১৬

পুনরুক্ত কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত তুলনীয় যু ক্তি ষ ষ্টি কা, ৭ :—

ম্রিদ.প দঙ.নি.ম্য.ঙন. 'দস।

গঞিস পো. 'দি.নি. য়োদ.ম য়িন।

সংস্কৃতে ইহা হইবে—

নির্বাণং চ ভবশ্চৈব দ্বয়মেতন্ন বিদ্যতে।

এই কারিকায় চী ও তি'-র মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে। তি১-র ক-খ চরণে আত্মতো° ন' (বদগ ঞিদ····· মি') ও চী-র খ-চরণে 'অনাত্মতঃ' (বু বো) বস্তুত একই। এখানে 'আত্মন্' শব্দের অর্থ 'স্বভাব', এবং ইহা ও তি১-র খ-চরণে 'তত্ত্ব' ('তত্ত্বতঃ,' 'দে.ঞিদ') একই।

চী-র গ-চরণে 'বু জন' শব্দের অর্থ 'অনুপলিপ্ত' (Rosenberg, *Introduction*, Tokyo, 1916, p. 39)। ইহাকে তি১-র গ-চরণে 'নিরঞ্জন' ('ম.গোস') শব্দের পর্য্যায়-রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তিব্বতী 'গোস প' শব্দে 'লিপ্ত' বুঝায় (শরচ্চন্দ্রদাসের তি ব্ব তী-ইং রা জী অ ভি ধা ন, পৃ ২৩৩)। অতএব 'ম গোস প' বলিতে 'অলিপ্ত', এবং 'অলিপ্ত' ও 'নিরঞ্জন' বস্তুত একই। ত ত্ত্ব র ত্না ব লি তে (অ দ্ব য় ব জ্র সং গ্র হ, গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সীরিজ, পৃ ৮, পং ২৪) 'নিরঞ্জন' শব্দটির তিব্বতী অনুবাদ 'ম.গোস প' ইহাই দেখা যায়। এই শব্দটির তাৎপর্য্যার্থের জন্য দ্রষ্টব্য ম.বৃ, পৃ ২৮৫-৬—"যশ্চ বিভবোঽনুপাদানঃ [স] স্কন্ধরহিতত্বাৎ প্রজ্ঞপ্ত্যুপাদানকারণরহিতত্বান্নির্হেতুকঃ স্যাৎ। যশ্চানুপাদানো নিরঞ্জনোঽব্যক্তো নির্হেতুকঃ কঃ সঃ। ন কশ্চিৎ সঃ। নাস্ত্যেব স ইত্যর্থঃ।" তুলঃ—ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ৪—"নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।"

তি১গ 'নির্বিকার' ("গ্যুর ব মেদ') ও চীগ 'অবিপরিণত' ('বু হুয়াই') বস্তুত একই (Rosenberg, ঐ, পৃ ১০২)। এইরূপ স্থলে 'বিকার' ও 'বিপরিণামের' মধ্যে কোন ভেদ নাই। 'নির্বিকার' অর্থে বস্তুত 'অসংস্কৃত' দ্রষ্টব্য ম হা যা ন সূ ত্রা ল ঙ্কা র, ১১-৩৭—"অবিকারিতা অসংস্কৃতমাকাশাদিকম্।"

তি১ঘ 'গজোদ' 'আদি' এবং চীঘ 'পেন' 'মূল' একই অর্থে গৃহীত হইতে পারে।

তি১গ 'অক্লিষ্টাকার' ('ঞোন.মোংস প য়ি র্নম.প মেদ') বস্তুত চীগ 'শুদ্ধ' ('ছিঙ চিঙ') ভিন্ন কিছুই নহে।

তি°য 'প্রভাস্বর' ("ওদ-গসল.ব') ও তি°য 'প্রকৃতিভাস্বর' ('রঙ'.বশিন.গসল [প-পাঠ 'বসল']) একই। দ্রষ্টব্য ম বৃ, পৃ.৪৪৪; ম হা যা ন সূ ত্রা ল ঙ্কা র, ১১ ১৩:—

তত্ত্বং যৎ সততং দ্বয়েন রহিতং ভ্রান্তেশ্চ সন্নিশ্রয়ঃ
শক্যং নৈব চ সর্বথাভিলপিতুং যচ্চাপ্রপঞ্চাত্মকম্।
জ্ঞেয়ং হেয়মথো বিশোধ্যমমলং যচ্চ প্রকৃত্যা মতং
যস্যাকাশসুবর্ণবারিসদৃশী ক্লেশাদ্বিশুদ্ধির্মতা॥

'তৃতীয়ং বিশোধ্যং চাগন্তুকমলাদ্, বিশুদ্ধং চ প্রকৃত্যা, যস্য প্রকৃত্যা বিশুদ্ধস্যাকাশসুবর্ণবারিসদৃশী ক্লেশাদ্ বিশুদ্ধিঃ। ন হ্যাকাশাদীনি প্রকৃত্যা শুদ্ধানি, ন চাগন্তুকমলাপনয়নাদেষাং বিশুদ্ধির্নেষ্যতে ইতি।"

তি°য-চরণে 'আদিমধ্যান্ত' ('থোগ.ম.দবুস.মথ') বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা। বস্তুত এরূপ কিছু না থাকিলেও সাধারণ লোকে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে।

তি°য 'আদিশান্ত' ('গজোদ.নস শি') 'প্রথম হইতেই শান্ত', এবং চীয 'নিত্যশান্ত" ('ছা.ভি চিঙ') মধ্যমকদর্শনে সুপ্রসিদ্ধ, যেমন নাগার্জ্জুনের ম ধ্য ম ক কা রি কা, ৮-১৬:—

"প্রতীত্য যদ্ যদ্ ভবতি তত্তচ্ছান্তং স্বভাবতঃ।
তস্মাদুৎপদ্যমানং চ শান্তমুৎপত্তিরেব চ॥"

দ্রষ্টব্য—ম ধ্য ম কা ব তা র, পৃ ২২৫; ম হা যা ন সূ ত্রা ল ঙ্কা র, ১১ ৫১: "যো হি নিঃস্বভাবঃ সেঽনুৎপন্নঃ, যোঽনুৎপন্নঃ সোঽনিরুদ্ধঃ, যোঽনিরুদ্ধঃ স আদিশান্তঃ, য আদিশান্তঃ স প্রকৃতিপরিনির্বৃত ইতি।" ম বৃ, পৃ ২১৫: আদিশান্তাহ্যনুৎপন্না প্রকৃত্যৈব চ নির্বৃতাঃ।" গৌড়পাদের আ গ ম শা স্ত্র (=গৌ ড় পা দ কা রি কা) ৪ ৯৩: "আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃত্যৈব সুনির্বৃতাঃ। সর্বে ধর্মাঃ সমাভিন্না অজং শান্তং বিশারদম্॥"

১৮

তি°র ক-চরণে 'মায়ানির্ম্মিত' ('স্গ্যু.মস. স্প্রুল.প') শব্দের 'মায়া' পদটির অর্থ চী-র 'মায়াচার্য্য' ('হুয়ান শিঃ') শব্দের সহিত মিলাইলে 'মায়াকার' ধরিতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য নাগার্জুনের ম.কা, ১৭, ৩১-৩২।

'ধর্মাণাং ধর্মতা' অর্থাৎ বস্তুসমূহের যথার্থ অবস্থা, বা স্বভাব। ম.বৃ, পৃ ৩৬৪: "ধর্মতা ধর্মস্বভাবো ধর্মপ্রকৃতিঃ।" দ্রষ্টব্য Stcherbatsky: *The Conception of Buddhist Nirvana*, 1927, p. 47.

তি॰ খ-গ, 'য-দা॰ নাস্তি', সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, যাহা কিছু সংস্কৃত তাহা প্রতীত্য-সমুৎপন্ন, এবং সেই জন্যই তাহা শূন্য। দ্রষ্টব্য ম.কা, ৭; বিশেষত ৭-৩৩ঃ "উৎপাদস্থিতি-ভঙ্গানামসিদ্ধের্নাস্তি সংস্কৃতম্।"

১৯

চী খ-চরণে 'অন লি' সংস্কৃতে 'স্থাপন' অর্থে ধরিতে পারা যায়। এইরূপ চী ঘ-চরণে 'কান' শব্দের দ্বারা সংস্কৃত √ ভুজ্ 'ভোগ করা' বুঝা যাইতে পারে।

তি॰ ঘ-চরণে 'দে স্রিস' স্থানে 'দে-লস্' পাঠ করা উচিত, যদিও পূর্ব্বোক্ত পাঠটি প ও ন উভয় সংস্করণেই পাওয়া যায়।

জগৎ যে চিত্তমাত্র ইহা যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীদের মত। এ সম্বন্ধে পাঠকেরা নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন:—বিংশতিকারিকা, ১:—"চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকম্" (সেখানকার বৃত্তিতে, পৃ ৩, ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে); দশভূমক-সূত্র (Rahder), পৃ ৪৯; সুভাষিতসংগ্রহ (Bendall), পৃ ১৯; লঙ্কাবতার (Nanjio), ৩.৫১-৫৩; পৃ ১৬৪. ১০.১৫৩-১৫৪, পৃ ২৮৫; পৃ ১৬৯; ৩.৬৬, ৭৮, পৃ ১৮০-১৮৬; তুলনীয়—গৌড়পাদকারিকা, ৩.৩১; ৪.৪৭, ৬১, ৭২।

২০

তি॰ গ ও ঘ-চরণে 'দে.ঞিদ' এর আক্ষরিক অর্থ 'তত্ত্ব' বা 'তদেব', কিন্তু ঐ তিব্বতী শব্দটি এখানে 'দে.ঞিদ.ফ্যির' অর্থাৎ 'তত এব' বা 'তেনৈব' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তি॰-র গ ও ঘ-চরণে যথাক্রমে 'দে.ফ্যির' ও 'দেস.ন' প্রয়োগ থাকায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

তুল: নাগার্জ্জুন, ম. কা, ১৮.৭—

> "নিবৃত্তমভিধাতব্যং নিবৃত্তে চিত্তগোচরে।
> অনুৎপন্নানিরুদ্ধা হি নির্বাণমিব ধর্মতা॥"

২৩

তি॰ খ-চরণে 'পশ্চাৎ' ('ফ্যির') শব্দের ভাবার্থ 'উক্ত তত্ত্ব জানিবার পরে।' পুনরুদ্ধৃত কারিকায় ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ

বিদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও উৎকলের ভক্ত বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণের রচিত নানাগ্রন্থের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে বঙ্গদেশ ও উৎকলের নানাস্থানে বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধপণ্ডিত ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উৎকলের স্থানীয় গ্রন্থে উৎকল-বৌদ্ধসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকিলেও, বাঙ্গালার বৌদ্ধসমাজের পরিচয় ঐ সময়ে রচিত স্থানীয় গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। ঐ সময়ে যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে বৌদ্ধ-স্মৃতি অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের প্রথম কবি ময়ূরভট্ট যেরূপভাবে অনাদি ধর্ম্ম বা শূন্য ব্রহ্মের মাহাত্ম্য-প্রচার উপলক্ষে নিজগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ আর সেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপূজা প্রচার উপলক্ষে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হন নাই। সে সময়ে রাঢ়বাসী সাধারণে ধর্ম্মের গান শুনিতে ভাল বাসিত। সাধারণকে সন্তুষ্ট ও অর্থাগমে সুবিধা হইবে ভাবিয়াই অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা উচ্চবর্ণের কবি লেখনী ধারণে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে রূপরাম, খেলারাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রভৃতি কবি ময়ূরভট্টের পথানুসরণ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিলেও তাঁহাদের গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের নিদর্শন হিন্দুদেবদেবীগণের বন্দনা স্থান পাইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ-প্রভাবের স্মৃতিও ডুবিয়া গিয়াছে। যে রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' লিখিয়া শূন্যব্রহ্মের মাহাত্ম্যই রূপকভাবে ও সময়োপযোগী করিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই শূন্যপুরাণের আদর্শ লইয়া সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইলেও তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের হস্তে বৌদ্ধগন্ধ লোপ পাইয়া পূরা ব্রাহ্মণ্যভাব ধারণ করিয়াছে। তবে কোন কোন ধর্ম্মপণ্ডিত এখনও বলিয়া থাকেন যে, সদ্ধর্ম্মমূলক ধর্ম্মপূজার পুথি বা আদি ধর্ম্মমঙ্গলগুলি অতি গোপনে তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ-ভক্তের হস্তে পড়িলেই সেই সকল গ্রন্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছেন।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে ও উৎকলে বৌদ্ধ-প্রভাব

সেই সকল অতিগুপ্ত পুথির অন্যতম রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ[১]। ৪।৫ শত বর্ষের মধ্যে বাঙ্গালায় বহু কবি 'রামায়ণ' লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু রামানন্দের গ্রন্থ এদেশে অনেকে দেখেন নাই বা নামও শোনেন নাই।

রামানন্দের রামায়ণ

এই রামায়ণের বিশেষত্ব এই, গ্রন্থকার প্রতি উপাখ্যানের শেষে যে ভণিতা দিয়াছেন, তন্মধ্যেই তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য, ধর্ম্মমত, তাঁহার নিজ অবস্থা, সে সময়ের সমাজের অবস্থা প্রভৃতি অতি সরল ও ওজস্বী ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে—অপর কাহারও বাঙ্গালা রামায়ণে এরূপ পথ অবলম্বিত হয় নাই।

এই রামায়ণের বিশেষত্ব

ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকার নিকট হইতে শ্রীপশুপতি হাজরা নামে এক ব্যক্তি রামানন্দ ঘোষের এই 'নূতন রামায়ণের' হস্তলিখিত পুথিখানি আনিয়া দিয়াছিলেন, এই পুথিখানি অমূল্য গ্রন্থ মনে করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করি[২]। কিন্তু গ্রন্থখানি খণ্ডিত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য দীর্ঘকাল বহু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার মনস্কামনা

১ রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থের 'রামলীলা' নাম দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশ ভণিতা হইতে 'রামায়ণ' বা 'নূতন রামায়ণ' নাম পাওয়া যায়,—

"রামানন্দ কহে শুন সন্ত ভক্তগণ।
অমৃত আখ্যান এই পোতা রামায়ণ॥" (আদিকাণ্ড, ১:৬ পত্র, ১ম পৃঃ)।

"রামানন্দ রচিত নূতন রামায়ণ।
অপক পকতা হবে করিলে শ্রবণ॥
সাধারণ যে জন সে সিদ্ধদেহ হবে।
সিদ্ধ বিন্দুকণা যেই কর্ণপথে পিবে॥" (আদিকাণ্ড, ১৩০ পত্র, ২য় পৃ)।

২ সুহৃদ্বর রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"The Manuscript of Ramlla was collected last year (i. e. 1919) by Ramkumar Dutta of Patrasaer, a village in the Bankura District. It was purchased by Prachyavidyamaharnava Nagendra Nath Vasu for his library of old Manuscripts"—Bengali Ramayanas, p. 241.

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুথিখানি আমাকে রামকুমার দত্ত বিক্রয় করে নাই, অম্বিকার নিকট হইতে ১৩ বর্ষ পূর্ব্বে পশুপতি হাজরা নামে এক ব্যক্তি আসিয়া পুথিখানি আমাকে দিয়াছিলেন। মূল পুথির মধ্যে লিখিত আছে,—

"এই পুস্তক হইল রামকানাই হাজরার।
লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর চন্দ ভাগিনা তাহার॥
নিবাস অম্বিকার দক্ষিণ নাথুয়া বাসাই।
ইবে বাস রাণীহাটী সিমূল নবনাই॥" সন ১১৮৭, ১৬ই পৌষ।

পূর্ণ হয় নাই। এই রামায়ণের রামচরিত সম্বন্ধে আলোচনা অলোচ্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তিকার বিষয়ীভূত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন[৩]।

সাধারণতঃ গ্রন্থের শেষাংশেই গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের শেষ না হইতে পুথি খণ্ডিত হওয়ায় ও শেষাংশ না থাকায় গ্রন্থকার রামানন্দ ঘোষের পিতৃকুল-পরিচয় জানিবার উপায় নাই[৪]।

রামানন্দ 'সূর্য্যবংশ-বর্ণন' প্রসঙ্গে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"গ্রামধাম স্থানাস্থান করিলা নির্ণয়।
গ্রামশ্রেণীরূপে লোকের আলয় আশ্রয়॥"

গ্রন্থদাতা পশুপতি হাজরাকে (যাহার জন্ত মূল পুথি লিখিত হইয়াছিল) সেই রামকানাই হাজরার বংশধর বলিয়াই মনে করি। পুথিখানি আমিই দীনেশবাবুকে দেখাইয়াছিলাম। এই পুথিখানি লঙ্কাকাণ্ডের শেষাংশে খণ্ডিত হওয়ায় ইহার সম্পূর্ণ পুথি উদ্ধার করিবার আশায় এই সুদীর্ঘ কাল যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়াতে এই পুথি সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কিছু আলোচনা করি নাই। বর্ত্তমান বৌদ্ধতত্ত্ব প্রসঙ্গে এই নূতন রামায়ণের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।

যোগবলে আপনি সৃজিলা ধনুর্ব্বেদ।
বিপ্র ক্ষেত্রি শূদ্র বৈশ্য কৈলা জাতিভেদ॥
গ্রামেশ্বর রাজা কৈলা ক্ষত্রিয় নন্দনে।
গোকৃষি বাণিজ্য নিয়োজিলা বৈশ্যগণে॥
তপস্যাতে যুক্ত কৈলা ব্রাহ্মণের গণে।
শূদ্রগণে নিয়োজিলা ব্রাহ্মণ সেবনে॥
তপস্যা কালেতে থাকে ব্রাহ্মণ সেবায়।
বৈসয়ে রাজার রাজ্যে রাজক্ষেম খায়॥
গ্রামদেশ সৃজিলা করিলা রাজকর।
রাজকর্ম্ম কে করিবে চিন্তিলা অন্তর।

৩ রায় বাহাদুর তাঁহার Bengali Ramayanas গ্রন্থে রামানন্দের রামচরিত অংশের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

৪ রামানন্দের নিবাস ও জাতি সম্বন্ধে দীনেশবাবু তাঁহাকে বীরভূমবাসী ও সদ্গোপ জাতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও রামানন্দ ঘোষ আপনাকে এই বলিয়া পরিচিত করেন নাই।

যজ্ঞ করে যজ্ঞকুণ্ডে অর্থী দিলা দানে।
সূর্য্যকৃপা হইতে উঠে মসিজীবিগণ॥
রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তারা সব হৈল।
মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল॥"

(আদিকাণ্ড, ১৩পাতার ১ম পৃষ্ঠা)।

বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু রাজপাট স্থাপন ও চারি বর্ণের বৃত্তি নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু রাজকার্য্য কে করিবে? এ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা হইল। তিনি যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ করিলেন ও অর্থিগণকে দান করিলেন। তাহাতে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইলেন। সূর্য্যের কৃপায় মসিজীবিগণের উদ্ভব হইল। তাহারাই রাজপাত্র ও রাজমন্ত্রী হইল। তাহারাই মসিমুখে রাজ্যশাসন করিয়া রাজকর স্থির করিয়াছিল।

রামানন্দের জাতি নির্ণয়

রামানন্দ ঘোষ মসিজীবীর যেরূপ গৌরবজনক পরিচয় দিয়াছেন, অপর কেহই এরূপভাবে লিখিয়াছেন কি না, জানি না। তাঁহার পরিচয় হইতে মনে হয় যে, এরূপ মসিজীবীর বংশেই রামানন্দ ঘোষের জন্ম। রামানন্দ লিখিয়াছেন যে, "সূর্য্যকৃপায় মসিজীবিগণ উঠিয়াছিলেন"। তিনি মসিজীবিগণকে "বিপ্র ক্ষেত্রি শূদ্র বৈশ্য" এই চারি জাতির মধ্যে ধরেন নাই। বঙ্গের মসিজীবী কায়স্থগণও উক্ত চারি জাতি হইতে ভিন্ন চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে সূর্য্য হইতে যমের সঙ্গে চিত্রগুপ্তের উদ্ভব কথা বর্ণিত আছে[৫]। পুরাণে এবং যুক্তপ্রদেশ ও বেহারে চিত্রগুপ্ত হইতে ১২ শাখার কায়স্থের উৎপত্তি পাওয়া যায়। এই ১২ শাখার মধ্যে সূর্য্যধ্বজ একটি। এদেশে উত্তর-রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মতে সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ বংশের উৎপত্তি। পদ্মপুরাণে আছে, তাঁহার দেহে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে পরিচিত[৬]।

---

৫ "বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যাত্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ।
সৃষ্টৈর্যমাদিকং সর্ব্বং তপস্তেপে তু পদ্মজঃ॥"

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত গরুড়পুরাণ, ৬৭৬ পৃ)।

৬ "সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং তত্র প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাৎ ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ॥"

(বাচস্পত্যঅভিধান-ধৃত পদ্মপুরাণ)।

পঞ্চাননের উত্তর-রাঢ়ীয় কুলকারিকায় সূর্য্যধ্বজকে 'ঘোষবংশ-মহীপতিঃ' বলা হইয়াছে[৭]। তিব্বতের টেঙ্গুরগ্রন্থে 'সূর্য্যধ্বজ ঘোষ' উপাধিধারী কয়েকজন বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়[৮]। রামানন্দ ঘোষও ঘোষপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন[৯]। সূর্য্য বা সূর্য্যধ্বজ হইতে জন্ম-প্রবাদ হইতে, সূর্য্যের কৃপায় জন্ম এবং সূর্য্যধ্বজ ঘোষ-বংশে রাজা হইয়াছিলেন, এই প্রবাদ হইতে 'মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল'—এরূপ লিখিয়া থাকিবেন।

রামানন্দের আবির্ভাব-কাল

'নূতন রামায়ণের' শেষাংশে তাঁহার গ্রন্থ-রচনাকালের উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্তু শেষাংশ না থাকায় ঠিক্ কোন সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। তাঁহার গ্রন্থে হাম্বীরের উল্লেখ[১০] ও পুনঃ পুনঃ দারুব্রহ্মপ্রতিষ্ঠার কথা থাকায় মনে হয় যে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীরহাম্বীর এবং কালাপাহাড়ের হস্তে জগন্নাথের দারুমূর্ত্তিনিগ্রহের পর রামানন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বীরহাম্বীর ১৫৯৬ হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। তারিখ-ই-দাউদীর মতে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড়ের জীবলীলা শেষ হয়।

৭ "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতো বিভানু উপকর্ণকঃ।
হস্তাত্মজো সূর্য্যধ্বজো ঘোষবংশমহীপতিঃ॥"
(পঞ্চাননের কারিকা)।

৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯ "জগমাঝে ঘোষ ভাষা রসের সাগর।
সিন্ধু বিন্দু পান করি তর সাধু নর॥"
(আদিকাণ্ড, ২৫।১।৯)।

"ঘোষের বচন যেন অমৃতের ধার।
সাঁতারে অগাধ প্রেমে ভাগ্য থাকে যার॥
সুধাকল ঘোষপুত্র আনিয়া সংসারে।
রামচন্দ্র-লীলামৃতে ভব তরাবারে॥
দারুব্রহ্ম রাজা হয়্যা করিবা শ্রবণ।
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ॥"
(আদিকাণ্ড, ১৩৬।১।৫-৭)।

১০ "বলেতে হাম্বির হৈলা রূপেতে কন্দর্প।
প্রতাপেতে শিশু হৈল যেন কালসর্প॥"
(আদিকাণ্ড, ৫২।১।৬)।

কালাপাহাড়ের অত্যাচারে বাঙ্গালা ও উৎকলের হিন্দুমাত্রেই বিচলিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় কিরূপে দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া দারুব্রহ্ম জগন্নাথের উপর পড়িয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা ও উৎকলবাসী কাহারও অবিদিত ছিল না। উৎকলপতি মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া শত শত দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে করিতে কালাপাহাড় যখন জগন্নাথের মহামন্দিরে পৌছিল এবং দারুব্রহ্মকে বাহির করিবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইল, তখন সেবাইতগণ বহু চেষ্টা করিয়াও দারুব্রহ্মকে গোপন করিতে পারিল না।

কালাপাহাড় পারিকুদে আসিয়া দারুব্রহ্মকে বাহির করিয়া বরাবর গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেল। পরে স্তূপাকার কাষ্ঠ সাজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া তন্মধ্যে দারুব্রহ্ম জগন্নাথকে ফেলিয়া দিল। অবশেষে সেই দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড গঙ্গাস্রোতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই সময় জগন্নাথদেবের একজন প্রধান ভক্ত বেসর মহান্তি অতি গোপনে সেই দগ্ধ দেবমূর্ত্তি কুজঙ্গের এক খণ্ডাইত গৃহে আনিয়া রক্ষা করেন। রাজা রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে সেই পবিত্র মূর্ত্তি পুরীর শ্রীমন্দিরে আনীত হইয়াছিলেন।

কালাপাহাড়ের এই ভীষণ অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গ ও উৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য সকলেরই হৃদয়ে একটি জ্বালাময়ী আকাঙ্খা জাগিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সহায়-সম্পত্তির অভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কেহ সাহসী হয় নাই। যাহা হউক, পাঠানশাসনের তিরোধান এবং বাদশাহ আকবরের সাম্য-শাসননীতির গুণে কিছুদিন শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই সময়ে তিব্বতীয় পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হইলে ও তৎপরে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কতকটা আকবরের সুশাসন-নীতির অনুসরণের ফলে, বিশেষতঃ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান্ হিন্দুর সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করায় তাঁহাদের আধিপত্য-কালে তাঁহাদের অধিকার মধ্যে সেরূপ হিন্দুনিগ্রহ হইতে পারে নাই। এই সময় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম্মরক্ষায় বা ধর্ম্মাচার পালনে সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই অবাধ ধর্ম্মাচরণ কালেই ভোট-পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ (১৬০৮ হইতে ১৬৫৬ খ্রীঃ অঃ) রাঢ়, বঙ্গ ও উৎকলের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও শান্তিভাবে সকলকে ধর্ম্মাচার পালন করিতে দেখিয়াছিলেন। এই শান্তির সময়েই রামানন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ রাঢ় ও উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে প্রথম যৌবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি রাঢ় দেশের সর্ব্বত্র মল্লরাজ হাম্বীরের বীরত্ব-

বুদ্ধ রামানন্দের অভ্যুদয়কাল

সূচক 'বীর-হাম্বীর' খ্যাতি এবং কালাপাহাড়ের হস্তে দারুব্রহ্মের নির্য্যাতন শুনিয়া থাকিবেন বা দেখিয়া থাকিবেন। সেই সময়ের মুসলমানশাসন লক্ষ্য করিয়াই রামানন্দ ক্ষোভে লিখিয়াছেন,—

"ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে।
দাসীরূপা হইলা লক্ষ্মী নীচজাতি ঘরে॥
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার।
কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার॥
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ।
একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ॥

রামানন্দের অভিপ্রায়

"যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম।
দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম"॥

(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩২পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)।

উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, মুসলমান অধিকার হইতে কিরূপে দেশোদ্ধার করিবেন, সে দিকে রামানন্দের লক্ষ্য ছিল। স্বয়ং দেবী আদ্যাশক্তি কালী যেন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে রামানন্দ ঘোষের অভ্যুদয়। তিনি যেমন ঘোষ বা ঘোষ-পুত্র বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ আপনাকে 'দ্বিজ অংশে'[১১] শূদ্রকুল[১২] বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন।

---

১১ "রামানন্দ কহে শুন সংসারের লোক।
ঘুচাহ চিত্তের যত তাপ দুঃখ শোক॥
শক্তি হেতু দ্বিজ অংশে হইল প্রচার।
কলিযুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার॥"

(আদিকাণ্ড, ৭৭ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)।

১২ "শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।
বুদ্ধ বেশ ধরি এবে তত্ত্ব লিখে গেল"॥

(আদিকাণ্ড, ৮৪ পত্র)।

আলোচ্য পুথিমধ্যে লিপিকর-প্রমাদে কোথাও 'বোদ্ব' বা 'বোধব', কোথাও আবার 'বুদ্ধ' পাঠও পাওয়া যায়। এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতে মনে করিয়াছিলাম, রামানন্দ একজন বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন আদিকাণ্ডের শেষাংশে নিম্ন কবিতাগুলি পাঠ করি, তখন তাঁহাকে বুদ্ধ অবতাররূপে গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ রহিল না।

রামানন্দের বুদ্ধ অবতাররূপে নিজ পরিচয়

যথা,— "রামানন্দ কহে ক্ষোভে সদা মনে হয়।
বুঝিতে না পারি আমি আপন বিষয়॥
নীচউচ্চ কর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি।
নাহি পাই থাই আমি দুই দিগে হেরি॥
নীচেতে যেমন আমি উচ্চতে তেমন।
কি রঙ্গ কর্য্যাছে কালী না পাই কারণ॥
ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে।
... কর্ম্ম কেন চিত্তে ইচ্ছা করে॥
কালী জানে ইহার বিশেষ ব্যবধান।
মোর হাথে নাহি ইথে বিবেচনা জ্ঞান॥
বিবেচনা করিলে বিশেষ নাহি পাই।
যদি ভেদ মিলে তাহা মনে না পা ঠাঁই॥
বিশেষের দ্বারে অন্তে এই পাই সার।
আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার॥
জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে।
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥
ইহার অধিক কিছু কথা নাহি আর।
স্থিরচিত্তে আইল মোর এ সব বিচার॥
ঘোষপুত্র কহে আমি কিছু নাহি জানি।
যে করে আমার কর্ম্মে কালের কামিনী॥"

(আদিকাণ্ড, ১৪৪পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)।

ঘোষ-পুত্র রামানন্দ কিরূপে এরূপ অবতারবাদ লিখিলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানন্দ দারুব্রহ্ম-ভক্ত ছিলেন, তিনি উৎকলের প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-সমাজে ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছিলেন,—

"প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতারে। জ্ঞান বিস্তারি এ সংসারে ॥
বেদের ধর্ম্ম ছড়াইবে। নিগু'ণ ধর্ম্ম প্রচারিবে।
করণি ন করিবে পুনঃ। এহু এ মায়ার ধেয়ান ॥
পুন এমত সময়রে। সিদ্ধ অন্ন হেব ঘরে ঘরে।
সকল বর্ণ একঠারে। বসি ভুঞ্জিব সুগতরে ॥"

(জগন্নাথদাসের ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ)।

"বহুত বুদ্ধ অবতারে। হরি জন্মিলে এ সংসারে ॥
যজ্ঞধর্ম্ম নিন্দা কলে। ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রশংসিলে ॥
সকল ধর্ম্ম দূর করি। কর্ম্মর ফল অনুসরি ॥
অনেক কর্ম্ম ধর্ম্ম ফল। যজ্ঞ তপ ব্রত ফল ॥
যাগ তর্পণ আদি করি। এ সর্ব্ব এক তুলা ধরি ॥
ধর্ম্মতরু যে কলিযুগ। আউকে ব্রহ্মজ্ঞান এক ॥"

(চৈতন্যদাসের নিগু'ণ-মাহাত্ম্য)।

উৎকলের প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধগণ এইরূপে বহু বুদ্ধ অবতারের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে বুদ্ধ স্বয়ং শূন্যব্রহ্ম বই আর কিছু নহে। এমন কি, তাঁহারা দারুব্রহ্মকেও বুদ্ধ অবতার বলিয়া জানিতেন।

"নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার।
বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রীনীলকন্দর ॥" (সারলদাস)।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকলের ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দুরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধগণ স্বরূপ গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

"বোইলে অচ্যুত তুম্ভে শুন মোর বাণী।
কলিযুগে বুদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুণি ॥
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য।"

(শূন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায়)।

খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকলে যেরূপ বৌদ্ধগণ স্বরূপ গোপন করিয়াছিলেন,[১৩]

---

১৩ The Modern Buddhism and its followers in Orissa, 1911, p. 129.

বঙ্গদেশেও ১৪শ শতকের শেষভাগে ও ১৫শ শতকের প্রারম্ভে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কারক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত তর্কসংগ্রামে লিপ্ত হইতে দেখি[১৪]। বলা বাহুল্য, তখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে বৌদ্ধগণ বিদ্যমান ছিলেন। উদয়নাচার্য্যের হস্তে বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয় ও কিছুদিনের জন্য হিন্দুরাজশাসন বিস্তারের সহিত বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল ও বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ গুপ্ত হইয়াছিলেন। অল্পদিন পরেই সর্ব্বত্র পাঠান রাজত্ব বিস্তৃত হইলেও সমস্ত বাঙ্গালার সামাজিক শাসনকর্ত্তৃত্ব হিন্দুর হস্তেই ন্যস্ত ছিল, উত্তরবঙ্গে রাজা বিষ্ণু দত্তের বংশ, পশ্চিমবঙ্গে মল্লরাজবংশ ও সুদূর ভাগলপুর অঞ্চলে মহাশয় থাকদত্ত-বংশ এবং সরকার সপ্তগ্রামে দাস ও কেশদত্ত-বংশ সমাজে একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন[১৫]। তাঁহারা সকলেই দেব-বিপ্র-ভক্ত ছিলেন, সে সময় ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার সাধারণের ক্ষমতা ছিল না। এ সময় রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র ইতর সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ও ধর্ম্মমঙ্গল গান বিশেষভাবে প্রচলিত থাকিলেও তন্মধ্য হইতে দেবব্রাহ্মণবিরোধী ভাব এককালেই বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তাহাতে ধর্ম্মপূজক ধর্ম্মপণ্ডিতগণ যে সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধ, তাহা বুঝিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না। সুতরাং ধর্ম্মপূজার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার থাকিলেও সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধনাম গৌড়বঙ্গ সমাজ হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল।

রামানন্দের পূর্ব্বে বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজের গোপন কথা

গৌড়বঙ্গে আকবর বাদ্‌শাহের অধিকার বিস্তার, ইলাহী ধর্ম্মপ্রচার এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য—এই আদেশ প্রচারিত হওয়ায় গৌড়বঙ্গের আপামর সাধারণ আবার নির্ভীক হৃদয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুনরভ্যুদয় লক্ষ্য করি। এই সময়ে সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধগণ আবার প্রকাশ্য-ভাবে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক পূজা-পদ্ধতি ও ধর্ম্মমত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে, আবার নানাস্থানে বৌদ্ধ মঠ বা বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার কিছুদিন পরে ভোট-পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ এদেশে আসিয়া তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সেই শান্তির সময়ে রামানন্দ ঘোষের জন্ম হয়। গৌড়বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ এক সময়ে অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য চান্দুদাসের কারিকার টীকায় লিখিত আছে,—"কায়স্থদের

খ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে বঙ্গের বৌদ্ধ সমাজ

১৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

১৫ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থ-কাণ্ড, ৫ম অংশ (উত্তররাঢ়ীয় কাণ্ডের ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য)।

ইষ্টদেবতা বুদ্ধ।" পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ সকলেই বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপ্রতিপালক ছিলেন ; তাঁহারা উচ্চ অঙ্গের বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, তাহারও পরিচয় রহিয়াছে[১৩]। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, "১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন।" এইরূপ বৌদ্ধ কায়স্থবংশে যে রামানন্দ ঘোষের জন্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ৫০০ হইতে বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে পাইত না।" রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন,—

"সূর্য্যকৃপা হৈতে উঠে মসিজীবিগণে ॥
রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তারা সব হৈল।
মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষবংশে প্রবুদ্ধ ঘোষ নামে এক বীরপুরুষ বা প্রধান ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণখণ্ডে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধাচারসম্পন্ন থাকায় সমাজে অনেকেই হীন ছিলেন। সমাজসংস্কার-কালে এই বংশীয় সকলেই যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা পূর্ব্বস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন, কুলীন সমাজ বরাবর তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আদান-প্রদান করিতে কিছুতেই রাজী হইতেন না। জলসুতি, আলুগ্রাম, জাঙ্গালিয়া, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বংশধর বাস করিতেন। সম্ভবতঃ বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারের ন্যায় এই বংশের কোন কোন জমিদার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর উৎসাহদাতা ছিলেন। এইরূপ কোন ঘোষ-জমিদার-বংশে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধশ্রমণদিগের ন্যায় তিনি প্রথমতঃ কাব্য, অলঙ্কার ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার রামায়ণ হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে দুই একটি প্রমাণ দিতেছি,—

রামানন্দের জ্যোতিষে জ্ঞান

১। "সিতপক্ষ নবমী পুষ্যাতে উপযোগ।
বৃহস্পতি লগ্নে ক্ষেত্রি মাহেন্দ্র সংযোগ ॥
লগ্নে চন্দ্রে চতুর্থ স্থানেতে ভূমিসুতে।
শশিসুত তৃতীয় কেন্দ্রীয় রাহু তাতে ॥

১৩ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "সভাপতির অভিভাষণ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ সাল, ২০ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠমেতে রবিসুত তৃতীয়ে ভাস্কর।
পঞ্চম স্থানেতে কেতু অধ দুই কর॥
শুক্রাচার্য্য সপ্তমে লগ্নেতে উদয়।
নবগ্রহ তুঙ্গী কেতু ক্রমভঙ্গ নয়॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন।
কৌশল্যা রাণীর গর্ভে প্রসববেদন॥"
(আদিকাণ্ড, ১১১ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা)।

২। "পঞ্চমী উত্তম দিন শুনহ রাজন।
সুচন্দ্র সুতারা শুভযোগ বিলক্ষণ॥
একাদশ স্থানেতে আছেন বৃহস্পতি।
তৃতীয় স্থানেতে শনি শুন নরপতি॥
কর্ম্মস্থানে শুক্রাচার্য্য বৈরিস্থানে রাহু।
আপদ স্থানেতে কেতু ঊর্দ্ধ করি বাহু॥
তেজ স্থানে দিবাকর বুধ ধনস্থানে।
রাজ্যস্থানে ভূমিপুত্র শুনহ রাজনে॥
লগ্নেতে আছেন চন্দ্র কহিনু তোমায়।
হেন দিন মিলে রাজা বহু ভাগ্যোদয়॥"
(আদিকাণ্ড, ১১৩ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)।

৩। "উভয় আচার্য্য তবে কহিল বচন।
শুক্লপক্ষ দশমীর দিবস উত্তম॥
দশ দণ্ড নিশি অন্তে লগ্ন শুভক্ষণ।
ক্রমভঙ্গ কিছু নাহি গ্রহ তারাগণ॥
রবিচক্রে সোম লগ্নে চতুর্থ মঙ্গল।
পঞ্চমেতে বুধগ্রহ সর্ব্বত্রে কুশল॥
যোগচক্রে বৃহস্পতি ষষ্ঠমেতে বৈসে।
শুক্রাচার্য্য তৃতীয়তে কহি সভাপাশে॥
অষ্টমেতে শনিগ্রহ দশমেতে কেতু।
একাদশে তুঙ্গী হয়্যা রাহুগুণসেতু॥

নক্ষত্রেতে রোহিণী লগ্নেতে রাশি তার।
হেন লগ্ন সংযোগ হইবা লোকে ভার॥
ফাল্গুনের ত্রয়োদশ দিবসের নিশি।
চন্দ্রকোলে রোহিণী নক্ষত্র আছে বসি॥
এই লগ্ন অতি ভাল বিবাহের দিন।
ইহার নিকটে লগ্ন ভাবাংশে মলিন॥"

(আদি, ১৬৬।২।৯-১১ হইতে ১৬৭।১।১-৩)।

৪। "দৈবযোগে রাজা তবে পীড়া কৈল শনি।
বৃষরাশি নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী॥
রোহিণী বৃষেতে যদি শনি পীড়া কৈল।"

(কিষ্কিন্ধ্যা, ২৮ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা)।

তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কারে কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থের ভাষা, ভাব, লালিত্য ও রচনা-পারিপাট্যে বহু স্থানেই সুস্পষ্ট হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজ পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও তেজস্বিতার গুণে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজ শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। অবস্থার সঙ্গে বহু লোক তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকায় তিনি 'বুদ্ধ অবতার' বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

কেন তিনি বুদ্ধরূপে পরিচিত হইলেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—

রামানন্দের বুদ্ধ হইবার কারণ

"রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বুদ্ধ ভাষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখশোক॥
সর্ব্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার॥
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা অবনী॥"

(আদিকাণ্ড, ৮৫ পত্র, ১ম পৃ)।

আবার গ্রন্থের ভণিতাতেও বুদ্ধদেবের উক্তিই পাওয়া যায়, এরূপ উক্তি লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেই বেশী,—

(ক) "বুদ্ধদেব কহে আমি নিবেদি তোমায়।
ভাবিতেছি চিত্তে যাতা করি কিবা হয়॥

জরা দেহ আমার হৈল দিনে দিনে।
বিনা যত্নে এ সঙ্কট মোরে দিলে কেনে॥"
(লঙ্কাকাণ্ড, ৯ পত্র, ১ম পৃ)।

(খ) "বুদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিল সংসারে।
লয়্যা যাউক মহাকালী ভৈরবনগরে॥
কৃপা করি মোরে দেহ মোর পূর্ব্বধাম।
নরদেহে নানা দুঃখে কণ্ঠাগত প্রাণ॥"
(লঙ্কাকাণ্ড, ৭ পত্র, ২ পৃ)।

(গ) "বুদ্ধ কহে কালি রহিবারে নারি।
স্বধাম আমারে দান দেহ শীঘ্র করি॥
দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ॥
সৎকার্য্যে বিকার্য্য হৈল করি নিবেদন।
করিতে না পারি আর ভৌতিক সেবন॥"
(লঙ্কাকাণ্ড, ৭ পত্র, ২ পৃ)।

রামানন্দের বার্দ্ধক্যের পরিচয়

উদ্ধৃত কবিতা হইতে মনে হয়, লঙ্কাকাণ্ড রচনাকালে রামানন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল নিকট, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ সময় তিনি 'বুদ্ধ' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়াই নিজ 'বুদ্ধ' নামেই ভণিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ডে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দারুব্রহ্মকে রাজা করিয়া তাঁহার সমক্ষে গান করিবার জন্য এই নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, আবার তিনিই লঙ্কাকাণ্ডে দারুব্রহ্মের উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন,—"বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল। বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।"—ইহাতে মনে হয়, বুদ্ধরূপে ভণিতা প্রকাশকালে তিনি বিগ্রহ বা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী হইয়াছিলেন।

এ সময় যে তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছিল, দন্ত বা কেশ গিয়াছিল, অস্থিচর্ম্ম-অবশেষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

"রামানন্দ কহে এই অসম্ভব কথা।
বনচর পশুসঙ্গে প্রভু কৈল মিতা॥

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর।
না হইল…চর্ম্ম চক্ষের গোচর॥
ধনিতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল।
নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল॥
এই দেহ দিনে দিনে হয়্যা গেল জরা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রাণে হইলাম সারা॥
ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানি।
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী॥
যবন হইতে মেলে দুই রাজ্যেশ্বর।
বৃথা কাষ্ঠ সেবি মোর টুটিল পাঁজর॥
দন্ত অস্ত কেশ বেশ করাছে পয়ান।
দূরের মনুষ্য নাহি দেখি যে নয়ান॥
শেষকালে কষ্ট পাইব নিজ কর্ম্মপাকে।
মোর অন্তে সেবা যায়্যা হাস্য হবে লোকে॥
দারা ছাড়ি পাপ ভরা ভরিনু অপার।
অস্থিচর্ম্মসার কৈলা অভিশাপ তার॥
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই॥
কাল হৈল কণ্টক কল্পনা রৈল মনে।
না পূরিল চিত্তআশা কব কোন্ জনে॥
পঞ্চশক্তি প্রাণপণে করিয়া স্মরণ।
হয় নয় কার্য্যসিদ্ধ জানিব কারণ॥
ধর্ম্মসাক্ষী করি তবে সংসার ছাড়িব।
কতদূর কিবা হয় সাক্ষাৎ দেখিব॥
সময় নাহিক আর কার্য্য কেনে জরা।
পঞ্চশক্তি কপটে হইনু আমি সারা॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১২ পত্র, ১পৃ)।

উক্ত কবিতায় তিনি একটি বিশেষ কথা লিখিয়াছেন,—"যবন হইতে মেলে দুই রাজ্যেশ্বর" অর্থাৎ তাঁহার দীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে তিনি দুইজন যবনসম্রাট্‌কে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে

মনে হয় যে, তৎকালে শাহজাহান্ জীবিত ছিলেন ও অরঙ্গজেবের অত্যাচারও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ প্রাচ্য ভারতে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে রামানন্দ বুদ্ধরূপে প্রথিত হন নাই। তাহা হইলে ভোটপরিব্রাজক এ কথা লিখিতে বিরত হইতেন না।

রামানন্দের সময় দুই জন মুসলমান সম্রাট্

মনে হয়, তাঁহার অব্যবহিত পরে, প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ বুদ্ধরূপে আপনাকে প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। এসময় তাঁহার বয়স ৭০।৭৫ বর্ষ হওয়াই সম্ভব। রামানন্দ এ সময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংস্রব ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগে কাতর হইয়াছিলেন,—

"রামানন্দ কহে ভাই কি কহিব আর।
বিয়োগে বিয়োগে সদা দেখি অন্ধকার॥
সদা উৎকণ্ঠিত থাকে বিয়োগীর মন।
বিধি নিধি নাহি দিলে পায় কোন জন॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫পত্র, ১পৃ)।

করুণায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—

করুণা

"রামানন্দ কহে লীলা অগম্যের পার।
সেই বুঝে সে করুণার ভাবাবেশ যার॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২২পত্র, ২পৃ)।

তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, দুই মাস পরেই তিনি মহৈশ্বর্য্য লাভ করিবেন,—

মহৈশ্বর্য্য

"বিলাসে বিপদ্ হয় কিসের কারণ।
সম্পদ সময় কেন সংশয় জীবন॥
মহৈশ্বর্য্য বাকী আছে দুই মাস কাল।
কিছু চারা নাহি দেখি এবা কি জঞ্জাল॥"

(আদিকাণ্ড, ১৪৯পত্র, ২পৃ)।

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, কিঞ্চিদধিক আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়দেশে রামানন্দ ঘোষ 'বুদ্ধদেব'রূপে তাঁহার ভক্ত-সমাজে প্রথিত হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

রামানন্দের আবির্ভাব-কাল

বুদ্ধদেবরূপে তিনি রামায়ণ লিখিতে গেলেন কেন?—

রামায়ণ রচনার কারণ

"রামানন্দ লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায়া।
"উঠাইমু প্রভুর গুণ চিত্ত মজাইয়া॥"

(আদিকাণ্ড, ১৭৬ পত্র, ২পৃ)।

হনুমানের প্রতি তাঁহার এত ভক্তির কারণ কি ?

হনুমান্ সম্বন্ধে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"ছন্দরূপী যারে তুমি দেখহ বানর।
পরাৎপর মূর্ত্তি তিঁহো সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥"

(কিষ্কিন্ধ্যা, ২৬পত্র, ২পৃ)।

"মহারুদ্র হনুমান্ এ লীলার সার।"

(লঙ্কাকাণ্ড, ১০পত্র, ১পৃ)।

ধর্ম্মপূজক রামাই পণ্ডিত হইতে এই সম্প্রদায়ের সকলেই হনুমানের ভক্ত। শূন্যপুরাণে হনুমান্ ধর্ম্মঠাকুরের প্রধান সেবাইত ও ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান দ্বাররক্ষক।

কেবল হনুমানের আদেশ বলিয়া নহে, তিনি রামচন্দ্রকে ও দারুব্রহ্মকে অভিন্ন মনে করিতেন,—

"মিথ্যা কভু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর।
দারুরূপী রাজা রাম ভুবন ভিতর।"

(আদিকাণ্ড, ৩১ পত্র, ২পৃ)।

এ কারণে তিনি রামচন্দ্রের চরিত্র-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্রই বৌদ্ধভাব বা নির্ব্বাণের কথা ঘোষণা করিয়াছেন,—

নির্ব্বাণ

"ঈশ্বর আরাধি রাজা জ্ঞানপ্রাপ্তি হৈয়া।
হইলা নির্ব্বাণ মুক্তি যোগেরে সাধিয়া॥"

(আদিকাণ্ড, ১৩পত্র, ১পৃ)।

"যোগবলে হরিপদে মন মজাইল।
দুইদণ্ড ভজনেতে নির্ব্বাণ পাইল॥"

(আদিকাণ্ড, ২৭ পত্র, ১পৃ)।

"জীবন ত্যজিলা রাজা ঈশ্বর ভাবিয়া।
হইল নির্ব্বাণ মুক্তি হরি আরাধিয়া॥" (আদিকাণ্ড, ২৮ পত্র, ১পৃ)।

নির্ব্বাণ মুক্তির বার বার উল্লেখ থাকিলেও হরি আরাধনার কথা থাকায় রামানন্দকে অনেকে বৈষ্ণব মনে করিতে পারেন, কিন্তু রামানন্দ তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য লিখিয়াছেন,—

রামানন্দের ধর্ম্মমত

"মুনি কৈলা রাজা হে সংসার কিছু নয়।
জগতে দুর্ল্লভ হয় ঈশ্বর আশ্রয়॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন রূপে হরি।
একতা হইলে ভজে তিনে এক করি॥
তবে সেই কৃষ্ণ তারে হন ফলবান্।
এক কৃষ্ণ ভজনে নিষ্ফল হয় কাম॥
সাধু গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ ভজন না হয়।
স্থল বিনে জল কভু না পায় আশ্রয়॥

* * *

এই ভক্তি ভক্তিমত কহি যে তোমায়।
ভুক্ত মুক্ত বৈরাগ্য তা হৈলে প্রেম কয়॥
ত্যক্ত বৈরাগ্যতা হয় সর্ব্বসারাৎসার।
বিষয়ীর নহে তাহা দড় রাখা ভার॥
গুরু বৈষ্ণবের যেই না করে পর্শন।
ত্যক্ত দ্রব্য প্রায় পুণ্য না করে গ্রহণ॥
মননেতে সেবা করে এক কৃষ্ণ তরে।
বাহ্য ভাব কদাচিৎ প্রকাশ না করে॥
গুরু সাধু মন্ত্রে সেই তৃণতুল্য গণে।
সঙ্গ থাক ফিরি নাহি চাহে স্বর্গপানে॥
সঙ্গ কৈলে ভজনেতে ক্রমভঙ্গ হয়।
অতএব সিদ্ধ ভক্ত সঙ্গ না করয়॥"

(আদিকাণ্ড, ৬২ পত্র, ২পৃ)।

উদ্ধৃত উক্তি হইতে মহাযান ধর্ম্মের ত্রিরত্নপূজা ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভের আভাস পাওয়া যায়। রামানন্দের পূর্ব্বে বৈষ্ণব নামে পরিচিত উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রামানন্দ যেন তাহারই ঘোষণা করিয়াছেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন,—

"জীব আত্মা রাধে বলি পরম মুরারি।"

(অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতা, ২য় অঃ)[১৭]

১৭ The Modern Buddhism and its followers in Orissa, p 50.

"একাঙ্গ ব্রহ্মরূপ হোই। রাধিকা সঙ্গে ভাবগ্রাহী ॥
গোলোক নিত্য এহা কহি। শূন্য দেউল এ বোলাই ॥"
(জগন্নাথদাসের তুলাভিনা)[১৭]

"পরম আত্মাটি মহাশূন্য বলি ভাব ॥
এহিটি অরূপানন্দ নাম তত্ত্ব ঠুল।
উদ্ভব সংগ্রহ করে রাধাপ্রেম ভোল ॥"
(শূন্যসংহিতা, ২২ অঃ)

উৎকলের সুবৃহৎ গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত-রচয়িতা মহাকবি জগন্নাথ দাসও স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—শাস্ত্রে বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি যে সকল মহাতীর্থের উল্লেখ আছে, সে সমস্তই 'মহাশূন্য'।

"কৃষ্ণর ক্রীড়ারস এহি। গুপত বৃন্দাবন কহি।
মথুরাপুর মহাশূন্য। গোপনগর সেহু জান ॥"
(তুলাভিনা, ৯ অঃ)।

রামানন্দ উৎকল কবিগণেরই যেন অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষত্ব—দেবপূজা ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব—গুরুপূজা।[১৮] রামানন্দ গুরুপূজাই সমর্থন করিয়াছেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে

উৎকলের বৌদ্ধ ভক্তগণের ন্যায় রামানন্দ নিজ জীবাত্মাকে নারীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রামানন্দ কহে বাড়াইলে বাড়ি যায়।
তরঙ্গ উঠিলে তাহা থামা বড় দায় ॥
আমি অভাগিয়া এত কষ্টে নৌকা পায়া।
সংসার ছাড়িয়াছি তাহারে ভজিয়া ॥
জীয়ন্ত স্বামীতে বৈধব্যপ্রায় হয়্যা।
কঠিনতা গুণে কেহ না চায় ফিরিয়া ॥

১৮ "Ask a Nepalese Buddhist how many religions are there in the world, and he will answer—'there are two religions Gubhaju and Devabhaju' i.e. the worship of the Gurus and the Devas. The Buddhists are Gubhaju for they worship their great Guru Buddha and the Brahmins are Devabhaju for they worship Devas"—Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri's Introduction to Modern Buddhism, etc., p. 24.

কঠিন যে জন তার ভাব রাখা ভার।
কণ্ঠাগত কলেবর হয়্যাছে আমার॥
অচল অথর্ব্ব স্বামী না বলে না চলে।
নীরব সতত কোন বাক্য নাহি বলে॥
প্রাণপণ কৈলে কিছু বাক্য নাহি কয়।
ভাল মন্দ জ্ঞান কিছু নাহিক বিষয়॥
নারী হয়্যা দারিবেশে ভ্রমিয়া বিকল।
নিতি নাহি গৃহবাসে কড়ার সম্বল॥
আপনি উদ্যোগ করি আনি দিবে বাতি।
নারীর উদ্যোগে ঘরে বসি খায় পতি॥
সন্ধ্যাতে রাত্রিতে দিনে তাহাতে সন্তোষ।
শাকান্ন বা মিষ্টান্ন বা সমান পরিতোষ॥
গৃহাশ্রমী হয়্যা মোর ঘট্যাছে জঞ্জাল।
নারী হয়্যা স্বামীকে পোষিব কত কাল॥
কত লোক আইসে তার সম্বন্ধ ঘটায়্যা।
তত্ত্ব লইতে হয় মোরে আপনা বেচিয়া॥
স্ত্রীলোকের সুখ কহে স্বামীর সন্তোষ।
মোর ভাগ্যে এ দেহেতে না হইল সংযোগ॥
রামানন্দ কহে এই ভাবি দিবারাতি।
হায় আমি কি গুণ দেখিয়া কৈনু রতি॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৬ পত্র, ১পৃ)।

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

সিদ্ধ সাধক সম্বন্ধে

"ঘোষ কহে কেবা বড় তপস্যার পর।
সিদ্ধ সাধকেতে হয় বহু পাঠান্তর॥
কুকর্ম্ম যাজন করি চলিয়ে কুপথ।
সাধ্য সিদ্ধ গুণে পুরি সর্ব্ব মনোরথ॥
নারী হয়্যা দারি পথ করিয়া যাজন।
ধর্ম্ম নিতে ত্রাণ করি অখিলের জন॥"

(আদিকাণ্ড, ৪২ পত্র, ১ পৃ)।

রামানন্দ সিদ্ধাসিদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"নিগমের গম্য করা অসিদ্ধের নয়।
সিদ্ধাসিদ্ধ দুই বস্তু মোরে নাহি ভায়॥
পক্কাপক্ক মোরে দুই বস্তু পরতেক।
ভাবকের ভাব তাহে বিশেষ অনেক॥
মোর ভাব ব্যাখ্যাদণ্ড না দেখিলে মরি।
ধেয়ানে ধরিয়া মূর্ত্তি প্রাণ রক্ষা করি॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২৪ পত্র, ২পৃ)।

আবার নিজের সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—

"রামানন্দ কহে ভবে আসি সিদ্ধ দেহ পায়্যা।
কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়া॥"

(আদিকাণ্ড, ১১৬পত্র, ১পৃ)।

পরে আবার বলিয়াছেন,—

রামানন্দের মহাকালী

"ভাবিয়া চিত্তেতে কিছু না হয় অন্তরে।
দেখি দেখি মহাকালী কত দূর করে॥
আইলাম সংসারেতে কালী আজ্ঞা লয়্যা।
রহিলাম ঢাকা অগ্নি ভস্মে আচ্ছাদিয়া॥
কালরূপা কামিনীর না পাইনু মন।
কি হয় ভাবিয়া কাল করিনু যাপন॥
আজি কালি মৃত্যু কাল আইল ক্রমে ক্রমে।
কবে আর কি বা করি বৃথা পাই ভ্রমে॥
কালী বইনা হবে লবে পশ্চাতে জানিবে।
যে হউক তোমার কীর্ত্তি সংসার ঢাকিবে॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৫ পত্র, ১পৃ)।

রামানন্দ মহাকালী বলিয়া নহে, পঞ্চশক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি আদিকাণ্ডে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

পঞ্চশক্তি

"রামানন্দ কহে যার ধর্ম্মনিষ্ঠা হয়।
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম্ম না ছাড়য়॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম মোর মহাকালী-আজ্ঞাদান।
কৃপা করি বিশ্বেশ্বরী করে বলবান্॥
কালী বাম হলে আর কুল নাহি পাই।
কালী কৃপা হইলে নিগম গম্য পাই॥
ডঙ্কা দিয়া জগমাঝে কালী যদি করে।
কালা হয়্যা প্রকাশিব ভুবন ভিতরে॥
বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হইতে দূর করি দিব॥
রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥
দান যশ পৌরষের সীমা করি যাব।
এই ঘটে আর অন্ত মূর্ত্তি প্রকাশিব॥
যজ্ঞাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে॥
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম।
দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম॥
অল্পাক্ষরে ভাব লয়্যা রামানন্দ ভণে।
মহাকালী পাদপদ্মে বেচি নিজ প্রাণে॥"

(আদিকাণ্ড, ১৩৪ পত্র, ২পৃ হইতে ১৩৫ পত্র ১পৃ)।

ইহার পূর্ব্বেও রামানন্দ বলিয়াছেন,—

"বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে।
পঞ্চশক্তি ঈঙ্গিত বারণ কবে করে॥
হেলায় তরাব পশু পতঙ্গ পামর।
কালী জপি কাল হয়্যা ভুবন ভিতর॥"

(আদিকাণ্ড, ৯৮ পত্র, ২পৃ)।

আবার পঞ্চশক্তির একাঙ্গ হইবার কথাও পাওয়া যায়,—

"রামানন্দ কহে যাহা চিত্তে মোর ছিল।
দূরস্থ দেখিয়া তারে চিন্তে প্রাণ গেল॥
শরীরের ক্রমভঙ্গ দেখি লাগে ভয়।
এই দেহে তাহা দেখা হয় কিনা হয়॥
পঞ্চশক্তি মিলি কৈলা একাঙ্গ হইয়া।
তাহার অধিক যাবে জোর ডঙ্কা দিয়া॥"

(অরণ্যকাণ্ড, ৯ পত্র, ২পৃ)।

"পঞ্চশক্তি মসিমুখে আজ্ঞা কৈল বাণী।
আছয়ে মঙ্গল পিছে নাহি টল তুমি॥
সে বাক্য আমার চিত্তে না জন্মে প্রত্যয়।
যত আশা করি তাহা বিপরীত হয়॥
কালী বৈলা নাহি ছাড় চিত্তের নিতান্ত।
রামানন্দ কহে সভে ভাল আমি ভ্রান্ত॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২৫ পত্র, ১ পৃ)।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাযান বৌদ্ধগণ কালীপূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাযানের মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রচারের সহিত অনেকেই শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামানন্দ সেইরূপ বৌদ্ধশাক্ত ছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধকে যেমন পঞ্চ বিষ্ণুরূপে প্রচার করিয়াছিলেন,[১৯] সেইরূপ শাক্ত রামানন্দ পঞ্চশক্তির প্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন। রাধা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, এই পঞ্চশক্তি, নামে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মস্বরূপিণী, একাঙ্গ হইয়াই তাঁহাকে দয়া করিয়াছিলেন। এই পঞ্চশক্তির অন্যতমা গঙ্গা সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মময়ী গঙ্গা

"দুরারাধ্য গঙ্গা বড় শুনহ রাজন্॥
শাস্ত্রবিজ্ঞ জনেতে প্রণাম করে বেদ।
স্বয়ং ব্রহ্ম না জানে সে ব্রহ্মময়ী ভেদ॥
গুণময়ী নন গঙ্গা গুণাংশে বিজয়ী।
সগুণ বিগুণ সেই পরাৎপরময়ী॥

---

১৯ Vide the Modern Buddhism and its followers, pp. 91—99.

সিদ্ধ সাধ্য শক্তিকে বিমুক্ত যার বারি।
কোথা তত্ত্ব পাবে তার আরাধনা করি॥
সাধারণ বিগুণ নির্গুণ সেই বারি।
নহে সে পুরুষ বাছা নহে সেই নারী॥
নিয়ম নাহিক পুত্র কোথা তার ধাম।
জগতে ব্যাপক গঙ্গা জগতে নির্ণাম॥
গঙ্গা ব্রহ্মনারায়ণ প্রণব তাহার।
বহু ভাগ্যে উপজীবে ভেদ জানা তার॥
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা মুখ্যগুণা কয়।
স্বয়ং বিষ্ণু সেই গঙ্গা কহি যে তোমায়॥
বিষ্ণু হৈতে ব্রহ্মময়ী বহুগুণ ধরে।
ইচ্ছাময়ী হন গঙ্গা বিষ্ণুর শরীরে॥
ইচ্ছা যার কর্ম্মকর্ত্তা হয় সেই জন।
বিনা ইচ্ছা নহে কোন কর্ম্মের সাধন॥
জীবঘটে শিব গঙ্গা ব্রহ্মঘটে প্রাণ।
বিনা গঙ্গা অখিল জীবের নাহি ত্রাণ॥
রামানন্দ কহে কি জানিবে নরজন।
বেদেতে অবিজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর কারণ॥"

(আদিকাণ্ড, ৫৩ পত্র, ২ পৃষ্ঠা হইতে ৫৪ পত্র, ১পৃ)।

সুতরাং রামানন্দের পঞ্চশক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তি বই আর কিছুই নহে। শাক্যবুদ্ধের ন্যায় নবীন বুদ্ধ রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন,—

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে

"ভোজবিদ্যাপ্রায় এই শরীর ধারণ।
নিমিষেতে জন্ম হয়, নিমিষে পতন॥
সর্ব্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরীর।
দেখি শুনি ইহা কেবা হইয়াছে স্থির॥
অন্তরীক্ষে চলে রথ বায়ু সঙ্গে গতি।
নিমিষ করিলে ত্যাগ পবন সারথি॥

সুষুপ্ত হইয়া রথ ভূমে পড়ি রয়।
বায়ু যাতায়াত নিজ হস্ত বশ নয়॥
সকল অনিত্য মরে মোর মোর করি।
মধ্যপথে মোট রাখি পালায় যে গাড়ী॥
হাটে আসি কেহ করে লক্ষের ব্যাপার।
লাভে মূলে হারা হয় কোন কুলাঙ্গার॥
গাঁঠেতে বন্ধন রত্ন ঘোরে অনন্তরে।
না ডুবায় চিত্ত কেহ প্রেমের পাথারে॥

*　　*　　*

এই যে শরীর দেখ জলবিম্বপ্রায়।
জলেতে উপজি বিম্ব জলেতে মিশায়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত।
ভব-ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লক্ষাজিত॥"

(আদিকাণ্ড, ২য় পত্র)।

মহাযান বৌদ্ধগণ গীতাকে তাঁহাদের এক প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন রামানন্দও সেই গীতার ভাবে যেন বলিতেছেন,—

গীতাতত্ত্ব

"কালপ্রাপ্তি বিনে কেহ অকালে না মরে।
মৃত্যুতে যায়াছে মিতা জগৎ সংসারে॥
যার মৃত্যু তারি জন্ম হয় আরবার।
বিষম আমার মায়া সভাকার পর॥
মোর এই কর্ম্ম তুমি না হও কাতর।
মারিয়া রেখেছি আমি বালি রাজা তার॥
নিমিত্ত কেবল তুমি কহিনু তোমারে।
কর্ম্মকর্ত্তা আমি জীব কর্ম্মভোগ করে॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১ পত্র, ১ পৃ)।

"জন্ম মৃত্যু দুই বস্তু একত্রে বন্ধন।
চিরস্থায়ী নহে প্রভু জীবন মরণ॥

রক্ষাকারী এ দেহের পরমাত্মা আপনি।
সেই আত্মারাম প্রভু বুঝিলাম আমি॥
পরমাত্মাতে করে যদি জীবাত্মা সংহার।
দিবা হয়্যা করহ রক্ষা কে করে তাহার॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১৫ পত্র, ১ম পৃ)।

পরমাত্মা ও জীব সম্বন্ধে রামানন্দ ঘোষ বলিতেছেন,—

জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধে

"শিশু কহে তুমি সভ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়্যা।
কুতন্ত্র ঘটাও লোকে মায়া ফাঁসি দিয়া॥
কোথা কার মাতাপিতা কোথা কার রাণী।
নানা যোনি ফিরি নিজ কর্ম্মভোগী আমি॥
যে যোনিতে জন্ম নিজ কর্ম্মযোগে হয়।
যবে যথা জন্মি সেই মাতাপিতা হয়॥
নিজ নিজ কর্ম্মভোগে লোকের ভ্রমণ।
কেবা কার মাতাপিতা করি নিবেদন॥
মাতাপিতাদত্ত দ্রব্য যাই নাই লয়্যা।
গিয়াছি দুহার দ্রব্য দুহা তরে দিয়া॥
মোর যথা কর্ম্মসূত্র তথা যাব আমি।
কর্ম্মসূত্র মোর প্রভু জনকজননী॥
কত কোটি বার পিতা আমার তনয়।
সম্বন্ধ নিয়মে লোকের সর্ব্বনাশ হয়॥
নিঃসম্বন্ধী যে জন ঈশ্বর বলি তার।
বিকার মরিয়া গেলে ঈশ্বর সে পায়॥
ফাঁপরে পড়িয়া জীব দেখে অন্ধকার।
মাতাপিতা ভাইবন্ধু মনের বিকার॥
নাহি রহে ইহা হৈলে জ্ঞানের উদয়।
যদবধি অজ্ঞানতা আমি মোর কয়॥
মায়া বেড়ি যদবধি জীবের চরণে।
সম্বন্ধ ঘটাইয়া মারে কর্ম্মসূত্র ক্রমে॥"

(অরণ্যকাণ্ড, ২০ পত্র)।

রামানন্দ নিজের ইষ্ট শক্তিকে নিজের অবস্থা জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—

অনুরাগ ও বিরাগ

"রামানন্দ কহে কালী দাগ লাগি মনে।
জগ অন্ধকারময় দেখি যে নয়নে॥
নিকা কাপড়েতে কালি দাগ লাগি গেল।
শতধৌত কৈনু কালি দাগ না ঘুচিল॥
অনুরাগ ভিন্ন দাগ শোভা নাহি করে।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেন মূর্খের বাজারে॥
বাঁকা অঙ্গ কালা কভু সোজা নাহি হয়।
কালা অঙ্গ কালি হয়্যা মনঘটে রয়॥
স্বরূপ বিরূপ বুঝা যাবে কার্য্যদ্বারে।
বিরাগের ফলশ্রুতি রাগ যেন ধরে॥"

(আদিকাণ্ড, ১৩৮ পত্র, ১পৃ)।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামানন্দ খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

রামানন্দের সংসার সম্বন্ধে

"দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই॥" (১২ পত্র, ১পৃ)।

কিন্তু আবার অরণ্যকাণ্ডের ভণিতায় জানাইয়াছেন,—

"রামানন্দ কহে আমি ভাবি এ পশ্চাৎ।
দেহ অন্তে কারে দিয়া যাব রঘুনাথ॥
যে আছে শ্রীপাটে কেহ সেবাযোগ্য নয়।
কপটী ভাবটী হইতে ইচ্ছা নাহি হয়॥
যদা যার দৃষ্টি থাকে স্ত্রী-পুত্রের তরে।
ঈশ্বরের সেবাযোগ্য সে কি হইতে পারে॥
লুকাইবে ফণীর ফণা নিচেদিগে ভার।
নিরর্থক যত শ্রম হবে আপনার॥
প্রার্থনা করি যে প্রভু নিবেদি যে পায়।
মোর বংশে তোমার সেবক যেন হয়॥
* * *
কালী বৈলা ইথে আমি কহি সার।
প্রভু ছাড়ি ভব প্রাপ্তি হওয়া কিছু ভার॥

আমি দিব জগ মধ্যে রটাইয়া তোমায়।
খদ্যোতের সাধ্যে নাকি চন্দ্র ঢাকা যায়॥
উদয় করিবে তুমি জগব্যাপ্য করি।
সাধ্য কার ঠেলি রাখে প্রলয়ের বারি॥"

(অরণ্যকাণ্ড, ২৪ পত্র, ১পৃ)।

শেষোদ্ধৃত ভণিতা হইতে মনে হয়, যেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রায় সকলেই কাল-কবলে পতিত হইলেও তাঁহার এককালে বংশাভাব ঘটে নাই। তাঁহার বংশধর যাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারে, যেন তাহারই প্রার্থনা করিয়াছেন।

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের যে পুথি হস্তগত হইয়াছে, সেই পুথির আদিকাণ্ড ১১৮৬ সনের পৌষে আরম্ভ ও ১১৮৭ সনের বৈশাখে সম্পূর্ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১১৮৭ সন ৭ই পৌষ, অরণ্যকাণ্ড ১৬ই এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৭ পৌষ লেখা সম্পূর্ণ হয়। অরণ্যকাণ্ডের শেষে লিখিত আছে,—

"এই পুস্তক হইল শ্রীরামকানাই হাজরার।
লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর চন্দ ভাগিনা তাহার॥
নিবাস অম্বিকার দক্ষিণ নাথুয়াবাসাই।
ইবে বাস রাণীহাটী শিমুল নবনাই॥"

যাঁহার নিকট এই পুথিখানি পাইয়াছি, তাঁহার নাম শ্রীপশুপতি হাজরা, তিনি সম্ভবতঃ রামকানাই হাজরার বংশধর। মনে হয়, রামানন্দ ঘোষের তিরোধানের পরও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে এই অভিনব রামায়ণ গান করিতেন এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তী কালে নকল হইয়াছিল। নকলকারী হাজরা মহাশয় এইরূপ কোন প্রশিষ্যের বংশধর এবং রামানন্দের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হয়, সন ১১৮৭ (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ) বা তাহার পরও রাঢ়-দেশে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং বুদ্ধাবতারে বিশ্বাস করিত। যিনি এই পুথি আমায় দিয়াছিলেন, তিনি জাতিতে আগরী। এক সময়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলে 'আগরী' জাতি অতি প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, রাজা বল্লালসেনের নিগ্রহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃসহ মহেশ্বর দত্ত নিহত হইলে মহেশ্বরের গর্ভবতী নারী আগরী গৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই গর্ভে উবারু দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই উবারু দত্তের বংশেই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের জন্ম। আগরীরা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের ঘরে প্রতিপালিত হওয়ায় উবারু দত্ত "তেই আগরী দত্ত গালি" বলিয়া কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত আগরীগণ আজও সমাজে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। মনে হয়, ইঁহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ আগরী জাতি

বৌদ্ধাচার প্রচলিত আছে। বৰ্দ্ধমান জেলায় নানা স্থানে কেবল ধৰ্ম্মপণ্ডিত ও যোগিগণের গৃহ বলিয়া নহে, আগরী, সদেগোপ, গন্ধবণিক্, সুবর্ণবণিক্ ও শঙ্খবণিক্ প্রভৃতি জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কুলগ্রন্থ, কুলপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার আলোচনা করিলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উপকরণ বাহির হইতে পারে। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ এককালে বৌদ্ধধৰ্ম্ম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেও এখনও ধর্ম্ম-ঠাকুরের প্রভাব রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও রাঢ়দেশের প্রত্যেক পুরাতন পল্লীতে ধর্ম্মরাজ বা ধৰ্ম্মঠাকুর পূজিত হইতেছেন। যেখানে যত ব্রাহ্মণ প্রভাব, সেখানে ধৰ্ম্মঠাকুর তত হিন্দু ভাবাপন্ন। কিন্তু যেখানে এখনও ধৰ্ম্মপণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিতগণের কর্ত্তৃত্ব, এখনও তথায় ধৰ্ম্মঠাকুর সাবেক ধরণেই বিরাজ করিতেছেন।

রাঢ়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের নিদর্শন

কিন্তু ধৰ্ম্মঠাকুর ব্রাহ্মণের নিকট বা ধৰ্ম্মপণ্ডিতগণের নিকট যে ভাবেই পূজিত হউন, এখনও মূলমন্ত্র কোথাও পরিত্যক্ত হয় নাই। ধৰ্ম্মঠাকুরের সেই মূলমন্ত্র এই,—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যে ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়ো নির্ণাদং।
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মনি যস্য॥
যোগীন্দ্রৈর্জ্ঞানগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্॥"

বলা বাহুল্য, উক্ত মন্ত্রে মহাযান মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মহাশূন্যবাদরূপ মূলতত্ত্ব বিঘোষিত হইতেছে।

গুরুপূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব। রাঢ়ে যে কর্ত্তাভজা মত প্রচলিত আছে, তিব্বতের লামা মতের সহিত এই ধৰ্ম্মমতের সাদৃশ্য থাকায় অনেকে কর্ত্তাভজা বা গুরুভজাকে বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক মনে করেন। এইরূপ বঙ্গদেশে বাউল ও সহজিয়াদিগের আচার-ব্যবহার ও সঙ্গীতে বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

কিরূপে বাঙ্গালার বিরাট্ বৌদ্ধসমাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অভিভাষণে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়

যশোমতীমালিকায় লিখিত আছে যে, গরুড় জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—

উৎকলে অভিনব বুদ্ধ অবতার

"বুদ্ধ অবতার রূপ বহিল যে যাহা।
কেতে বেলে সেহিরূপ হইব চৌবাহা॥
গরুড় বচন শুনি প্রভু বলে মোর।
শুন তাহা বুঝাই কহিবা পক্ষীবর॥৫
অতিহি গুপত কথা কহি দেবা তোতে।
কাহি ন কহিবু এহা বুঝি থাহ চিতে॥৬"

* * *

"শুণরে নন্দন তোতে দেউঅছি কহি।
কলিযুগ শেষ কভু থিবু বাট চাহি॥১৩৩
মুকুন্দদেবঙ্ক একচালিশি অঙ্করে।
বুদ্ধ রূপকু তেজি থিবু গুপতরে॥১৩৪
আম্ভে যেতে বেলে পিণ্ড ত্যজিবুরে সুত।
সকল দেবতা যাক হেবে সেই মত॥১৩৫
হরি হর ব্রহ্মা এক অটহুতি মুঁহি।
নিজ আত্মা থিব মোর অলেখর চাঁহি॥১৩৬
মায়া কায়া ধরি অবধূত বুলাইবুঁ।
অলেখ প্রভুঙ্ক আম্ভে সেবা করি থিবুঁ॥১৩৭
চতুর্পাদে কলি আসি ঘুটিলাক মহী।
মহাতেজ ব্রহ্ম উদে হেবে শূন্যদেহী॥১৩৮
নবকল্পঠাকু প্রভু উদে হৈ থিবে।
খণ্ডগিরি মণিনাগ কপিলাস ঠাবে॥১৩৯
ফল পত্র ক্ষীর জল করিণ আহার।
খেল খিলুথিবে প্রভু ব্রহ্মাণ্ডে যাঁকর॥১৪০
নর মনুষ্য যে আদি দেবলোক যাএ।
জানিল পারিবে কেহি প্রভুঙ্ক উদয়ে॥১৪১

সে শূন্যপুরুষ মানে বিচার যে কলে।
নরসঙ্গ মঞ্চে খেলা করিবু বইলে ॥১৪২
মহাঘোর পাতক হৈব অবনীর।
ভক্ত জাত হইচ্ছন্তি আজ্ঞারে আন্তর ॥১৪৩
বুদ্ধরূপ ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে।
কুন্তিপট দেই বানা প্রকাশ করিবে ॥১৪৪
অতিথি যে ক্ষীণরূপ ন চিনিবে কেহি।
পূর্ব্বর ভকত যে চিনিব ভীম ভোই ॥১৪৫
তাঙ্ক মুখে প্রভুঙ্কর ভজন হইব।
অলেখমণ্ডল শূন্যপদ যে রহিব ॥১৪৬
ভক্তজনে গাই তাহা পরম সন্তোষে।
মহিমা নাম গায়ন্ত গুরু উপদেশে ॥ ১৪৭ ॥"

ভগবান্ বুদ্ধরূপে আবার কবে অবতীর্ণ হইবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

মুকুন্দদেবের ৪১ রাজ্যাঙ্কে বুদ্ধ নিজ রূপ গোপন করিয়া মায়া কায়ায় অবধূতরূপে বিচরণ করিবেন। খণ্ডগিরি, মণিনাগ ও কপিলাসে উদিত হইবেন। ফল, পাতা, দুধ, জল, খাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে নানা খেলা খেলিবেন। সেই শূন্যপুরুষই অবতার হইবেন। বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া কুন্তীপট দিয়া তিনি সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিবেন। তাঁহার সেই অতি-সূক্ষ্ম রূপ অপরে কেহ চিনিবে না, তাঁহার পূর্ব্বের ভক্ত একমাত্র ভীমভোই চিনিবেন, তাঁহার মুখে প্রভুর ভজন হইবে। ভক্তজনে তাহা শুনিয়া গুরু উপদেশে মহিমাধর্ম্মের নাম গান করিবে।

যশোমতীমালিকায় যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা বাস্তবিক ফলিয়াছে। রাজা মুকুন্দদেবের সময় খ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে প্রবল ছিল, তাহা লামা তারনাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে, এমন কি মুকুন্দদেব লামা তারনাথের নিকট 'ধর্ম্মরাজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। উত্তরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। কালাপাহাড়ের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং দারুব্রহ্মের নিগ্রহ হইয়াছিল,— ইহা সকলেই জানেন। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের পার্শ্বে অধুনা পৃথক্ সূর্য্যনারায়ণের মন্দির আছে। এই সূর্য্যনারায়ণ কনারক হইতে আনীত সূর্য্যমূর্ত্তি। অল্প দিন হইল, এ মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইলেও এখানে বহু প্রাচীন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। সূর্য্যনারায়ণের শৈলমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে একটি প্রাচীর তুলিয়া দিয়া সেই

প্রাচীন বুদ্ধকে গোপন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মুকুন্দদেবের তিরোধানের সহিত বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব এবং বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাচীর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি-গোপনের সহিত ভক্তগণ বুদ্ধরূপ গুপ্তভাবে থাকিবার কথা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন, বুদ্ধদেব বহুবার অবতার হইয়াছেন, সুতরাং আবার অবতার হইবেন। বাস্তবিক উনবিংশ শতকে ভক্তগণ মধ্যে আবার বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন, এবং খণ্ডগিরি, মণিনাগ ও কপিলাস অঞ্চলে তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন, অলেখলীলা নামক গ্রন্থে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় সত্তর বর্ষ পূর্ব্বে উৎকলের 'বউদ' নামক রাজ্যে সত্য সত্যই এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'বউদ' নাম হইতেই বৌদ্ধ-স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, এমন কি আজও 'বউদ' রাজ্যে প্রাচীন ও অপ্রাচীন উভয় প্রকার বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। মহিমাধর্ম্মিগণের অলেখলীলা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবদ্বুদ্ধ 'বউদ' রাজ্যে গোলাসিঙ্গা গ্রামে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথও নীলাচল ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। জগন্নাথকে বুদ্ধস্বামী বলিয়াছিলেন, সেই মহাশূন্য অরূপ অনাদিরূপ অলেখগুরুর আজ্ঞায় আমি এখানে আসিয়াছি। তোমাতে আমাতে এক হইয়া কলিপাপ নাশ করিব। মানবের হিতের জন্য তোমাকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। কপিলাসে গিয়া সমাধি অবলম্বন করিবে। এই বলিয়া বুদ্ধস্বামী নিজ সর্ব্বশক্তি জগন্নাথে আরোপ করিয়াছিলেন। তখন বুদ্ধরূপী জগন্নাথ ঢেঁকানল রাজ্যে কপিলাস শৈলে অবস্থান করিলেন এবং গোবিন্দ নামে পরিচিত হইলেন। বুদ্ধাবতার গোবিন্দ এখানে দ্বাদশ বর্ষ সমাধিস্থ ছিলেন। তৎপরে তিনি কপিলাস হইতে নামিয়া আসিয়া ভীমভোইকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিয়া থাকে, ১৭৮৬ শকে বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধস্বামী ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভীমভোই হইতেই এই নবীন বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত গড়জাতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিরূপে প্রচারিত হয়, পরে সংক্ষেপে তাহার কথা লিখিতেছি।

ভীমভোই স্বরচিত কলিভাগবতে নিজ জীবন-কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ঢেঁকানল নামক গড়জাত রাজ্যের অন্তর্গত জুবন্দাগ্রামে ভীমভোই হীন কন্দবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। প্রতিবেশীর ধান ঝাড়িয়া বা অপর কোন মজুরী করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার আরাধ্য প্রভুকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেন, এবং তাঁহার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার ২৫ বর্ষ কাটিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ

ভীমভোই অরক্ষিত দাস

বোধ হইল। এতকাল ডাকিতেছেন, তবু প্রভুর দয়া হইল না, এই ভাবিয়া তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও নিজ কুটীর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক কূপমধ্যে পড়িয়া গেলেন। কূপের জলে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামবাসীরা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই উঠিলেন না। অবশেষে ভগবান্ বুদ্ধের দয়া হইল। তিনি তৃতীয় দিনে রাত্রির শেষে নিজ স্বরূপে কূপের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহমাখা কথায় ভীমভোইকে ডাকিলেন। ভীমভোই তাঁহার মনের বেদনা প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিলেন, "উঠ বৎস, আমার দিকে চাহিয়া দেখ।" কি আশ্চর্য্য! ভীমভোই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ের ভগবান্ স্বশরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত। প্রেমের পুলকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। প্রভু হাত বাড়াইয়া দিলেন, ভক্ত ভীমভোই মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের দেবতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু কহিলেন, "তোমার ভজনস্তুতির গুণে আমার দেখা পাইলে। এখন আমার চিরপ্রিয় অলেখধর্ম্ম প্রচার কর।" তৎপরে ভীমভোইকে ডোর কৌপীন দিয়া এই উপদেশ দিলেন, "তুমি গৃহস্থের নিকট ভিক্ষায় কেবল রাঁধা ভাত গ্রহণ করিবে, চাউল বা অপর কোন জিনিষ কখনই লইবে না, কেবল ভাত খাইয়া দেহরক্ষা করিয়া মহিমাধর্ম্ম প্রচার করিবে।" তাঁহার হৃদয়েশ্বরের আদেশ অনুসারে ভীমভোই কৌপীন ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিক্ষা চাহিবা মাত্র গৃহস্থ চাউল আনিল; কিন্তু ভীমভোই তাহা না লইয়া বলিলেন, "আমার ভাত চাই, অপর কিছু চাই না।" তাঁহার কথায় গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল, এ কোন্ ধর্ম্ম? জাতি অজাতি বিচার নাই! জাতিভেদ উঠাইয়া দিবে নাকি? এদিকে ভীমভোইর ভজন-সঙ্গীতে অনেকেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। তখন গ্রামের প্রধান প্রধান গৃহস্থেরা একত্র হইয়া বিচার করিয়া বুঝিল, 'এরূপ লোক থাকিলে জাতিবিচার উঠিয়া যাইবে; সব একাকার হইবে।' তখন অনেকে একত্র হইয়া ভীমভোইকে মারিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিল। তাহাতে ভীমভোই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ডোর কৌপীন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কপিলাস অভিমুখে ছুটিলেন, অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতে গোবিন্দরূপী বুদ্ধস্বামীর দর্শন পাইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া প্রভু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ও ভীমভোইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার এখনও সিদ্ধি হয় নাই। মার খাইয়া কেন তুমি পলাইয়া আসিলে?" এই বলিয়া প্রভু ভীমভোইকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া জুরন্দায় আনিয়া এক মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। মন্দিরের কেবল দ্বার বলিয়া নহে, মন্দিরের গবাক্ষ ও যেখানে কোন ফাঁক ছিল, সমস্তই বন্ধ করিয়া

দিলেন, শেষে ভীমভোইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি তিনবার তালি মারিব। তোমার সিদ্ধি হইয়া থাকিলে তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।"

অতঃপর বুদ্ধস্বামী এক তরুমূলে বসিয়া তিনবাব হাত তালি দিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভীমভোই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ অতি প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, "তোমাব সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। এখন তুমি এখানে থাকিয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্মপ্রচাষার্থ 'ভজনপদাবলী' বচনা কর। আব তোমার কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া গুরু বুদ্ধরূপী গোবিন্দ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, আর কেহ জানিতে পাবিল না। মধ্যে মধ্যে ভীমভোই কপিলাস শৈলোপরি গুরুদর্শন করিয়া আসিতেন, সেইখানেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ কবেন।

গুরু ভীমভোইকে মহিমাধর্ম্ম গ্রহণকালে "অবগি়ত দাস" নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপদাবলিতে ও কলিভাগবতে 'ভীমসেন ভোই' ও 'অবঙ্গিত দাস' উভয় নামেই ভণিতা পাওয়া যায়।

ভীমভোই জন্মান্ধ ও নিবক্ষব হইলেও তাঁহাব প্রত্যেক ভজনপদে যে অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানেব পাবচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক বৈদান্তিক বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের মুখে এরূপ সবল ভাষায় বলিতে শুনা যায় নাই। তাঁহাব প্রত্যেক ভজনপদে তাঁহার গুরু বুদ্ধদত্ত ধর্ম্মমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার বিমল ও সুললিত ভজনসঙ্গীত শুনিয়া শত শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকাব কবিয়া তাঁহাব ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়াছিল। অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার জুরন্দাব কুটীব পবিত্র তীর্থস্থ ন বলিয়া পবিচিত হইল। কেবল উড়িষ্যাব ১৮ গড়জাত বলিয়া নহে, অল্পদিন মধ্যে সম্বলপুব, শোনপুব প্রভৃতি দূবদেশবাসী উচ্চনীচ বহু লোক মহিমাধর্ম্ম গ্রহণ কবিযাছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে শূন্যবাদেব সহিত বহুদেববাদ গৃহীত হইয়াছিল, উৎকলেব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতক পর্য্যন্ত অনেকটা পূর্ব্বমত মানিয়া চলিতেন, কিন্তু উনবিংশ শতকে বুদ্ধস্বামী যে মহিমাধর্ম্ম বা অলেখধর্ম্ম প্রচার কবেন, তাহা হীনযানদিগেব খাঁটী শূন্যবাদ। এখানে উদ হবণ স্বরূপ ভীমভোই বচিত একটি ভজনপদ উদ্ধৃত হইতেছে—,

"শূন্য-দেহী ছন্তি উদে হই রূপ বেখ নাহি হে। (ঘোষা)
ববস্থুচি জল, নাহি মেঘকুল, ন থাই পবন, উনচাস বাই বহে ঘন ঘন।
বড়ুয়চ্ছি জল, নাহি নদীকুল, উলকপাত ধারা হোই হে॥ ১
জক জক উদা শুকিলা হোইছি কপাট ন ফেটু নেত্রবে দিস্থছি,
সে ঠাবে আশ্রম অনুদিত ব্রহ্ম, উদে অস্ত নাহি তঁহি হে॥ ২

বালিমাটী নাহি উবকুচি হদ, গঙ্গাজল ছড়ি কূপজলে সাধ,
লভিব মুকতি ন বুড়িব জাতি, পূর্ব্ব পুণ্য থিলে পাই হে ॥ ৩
নিয়ঁইটা পদ নিষ্কামে নির্ব্বেদ, কল্পনা না করি ধর পদ্মপাদ,
ন বাঞ্ছিত দযি ন কয়া অপ্ত শন্যী আশা ভরসা ন দেহি হে ॥ ৪
ছাই পড়িঅছি নাহি বৃক্ষ মূল, পুষ্পঝড় নাহি ফলিঅছি ফল,
ফুটিছি পতর ডেম্নি নাহি তার অসাধনা মার্গে পাই হে ॥ ৫
পতি পত্নীরূপে করন্তি যুগল, ইন্দ্রি অন্ত নাই পিন্ধিছি বকল,
সে প্রভু পয়রে সেব নিরন্তর, ভণে ভীমসেন ভোই হে ॥ ৬"

মহিমাধর্ম্মে সাকার মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন ও নিন্দা দেখা যায়। এ জন্য সাকার মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ভীমভোই ও তাঁহার শিষ্যগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বহুকাল হইতে দারুব্রহ্মকে শূন্যব্রহ্ম মনে করিতেন। ভীমভোইও সেই মতানুসরণ করিলেও তিনি মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী হওয়ায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, এই মূর্ত্তিত্রয়ের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উৎকলপতি দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ খানি গ্রামের লোকদিগকে একত্র করিয়া ও যথাসাধ্য অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভীমভোই পুরীর শ্রীমন্দির আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা পূর্ব্ব হইতে সে সংবাদ পাইয়া পিপলি হইতে পুলিশ সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ভীমভোই সদলবলে পুরীর সীমায় পৌছিবামাত্র উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের বীরগণের রক্তে পবিত্র পুরীধাম কলুষিত হইয়াছিল। যখন ভীমভোই বুঝিলেন যে, তাঁহার জয়াশা নাই, তখন তিনি বৃথা লোকক্ষয় করা উচিত নহে ভাবিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম'—জগন্নাথ মহাপ্রভু পূর্ব্বেই বুদ্ধবেশে পুরী ছাড়িয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি বুদ্ধস্বামীর প্রত্যাদেশে বুঝিয়াছেন, তাঁহার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি বাহির করিবার সময় হয় নাই। ভীমভোইর ইঙ্গিতে তাঁহার দলবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কয়েকজন ধৃত ও বন্দী হইলে প্রাণভয়ে অনেকেই গড়জাতের দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ভীমভোই জুরন্দায় আসিয়া মহন্তস্বরূপ গদীতে বসিলেন। অল্পদিন মধ্যেই পুলিশের ভয় দূর হইলে, আবার দলে দলে বহু লোক আসিয়া ভীমভোইর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় জুরন্দায় ভীমভোইর যত্নে অলেখলীলার অভিনয় হইয়াছিল। শুনা যায়, সেই লীলা অভিনয় দেখিয়া গড়জাতবাসী সহস্র সহস্র লোক মহিমাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ভীমভোই জগন্নাথের বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ধার না করিয়া চলিয়া আসায় কতকগুলি প্রধান শিষ্য তাঁহার উপর বিরক্ত

ভীমভোইর মত

মহিমা-ধর্ম্মীর পুরী আক্রমণ

হইয়াছিল। তাহারা শম্বলপুর, শোনপুর, পটনা প্রভৃতি দূরদেশে গিয়া মঠধারী হইয়া অলেখধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। জগন্নাথের বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ধার করিতে হইবে, এই মত নূতন শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, অল্পদিন মধ্যেই কতক ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ধার করিতে পুরী ধামে আসিয়াছিল। তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রথমে দ্বাররক্ষকগণ তাহাদিগকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। শেষে কৌশলক্রমে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করে। এখানে প্রহরিগণের সহিত তাহাদের রীতিমত হাতাহাতি হয়, তাহাতে একজনের প্রাণ যায় ও কয়েক জন জখম হয়। ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসে এই ঘটনা ঘটে।[২০] এবারও কয়েক জনের জেল হওয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ধারের কল্পনা থামিয়া যায়।

২য় বার পুরী আক্রমণ

যাহা হউক ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। যশোমতীমালিকায় লিখিত আছে, এই সম্প্রদায়ের ভক্ত সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ হইবে। ভীমভোইর জন্মভূমি কপিলাস শৈলের নিকট জুরন্দাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র; তৎপরে 'বউদ' রাজ্যে গোলাশিঙ্গা গ্রামের বড় মঠ (যেখানে বুদ্ধস্বামী অবস্থান করিয়াছিলেন), এ ছাড়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্য মধ্যে বামনঘাটী, উপর ভাগ, উপর ডিহি, যশীপুর, নওয়াপাড়া প্রভৃতি মহকুমার মধ্যে নানাগ্রামে, কেওনঝর প্রভৃতি অপরাপর সকল গড়জাতেই এই সম্প্রদায়ের বাস, ও তাহাদের ছোট-বড় মঠ দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রয়ায়ের মধ্যে গৃহী ও ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী এই উভয় প্রকার লোকই আছে। ভিক্ষুর মধ্যে উদাসীনেরাই মহন্ত হইয়া থাকে। সাধারণ ভিক্ষুগণ মঠে আশ্রয় পাইয়া থাকে। ভিক্ষুর আচার-ব্যবহারের সহিত পুরাতন বৌদ্ধ ভিক্ষুর আচার-ব্যবহারের মিল আছে, বাহুল্য ভয়ে আর লিখিত হইল না।[২১]

প্রায় ত্রিশবর্ষ হইল ভীমভোই অরক্ষিত দাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার গদীতে তাঁহার পুত্র প্রধান মহন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন। আজও শত শত ব্যক্তি ভীমভোইর সমাধিদর্শনে গিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিশ্বাস আবার ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য বুদ্ধ অবতার হইবেন, আবার বিহারমণ্ডলে শূন্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে—

---

২০ এই সময়ের কলিকাতা গেজেটে অলেখসম্প্রদায় কর্ত্তৃক উক্ত ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৮১ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় সেই ঘটনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

২১ যাঁহার সবিস্তার জানিবার ইচ্ছা—তিনি আমার The Modern Buddhism and its Followers in Orissa নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

"চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছত্তি রহি।
বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না পাই ॥১৭৭
বিহার মণ্ডলে শূন্যগাদি তুলাইবে।
সে অলেক প্রভু ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত থিবে ॥১৭৮
মায়ারূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী।
ভক্ত জন হিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই ॥"

(যশোমতীমালিকা)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

আঞ্জী

পূর্ব্ব বঙ্গ শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত প্রদেশে বিদ্যারম্ভের পর বর্ণমালা লিখনের প্রথমেই আঞ্জী (৺) চিহ্ন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং ঐ আঞ্জী চিহ্নের পর ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তৎপরে স্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। গৌড় বা পশ্চিম বঙ্গে প্রথমে দুইটি দাঁড়ী (॥), তৎপরে 'সিদ্ধিরস্তু', তারপর স্বরবর্ণ, তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। এখন উভয় প্রদেশেই প্রাচীন প্রথা বিলুপ্তপ্রায়। প্রথম ভাগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্ব্বত্র প্রচলন। তাহাতে '(॥) আঞ্জী'ও নাই 'সিদ্ধিরস্তু'ও নাই। অদ্য আঞ্জী চিহ্ন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞানস্বরূপা আদ্যাশক্তির নাম কুণ্ডলিনী বা কুলকুণ্ডলিনী। ইনি সকলেরই দেহে আছেন। দেহের মধ্যে ছয়টি চক্র বা বায়ুর স্থান বর্ত্তমান। প্রথম চক্র গুহ্যদেশে, তাহার নাম মূলাধার, তাহার উর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান চক্র, তাহার উর্দ্ধে নাভিদেশে মণিপূরক চক্র, তাহার উর্দ্ধে হৃদয়ে অনাহত চক্র, তাহার উর্দ্ধে কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, তাহার উর্দ্ধ ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্র। এই সকল চক্র সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত, সুষুম্নার বামে ও দক্ষিণে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। মূলাধারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অধোমুখে কুণ্ডলিনী বিরাজমানা, এই কুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি, মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা। কুণ্ডলিনীর অধোমুখে অবস্থিতি দেহীর তামস ভাবের পরিচায়ক, যোগিগণ ইঁহাকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া ষট্ চক্রের উর্দ্ধস্থ সহস্র-দল পদ্মে সম্মিলিত রাখেন। ধর্ম্মার্থী মানবকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই (কৃষ্ণানন্দ মতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া) অধোমুখে অবস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে উর্দ্ধে উত্থাপন করত সহস্রার পদ্মে স্থিত পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে হয়। ইহা প্রাতঃকালে না করিলে কোন বৈধ কর্ম্মে অধিকার হয় না, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

এই কুণ্ডলিনী শক্তি হইতেই শব্দাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপাদন এই কুণ্ডলিনীরই কার্য্য। বর্ণ-প্রসবিনী কুণ্ডলিনীর অবস্থা-ভেদে চারি প্রকার সংজ্ঞা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যথা,—(১) পরা, (২) পশ্যন্তী, (৩) মধ্যমা, (৪) বৈখরী।

আঞ্জী চিহ্ন মধ্যমা ভাবাপন্না কুণ্ডলিনী শক্তির চিত্র প্রতিকৃতি। এ বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।
দ্বিচত্বারিংশদ্‌বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্‌বর্ণরূপিণী।
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা॥
—প্রাণতোষণী-ধৃত সারদাতিলক।

সূক্ষ্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্ম্মাত্রাস্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদুদ্গচ্ছন্ত্যূর্দ্ধগামিনী॥
স্বয়ংপ্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী॥
ততঃ (অন্তঃ) সংজল্পমাত্রা স্যাদবিভক্তোর্দ্ধগামিনী।
শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী॥
ক্রমেণানেন সৃজতি কুণ্ডলী বর্ণমালিকাম্।
— প্রাণতোষণী-ধৃত পদার্থাদর্শ।

ভাবার্থ।—কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যুদাকৃতি, মূলাধারে তিনি কুণ্ডলিত সর্পবৎ অবস্থিতা। এই স্থানে জ্যোতির্ম্ময়ী সূক্ষ্মা অর্থাৎ শব্দের 'পরা'নামক অবস্থায় স্থিতা, তাঁহাকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তখন গ্রহণ করা যায় না। উর্দ্ধগামিনী হইয়া সুষুম্নাশ্রয়ে স্বাধিষ্ঠানে তিনি 'পশ্যন্তী', হৃৎপঙ্কজে তিনি নাদরূপিণী 'মধ্যমা'। ইহা বৈখরী সৃষ্টির অর্থাৎ বর্ণাভিব্যক্তির পূর্ব্বাবস্থা,' সেই স্থান ত্যাগ না করিয়া উর্দ্ধগমন দ্বারা উরঃ কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণ করতঃ তিনি সকল বর্ণ প্রসব করেন। পাঠান্তরের অর্থ,—বর্ণবিভাগশূন্যা অন্তঃপ্রদেশে বর্ণরূপে অবস্থিতা, পরে উর্দ্ধগামিনী হইয়া বিভক্ত বর্ণ প্রসব করেন।

সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধগতির বা নৃত্যাবস্থার চিত্র প্রতিকৃতি এই আঞ্জী (ই)'। ইহা বিদ্যুদাকৃতির চিহ্নও বটে ; 'নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা' বচনস্থ এই অঞ্জসাপদের সহিত আঞ্জী নামের সম্বন্ধ সম্ভাব্য। অঞ্জঃ—কে ? না, অন্যপ্রকাশক স্বপ্রকাশ সত্যচিৎস্বরূপ। অঞ্জ্—অঞ্জ ধাতুর অর্থ প্রকাশ প্রভৃতি, অস্ (অসি) প্রত্যয়ান্ত হইলে অঞ্জঃ, অচ্ প্রত্যয়ান্ত হইলে অঞ্জ। 'সর্ব্বে সান্তা অজন্তাঃ' এইরূপ শব্দানুশাসনও আছে, উদারণ—আয়ু, ধনু, তম ইত্যাদি। অঞ্জসা এই তৃতীয়া সহার্থে বা বিশিষ্টার্থে, কুণ্ডলিনীর বিশেষণ। অন্যপ্রকার অর্থ করিলে অঞ্জসা এই পদের সার্থক্য থাকে না। বিশেষতঃ সারদাতিলকেরই অপর বচনে আছে, "শিবসন্নিধি-

মাগত্য নিত্যানন্দগুণোদয়া তিষ্ঠতি"। ইহার সহিত একবাক্যতা করিলে অঞ্জসাপদের মদুক্ত অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। সেই যে অঞ্জ,—চিৎস্বরূপ, তৎসম্বন্ধিনী শক্তি আঞ্জী; তিনি বর্ণাভি-ব্যক্তির পূর্ব্বে হৃদয়স্থা নাদরূপিণী মধ্যমা। এই হৃৎপদ্মে দ্বাদশ দলে ককারাদি দ্বাদশ বর্ণের স্থান বলিয়া হৃৎপদ্মস্থা নৃত্যপরায়ণা আঞ্জী শক্তিকে ককারাদি অক্ষরাঙ্কনের পূর্ব্বেই অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি পূর্ব্ব বঙ্গে চলিত ছিল।

ককারাদিবর্ণ লিখনের পূর্ব্বে এই কুণ্ডলিনী শক্তির চিত্রচিহ্ন প্রদানের ও তাঁহার আঞ্জী নামের অপর কারণও আছে, তাহা এই,—স্বরবর্ণ প্রত্যেকটি স্বস্বপ্রধান, অকার উচ্চারণ ইকারাদিতে হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সর্ব্বত্রই অকার যোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। হৃদয়স্থ ককারাদির অভিব্যক্তি করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে অ-এর অভিব্যক্তি হয়। অং—অনক্তি অকারং প্রকাশয়তি যা (কর্ম্মণ্যণ্ স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্) আঞ্জী। "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি" এই ন্যায়ে এবং "অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি" এই প্রাধান্যবশতঃ সর্ব্ববর্ণ-প্রকাশিকা শক্তিকে অকার প্রকাশিকা বলা হইয়াছে, ইহা আঞ্জী নামের অপর কারণ।

হৃদয়ের উর্দ্ধেই কণ্ঠ, কণ্ঠ অকারের স্থান, মধ্যমা উর্দ্ধগতি প্রভাবে প্রথম অকারের অভি-ব্যক্তি করেন, ইহাও বলা যায়। সুতরাং অঞ্জসা এই পদের অর্থে কাহারও মতভেদ থাকিলেও 'আঞ্জী' আখ্যার পরবর্ত্তী কারণ, যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে যদি বলা যায়, এইপ্রকারের 'আঞ্জী'-সংজ্ঞা বৈখরীরই হইতে পারে, মধ্যমার হইবে কেন? তাহার উত্তর—"শ্রোত্রগ্রাহ্যা তু বৈখরী" এই অংশেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রোত্রগ্রাহ্য অর্থাৎ শ্রবণযোগ্যা বলায় বর্ণাবস্থারই বৈখরী-সংজ্ঞা, বর্ণাভিব্যঞ্জনী অবস্থা বৈখরী নহে, তাহা মধ্যমা। 'আঞ্জী' শব্দের যোগার্থ হইতে বর্ণাভিব্যঞ্জনী অবস্থাই বুঝা যাইতেছে। অতএব আঞ্জী বর্ণবিশেষ নহে, বর্ণ চিহ্নও নহে, উহা মধ্যমাভাবাপন্না কুণ্ডলিনীরই চিত্রপ্রতিকৃতি। তন্ত্রোক্ত বর্ণমালার মধ্যে বা শব্দশাস্ত্রোক্ত বর্ণমালার মধ্যে আঞ্জীর কোন উল্লেখ নাই। "তদূর্দ্ধে তু কলা প্রোক্তা আঞ্জীতি যোগবল্লভা। তদূর্দ্ধে দ্বিদলোর্দ্ধো" এই উক্তি প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও দ্বিদলোর্দ্ধস্থান পর্য্যন্তই মধ্যমাভাবাপন্না কুণ্ডলিনীর নৃত্যসঞ্চরণ হইয়া থাকে, ইহাই উহা দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, মূর্দ্ধন্য বর্ণঘটিত কালী তারা প্রভৃতি দেবতাগণের মন্ত্রের অভিব্যক্তি দ্বিদলোর্দ্ধে নাদরূপিণী মধ্যমার সঞ্চরণ ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বিদলোর্দ্ধে মধ্যমার অনুভূতি যোগী ব্যতীত অপরে করিতে পারে না, আর কুণ্ডলিনী শক্তি যে যোগিবল্লভা, তাহা সুপ্রসিদ্ধ।

আরও কথা আছে। দ্বিদলোর্দ্ধে আঞ্জী নাম্নী পৃথক্ কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও সেই আঞ্জী ককারাদি লেখনের পূর্ব্বে স্থাপনীয় হইতে পারে না। প্রত্যুত 'হ' 'ক্ষ' লিখিবার

পরেই তাহা স্থাপনীয় হইতে পারে। কারণ, দ্বিদলে 'হ' 'ক্ষ' বর্ণ আছে, তদূর্দ্ধে আঞ্জী থাকিলে তাহা ককারের পূর্ব্বে না আসিয়া 'ক্ষ'কারের পরে হওয়াই সঙ্গত। অতএব পূর্ব্ব বঙ্গে ককার লিখনের পূর্ব্বে স্থাপনীয় আঞ্জী মধ্যমাভাবাপন্না কুণ্ডলিনীরই প্রতিকৃতি, ইহা আমার সিদ্ধান্ত।

বলা আবশ্যক যে, আঞ্জী ও প্রণব একই বস্তু নহে অর্থাৎ আঞ্জী চিহ্ন (১) (১) বা (৭) ওঁকার সূচক নহে। এতদুভয়ের প্রভেদ বিষয় এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, আঞ্জী মধ্যমা ভাবাপন্না বলিয়া কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয়া নহে; প্রণব বৈখরীভাবাপন্ন, তাই কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চার্য্য।

গৌড় বা পশ্চিম বঙ্গে যে প্রথমে দুইটি দাঁড়ি (॥) দেওয়া হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার চিত্র-প্রতিকৃতি, মধ্যে সুষুম্না স্থান আকাশরূপে প্রদর্শিত, শব্দাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত ইহার সহিত জড়িত আছে। কুণ্ডলিনী শক্তিও ঐ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যস্থিতা সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ণ সৃষ্টি করেন। ঐ নাড়ীদ্বয় কুণ্ডলিনী-সঞ্চরণ-ক্ষেত্রের স্থূল সীমা-স্তম্ভ। ইহার পর 'সিদ্ধিরস্তু' গুরুর আশার্ব্বাক্য এবং শিষ্যের প্রার্থনা বাক্য। তৎপরে অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা—যাহা তন্ত্র ও শব্দশাস্ত্রসম্মত ক্রমযুক্ত, তাহাই পশ্চিম বঙ্গে লিখিত হইত। 'সিদ্ধিরস্তু অ আ ইত্যাদি' ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত লিখন-রীতির ন্যায় বিদ্যারম্ভ দিনে পূর্ব্ব বঙ্গেও ঐরূপই লিখিত হইত, ইহা পূর্ব্ববঙ্গবাসী একজন প্রাচীন সুপণ্ডিত বলিলেন। কিন্তু তৎপরে বর্ণমালা লিখন আঞ্জী (১) ও ককারাদি ক্রমে হইত। কামরূপ প্রদেশে আঞ্জী চিহ্ন (১) বামাবর্ত্তে, ইহাও উর্দ্ধগামিনী বা নৃত্যপরায়ণা সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীর প্রতিকৃতি, আবর্ত্তভেদ মাত্র। একটি দক্ষিণাবর্ত্ত, অপরটি বামাবর্ত্ত। গৌড় বা পশ্চিম বঙ্গে পত্র লিখিবার প্রণালী শিখিবার সময়ে শীর্ষদেশে শ্রীদুর্গা প্রভৃতি নাম লিখিবার পূর্ব্বে (৭) এই প্রকার লিখিবার রীতি আছে। তাহার আঞ্জী নাম তথায় প্রসিদ্ধ না হইলেও তাহাও উর্দ্ধগামিনী কুণ্ডলিনীর প্রতিকৃতি। ঐ (৭) চিহ্নের নিম্নাংশ সর্পাকৃতির উর্দ্ধগতির সরল দণ্ড চিত্র, উপরে ফণার বক্র প্রতিকৃতি।

(ৠ) এইরূপ চিত্রপ্রতিকৃতিও লেখনের মঙ্গলাচরণ শ্রীদুর্গাদি নামের পূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রদত্ত হয়। তাহা কুণ্ডলিনী ও বর্ণ উৎপাদনের বীজভাবের পূর্ব্বাবস্থার চিত্র। কুণ্ডলিনী বর্ণজননী পরানাম্নী প্রথমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুভাব গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে

শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকা, এই তিন অবস্থা তাঁহার হয়। তাহার পরে অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু। সেই বিন্দুই মূলাধারে 'পরা', স্বাধিষ্ঠানে 'পশ্যন্তী' ও হৃদয়ে মধ্যমা। মূলাধারাদি স্থানগ্রহণের পূর্ব্বেই যে চিচ্ছক্তি তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী নামে কথিত, তাঁহার সেই নাম প্রাপ্তির হেতু সর্পাকৃতি এবং বর্ণ উৎপাদনার্থ উর্দ্ধগামিতা (৭) চিহ্নে আছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দু মস্তকে রাখার পরে যে পরাদি অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, তাহা সূচিত হইয়াছে। শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকার কোন আকৃতি বর্ণিত না থাকায় তাহার চিত্রও পৃথক্ নাই, পদ্মপুষ্পের চিত্রে যেমন গন্ধের চিত্র থাকা সম্ভব নহে, পদ্মের চিত্রে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। এখানেও সেইরূপ অসম্ভব বলিয়া কুণ্ডলিনী চিত্রেই শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকার অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা,—

"সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।
শক্তিং ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিবোধিকা।
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ॥"

— প্রাণতোষণী-ধৃত সারদাতিলক।

ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তন্ত্রশাস্ত্রে যে কুণ্ডলিনী মন্ত্রাদিসৃষ্টিকর্ত্রী সচ্চিদানন্দরূপা বলিয়া কথিত, তন্ত্রপ্রধান গৌড়বঙ্গ ও কামরূপ তাঁহাকে যে আকারেই হউক, প্রথমে স্মরণ করিতে চিরদিন যত্ন করিয়াছে। অধঃপতনের সময় যাহা হইবার, তাহা আমাদিগের হইয়াছে। প্রথমে তত্ত্ববিস্মৃতি, প্রথামাত্রে তাহার পর্য্যবসান, এখন সেই প্রথাও বিলুপ্ত। সনাতনধর্ম্মীর আচার-ব্যবহারে এই দুর্দ্দশাই ঘটিতেছে, এই জন্য সবই বিলোপোন্মুখ। তবে আশা, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী স্বয়ং সনাতনী ব্রহ্মময়ী। যতই অধঃপতন হউক, মূলচ্ছেদ হইবে না।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন